জাহানারা।

উপন্যাস।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

চতুর্থ সংস্করণ

১৩৩৫

[মূল্য দুই টাকা।

Published by
L. SINHA.
12/1 Shibnarain Das Lane,
Calcutta.

৯৪৪

Printer: S. C. MAZUMDAR
SRI GOURANGA PRESS,
71/1, Mirzapur Street, Calcutta
94/[illegible]

উপহার।

প্রথম খণ্ড।

নিবেদন।

অধ্যাত্ম জীবন-কাহিনী লইয়া "জাগানারা" উপন্যাস লেখা। ব্যাপার অত্যন্ত দুরূহ,—সাফল্য লাভের সম্ভাবনা অতি অল্প। যিনি অধ্যাত্ম-জগতের অধীশ্বর—যিনি জীবন-মরণের প্রবর্ত্তক,—যিনি সকলের সাক্ষী, সকলের কর্ত্তা—তিনিই এই উপাখ্যানের প্রবর্ত্তক,—তাঁহার ফলাফল শুভাশুভ তাঁহারই হাতে; আমার কেবল স্বপ্ন-কল্পনা মাত্র।

রূপ আর রসের আকর্ষণে জৈবী-জীবনের গতি। ইহার দুই পিঠ—এক পিঠ পৈশাচিক কাণ্ড, অপর পিঠ দৈবীশক্তি। রূপকচ্ছলে তাহাই এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃতি রূপিণী রমণী নরকের দ্বার—আবার বৈকুণ্ঠের সোপান—সে কথারও প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ আছে।

যাঁহারা এ তত্ত্বের বিরোধী, তাঁহাদের হয়ত এ আখ্যান ভাল লাগিবে না। সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে, এ গ্রন্থ পাঠে তাঁহাদের সময় নষ্ট করিবার আবশ্যক নাই।

অনন্তপুর, ১৩১২ বঃ
১৩ই আশ্বিন।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

জাহানারা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উদয়েশ্বর আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিত। কিন্তু তাহার পিতা মাতা কে, কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, জন্মভূমি বা পৈতৃক আবাস-স্থল কোথায়, তাহার সংবাদ কেহই জানিত না,—নিজেও ইহার কোন তথ্য অবগত ছিল না। ফরিদপুর জেলার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের বাড়ীতে প্রতিপালিত হইতেছিল, প্রায় তিন বৎসর হইল, সেখান হইতে গৌড়নগরে আসিয়া অবস্থান করিতেছে।

যখনকার কথা বলিতেছি, তখন বঙ্গের রাজধানী গৌড়নগর। বঙ্গের ভাগ্য-বিধাতা বা অধীশ্বর বিজয়লক্ষ্মীর বরদৃপ্ত হোসেন সাহ। সৌধ-কিরীটী-সম্পৎ-সৌভাগ্যশালী গৌড় তখন বিপুল জন-কোলাহল মুখরিত। এখন কালের করাল নিশ্বাসে তাহার সব উড়িয়া গিয়াছে, তথাপি ভগ্নাবশেষ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, সে কি ছিল, আর কি হইয়াছে। প্রাচীন গৌড়ের দর্শনীয় ভগ্নাবশেষ সমূহ মালদহ জেলার সদর ষ্টেশন ইংরাজবাজার টাউনের আট মাইল দূরবর্ত্তী রামকেলী গ্রামের অনতিদূরে ও পার্শ্বে পরিদৃষ্ট হয়। সেই কারণে অনেকে বলেন, এই সীমাতেই গৌড় অবস্থিত ছিল। কিন্তু উক্ত স্থানের বাহিরে ইংরাজ-বাজারের নিকট পর্য্যন্ত উন্নত গড় ও পরিখা বর্ত্তমান আছে। এই সকল দেখিয়া, এই সমুদয় ভূভাগকেই প্রাচীন গৌড়নগর বা তাহার সীমা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এই মহানগরে তখন দ্বাদশলক্ষেরও অধিক অধিবাসী বাস করিত।

এই প্রকাণ্ড নগরীর কোন অপরিচ্ছন্ন একটা বাড়ীর একটি ক্ষুদ্র

প্রকোষ্ঠ ভাড়া লইয়া উদয়েশ্বর বসতি করিত। সে গৃহে সে একা, সংসারে একা,—জগতে একা।

সংস্কৃত ও পারস্য ভাষাতে উদয়েশ্বর ব্যুৎপন্নশীল ছিল। গৃহ-শিক্ষকরূপে সহরের এক ধনি-সন্তানকে অধ্যয়ন করাইয়া, অর্থ সাহায্য যাহা প্রাপ্ত হইত, তদ্দ্বারা কোনপ্রকারে নিজের গ্রাসাচ্ছাদন চলিয়া যাইত। তখন তাহার বয়স পঁচিশ বৎসরের অধিক বলিয়া কেহই অনুমান করিতে পারিত না। উদয়েশ্বর সুন্দর পুরুষ, সন্দেহ নাই।

কিন্তু লোকটা যেন কেমন অদ্ভুত প্রকৃতির। তাহার দৃঢ় ধারণা মানুষ হইয়া ব্রাহ্মণ না হইলে জীবনে সুখ নাই। আর ইন্দ্রের ন্যায় ঐশ্বর্য্যবান্ না হইলেও তাহার জীবন জলের রেখার ন্যায় নিষ্ফল। রাজাধিরাজের স্বপ্ন-কল্পনার হর্ম্ম্যরাজি, শত শত দাস দাসী, হয়-হস্তী মণিমুক্তার উপর দিয়া যে আবেশে অলসে চলিয়া যাইতে না পারিল, তাহার মানুষ হইয়া জন্মান কেন? আরও তাহার ধারণা ছিল, কামিনী ও কাঞ্চন লইয়াই জগতের যাহা কিছু সুখ-সোয়াস্তি। জগতের সার যাহা, তাহাকেই লোকে সুন্দর বলে। উদয়েশ্বর কামিনী ও কাঞ্চন ব্যতিরেকে সৌন্দর্য্যের অন্য কল্পনা করিতে পারিতেন না। কামিনীর সহিত কাঞ্চন তাঁহার চক্ষে অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িত ছিল।

তদুপরি আরও এক পাগলামি তাহার ছিল। মনের মত সৌন্দর্য্য-শালিনী একটী রমণী খুঁজিয়া পাইতেছিল না। কিন্তু তাহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাহার তরুণ হৃদয়ের উদ্দাম কল্পনা, অপার আকাঙ্ক্ষা ও অগাধ অতৃপ্তি দিয়া যে এক মানস-প্রতিমার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে, এ জগতের কোন না কোন মঙ্গল-মুহূর্ত্তে তাহার সহিত যেন সাক্ষাৎ হইবেই হইবে;—তাহার সহিত যেন অন্তরঙ্গ ভাবে মিলন ঘটিবেই ঘটিবে, এবং তীব্র আগ্রহের সহিত উদয়েশ্বর যেন তাহারই অন্বেষণে ব্রতী রহিয়াছে!

তাহার মানসী-প্রতিমা কিরূপ সুন্দর, তাহা সে অন্তরে অন্তরে বুঝিতে পারিত, কিন্তু ব্যক্ত করিতে পারিত না। বুঝি তাহার দৈন্যই ব্যক্ত করিতে না পারিবার কারণ। কিন্তু তবু যেন একটা অব্যক্ত অবুঝ ভালবাসা, একটা কাছে পাইবার অন্ধ ইচ্ছা, কেবল একটা না দেখিয়া অব্যক্ত বিশাল ব্যাকুলতা, একটা আন্তরিক ক্রন্দন, তাহার অন্তরে ধ্বনিত হইত। তাহার জীবনটা ব্যর্থ বলিয়া বোধ হইত,—যেখানেই সে সুন্দর দেখিত, সেই স্থানেই সবেগে গিয়া পতিত হইত,—হয়ত কখনও কোন নবোদ্ভিন্ন যৌবন-শ্রী মোহিনী সুন্দরীকে দেখিয়া চক্ষুর পিপাসা মিটিত, কিন্তু প্রাণের আকাঙ্ক্ষা যাইত না,—প্রাণ তাহার যেন ডাকিয়া বলিত, যাহা খুঁজিতেছি—"এ সে নহে।" সুন্দরী রমণী দেখা, তাহার ব্যতিকের মধ্যে,—দেখিয়া হয়ত তাহার ক্ষণতরে তৃপ্তি হইত ; কিন্তু হৃদয়ের অতি গোপনপুরে ক্ষুব্ধ অন্তরাত্মা নিতান্ত ক্ষুধিত হইয়া বিরলে ঝুরিয়া মরিত।

উদয়েশ্বর সংস্কৃত-সাহিত্যের শকুন্তলা ও কাদম্বরীর চিত্র পাঠ করিয়া অসুখী হইত—এক অভাবিতপূর্ব্ব চিত্ত-বেদনার উদয় হইত। তাহার সাধনার ধন বুঝি ইহা অপেক্ষাও মোহময়, ইহা অপেক্ষাও সুঠাম, সুন্দর, মধুময় ;—ইহা অপেক্ষাও স্বাধীন ও সম্পূর্ণ।

কিন্তু এত দিন খুঁজিয়া খুঁজিয়াও উদয়েশ্বর সে প্রতিমার সন্ধান পায় নাই। তথাপি সে অবিশ্বাসী নহে, সে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিত, একদিন শুভ অবসরে সে আসিবে! এ অনন্ত অজ্ঞাত পথে কেবল একটা সীমাহীন আশা ও একটা জন্মান্তরীণ ঘনীভূত স্মৃতি ব্যতিরিক্ত আর কোন পাথেয় ছিল না। না থাকুক, নিঃসম্বলে উদয়েশ্বর সে পথের পথিক।

এই প্রকার অদ্ভুত হৃদয়-বৃত্তি লইয়া দীন-হীন উদয়েশ্বর দিন

কাটাইতেছিল। কিন্তু মানুষ যেরূপ আশাই করুক, তাহার গতি কতকটা নিয়তির পথে। উদয়েশ্বর আশা করিতেছিল, ইন্দ্রের ন্যায় ঐশ্বর্য্যবান্ হইবে, এদিকে কিন্তু তাহার জীবনের উপায় স্বরূপ অধ্যাপনা কার্য্যটি হস্তচ্যুত হইল। আন্তরিক সৌন্দর্য্য-পিপাসাই দুর্ঘটনা ঘটাইবার মূল।

একদিন বৈকালে উদয়েশ্বর ছাত্রকে পড়াইতে গিয়াছেন, ছাত্র তখনও আসিয়া পঁহুছে নাই। শিক্ষক বারাণ্ডায় পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছিলেন, সেই সময় গবাক্ষে একটি পরমা সুন্দরী রমণী দাঁড়াইয়াছিলেন,—সৌন্দর্য্যান্বেষী উদয়েশ্বরের চক্ষুতে তাহা পড়িল,—উদয়েশ্বর সমস্ত হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা লইয়া রমণীর উপরে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন।

উদয়েশ্বরের চাহনিতে একটু আকর্ষণ ছিল; কাছে আবৃত আলো চক্ষুর উপরে ধরিলে যেমন মানুষের গতি-শক্তি রহিত হয়, উদয়েশ্বরের চাহনিতেও তদ্রূপ সুন্দরীগণের মানসিক গতি স্থগিত হইত। চাহনির আকর্ষণে পতঙ্গের ন্যায় দুই একটি যুবতী ঘুরিয়া আসিয়া পড়িত, অনেকে আত্ম-সংযম করিত। যাহারা আত্মসংযম করিতে পারিত, তাহারা উদয়েশ্বরের চাহনির বড়ই নিন্দা করিত।

ছাত্রাবাসের যুবতী শেষোক্ত দলের। তিনি উদয়েশ্বরের চাহনীর বৈদ্যুতি শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া আপন ভুলিয়া অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, শেষে আত্মজ্ঞান হইলে আপনার কথা মনে পড়িল,—তিনি বাটীর মধ্যে চলিয়া গেলেন এবং পণ্ডিতের কুচরিত্রের কথা মাতাকে বলিয়া দিলেন—সেই সূত্রে উদয়েশ্বরের জীবিকার উপায়-স্বরূপ চাকুরী হইতে জবাব হইয়া গিয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রায় দশদণ্ড উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, উদয়েশ্বর গঙ্গা অভিমুখে যে রাস্তা গিয়াছে, সেই রাস্তা বহিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। চাকুরী গিয়াছে, তাহাতে উদয়েশ্বর যে বিশেষ দুঃখিত বা চিন্তান্বিত, তাঁহার মুখ-ভাব দেখিলে তাহা বোধ হয় না। চিন্তিত না হইবারই সম্ভব, যে দরিদ্র দিবানিশি মনে মনে প্রতিবাসীর অট্টালিকার আকাঙ্ক্ষা রাখে, সে তাহার জীর্ণ-দীর্ণ ভগ্ন কুটীর পড়িয়া গেলে ভ্রূক্ষেপও করে না; কিন্তু যে দরিদ্র, প্রাণের সমস্ত স্নেহটুকু দিয়া আপন ভগ্ন কুটীর জড়াইয়া রাখে, সে তাহার পতনে ধৈর্য্য ধরিতে সক্ষম হয় না। উদয়েশ্বর চায়, ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য, সে সামান্য চাকুরীর আসক্তিতে মুগ্ধ নহে। তবে বর্ত্তমানে উপায় কি, এই একটু যা' ভাবনা।

উদয়েশ্বর যে পথে যাইতেছিলেন, সে পথের পার্শ্বে হাঘরেপাড়া। হাঘরেরা বড় দরিদ্র ও অসচ্চরিত্র। রাত্রিকালে হাঘরের মেয়েরা পথে দাঁড়াইয়া পথিকের নিকট ভিক্ষা করে। তাহাদের চরিত্রও ভাল নহে, ক্রেতা যুটিলে রূপ বিক্রয়ও করিয়া থাকে।

সেদিন কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী তিথি,—এই মাত্র চন্দ্রদেব পূর্ব্বদিগ্‌ভাগ হইতে রজত-কিরণ বিকীর্ণ করিতে করিতে উদিত হইলেন।

পথি-পার্শ্বে অনেকগুলি ভিখারিণী দাঁড়াইয়াছিলেন, উদয়েশ্বরকে দেখিয়া সকলেই চীৎকার করিয়া ভিক্ষা চাহিল। উদয়েশ্বর কাহাকেও কিছু দিল না—চলিয়া যাইতেছিল, সহসা চন্দ্রকর-বিধৌত একখানি সুন্দর মুখ দেখিতে পাইল। ফিরিয়া ফিয়িয়া সে মুখ দেখিল,-এমন অপাপবিদ্ধ সুন্দর মুখ হাঘরেপাড়ায়! ফিরিয়া সেই ভিখারিণীর

নিকটে গেল। ভিখারিণী যুবতী,—যৌবন-শ্রীতে আর কোমল মাধুর্য্যে মিলন-মাধুরী বিকসিত হইয়াছে। উদয়েশ্বর বলিল,—"তুমি কি হাঘরের মেয়ে? আমার বোধ হয় তা নয়। তোমার পরিচয় আমাকে দাও।"

যুবতীর চক্ষুতে জল আসিল, সে অনেক দিন এমন ভদ্র-ভাষা শ্রবণ করে নাই। যুবতী রুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—"মহাশয়; আপনাকে ভদ্রলোক বলিয়াই বুঝিতেছি। আপনি ঠিক অনুমান করিয়াছেন, আমি হাঘরের মেয়ে নহি; হাঘরেরা আমাকে ধরিয়া আনিয়াছে।"

উদয়েশ্বর বলিল,—"এখনও তোমার মুখে নিষ্পাপের উজ্জ্বল প্রভা বিদ্যমান আছে। বোধ হয়, এখনও তুমি হাঘরদের ব্যবসায়ে মজ নাই।"

যুবতী মাটীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল,—"জীবন থাকিতে সতীত্ব নষ্ট করিব না। আমি কাঙ্গালিনী, সতীত্বই কাঙ্গালিনীর সম্বল! কিন্তু ভিক্ষায় কিছু রোজগার না হইলে, যার বাড়ী আছি, সে বড় মারে,—সমস্ত দিন খাইতে দেয় না। আজ সারা দিন আমার খাওয়া হয় নি।"

উদয়েশ্বর তাঁহার চাপকানের পকেটে হাত দিলেন, চারিটি টাকা ও তিন আনা পয়সা ছিল,—সেগুলি যুবতীর হাতে দিয়া বলিলেন,—"আমার আর নাই।"

যুবতী তাহা গ্রহণ করিয়া বলিল,—"আজ ভিক্ষা লইয়া না যাইতে পারিলে বড় মার খাইতাম। খাইতে পাইতাম না। আপনি আমার জীবনদাতা। জীবনদাতার নামটি শুনিয়া হৃদয়ের ভিত্তিতে খোদিয়া রাখিতে চাহি।"

উদয়। আমার নাম উদয়েশ্বর শর্ম্মা। যদি পারি, তোমার উদ্ধার করিব।

যুবতী। না, মহাশয়; অমন কাজে হাত দিবেন না। হাঘরেদের অত্যাচার বড় অধিক,—নবাব বাহাদুর পর্য্যন্ত হাঘরেদের অত্যাচারে ভীত। আমার উপকারীর কথা ভুলিব না।

উদয়েশ্বর চন্দ্রালোক-প্রদীপ্ত প্রকৃতির মধ্যে সেই সুন্দর যৌবন-দীপ্ত মুখখানির প্রতি একবার চাহিল,—চাহিয়া বলিল,—"তবে যাই ?"

যুবতী কোন কথা কহিল না। তাহার স্থির ভাস্বর চক্ষুর দীপ্তি যেন উদয়কে বলিতেছিল,—"ফেলিয়া যাবে ?—যাবে যদি, আসিলে কেন ?"

উদয়েশ্বর চলিয়া গেল। যুবতীর সুন্দর মুখখানি সৌন্দর্য্যের কাঙ্গাল বা সৌন্দর্য্যের উপাসক উদয়েশ্বরের বুকের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিন্তু প্রাণের ত্বক্ ভেদ করিয়া ভিতর প্রবেশ করিতে পারিল না।

আরও অনেকখানি দূর পথ গিয়া উদয়েশ্বর একটা দ্বিতল বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহার সদর দরজায় দাঁড়াইয়া বাড়ীর ভৃত্যকে ডাক দিল। ভৃত্য আসিয়া উদয়েশ্বরকে দেখিয়া চিনিল এবং তাহার প্রভুকে জানাইল।

অট্টালিকার অধিস্বামী গৌড়েশ্বরের উকীল; নাম জগন্নাথ চৌধুরী, জাতিতে ব্রাহ্মণ। জগন্নাথ চৌধুরী উদয়েশ্বরকে দেখিয়া পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া, তাঁহার বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন।

স্বাগত-প্রশ্নাদির পরে উদয়েশ্বর বলিল,—"আমি বড় কষ্টে আছি; অর্থকষ্ট উপস্থিত হইয়া আমাকে দিশেহারা করিয়া তুলিয়াছে। আজ সন্ধ্যার পর আপনার পত্র পাইলাম। এ সময়ে উহা আমার পক্ষে দেবতার শুভ আশীর্ব্বাদ। আপনি আমার অর্থ কষ্ট ঘুচাইবার কি অবসর পাইয়াছেন ?"

কাষ্ঠাসনখানি উদয়েশ্বরের দিকে আরও একটু প্রচালিত করিয়া জগন্নাথ চৌধুরী বলিলেন,—"তুমি যে কে, তাহা বোধ হয় জান না ?"

উদয়েশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিল,--"বেদান্তশাস্ত্রে পড়িয়াছি, মায়ার বাঁধনে আমি ব্রহ্ম।"

জগন্নাথ চৌধুরী বিরক্তিস্বরে বলিলেন,—"সে কথা কে জিজ্ঞাসা করিতেছে? তুমি হাজরা পরগণার জমীদার প্রাণকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের দৌহিত্র। তিনি নিঃসন্তান। তাঁহার বিষয় এখন তোমারই। সেই বিপুল সম্পত্তি কুড়ি পঁচিশ লক্ষ টাকার হইতে পারে।"

উদয়েশ্বর উৎফুল্ল, উদ্গ্রীব ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন,—"আপনি বলেন কি? আকাশ-কুসুম দেখাইতেছেন নাকি?"

জগ। সত্য,—এখন আমি যা যা বলি, তাই করিতে পারিলে তুমি বিষয় লাভ করিতে পারিবে। প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরীর ভ্রাতা বিষয়ের অংশীদার, দাদার অংশও নিজে লইবার চেষ্টায় আছেন,—সরকারে বয়নামা প্রার্থী; সরকার হইতে ঘোষণা প্রচার হইয়াছে, কেহ উত্তরাধিকারী থাকিলে, একমাসের মধ্যে পরিচয়াদি সহ কাগজ-পত্র দাখিল করিতে হইবে। তুমিই সে সম্পত্তির হক্‌দার।

উদয়। আমি যদি সত্যই প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরীর দৌহিত্র হই, তাহাতেই বা কি হইবে? আমার কাছে কাগজপত্র কিছুই নাই; এমন কি আমি আমার বংশপরিচয়ও জানি না।

জগ। বংশপরিচয় জানিয়া লইতে হইবে।

উদয়। কাহার নিকটে জানিব? আমি কে, কোথায় জন্মিয়াছিলাম, আমার পিতা মাতা কে,--তাঁহারা এখনও জীবিত আছেন কি না, সে সব কিছুই জানি না। কেমন করিয়া আমার বংশ-পরিচয় ঠিক করিব?

জগ। উপায় আছে। তোমাকে যে চেনে, তোমাকে যে জানে, এমন লোকের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে, তাঁহার নিকটেইত

আমি শুনিতে পাইলাম। যদিও তোমার সহিত আগে আলাপ-পরিচয় ছিল,—কিন্তু এ সকল ত জানিতাম না। আর কাগজ-পত্রের কথা যাহা বলিতেছ, তাহাও আমি অনেক সংগ্রহ করিয়াছি। বাকি যাহা, তাহাও শীঘ্র সংগ্রহ করিতে পারিব।

উদয়। যদি এ সকল সত্য হয়, চিরবাধিত হইব! কিন্তু একটা কথা আপনাকে বলিয়া রাখি,—আমি অতিশয় দরিদ্র কা'ল খাইব কি, সে সংস্থান আমার নাই, তথাপি আমি ব্রাহ্মণ,—জানি আমি, টাকা না হইলে মানুষের সুখ হয় না, আশাও আমার উঁচু,—কিন্তু তথাপি আমি ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণত্ব বজায় রাখিয়া টাকা পাওয়া চাই, অর্থাৎ মিথ্যা জাল-জুয়াচুরি করিয়া আমি উপার্জ্জন করিতে চাহি না।

জগ। তুমি কাহার সহিত কথা কহিতেছ, মনে আছে কি?

উদয়। হাঁ, একজন বিখ্যাত উকিলের সহিত কথা কহিতেছি।

জগ। প্রতারণা-প্রবঞ্চনার লোক আমাদের নিকট আসিতে পারে না। তোমাকে এক কাজ করিতে হইবে।

উদয়। আপনি যখন আমার এতদূর হিতৈষী, তখন যাহা বলিবেন, তাহাই করিব।

চৌধুরী। আগামী কল্যই আদালতে একটা দরখাস্ত দিতে হইবে।

উদয়। তাহাতে কি লিখিতে হইবে?

চৌধুরী। লিখিতে হইবে, আমি প্রাণকৃষ্ণ রায়ের দৌহিত্র, তাঁহার বিষয়ের একমাত্র উত্তরাধিকারী। সরকার বাহাদুরের প্রচারপত্র অবগত হইয়া হাজির হইতেছি, কিন্তু আমাকে আরও দুইমাস সময় দিতে আজ্ঞা হয়,—ইহার মধ্যে আমি কাগজ-পত্র দাখিল করিয়া দিব।

উ। যদি বলেন, তাহাই করিব। কিন্তু ঐ সকল করিতে টাকার দরকার—আমার এক পয়সাও নাই, আমি কেমন করিয়া কি করিব?

চৌধুরী। টাকা যাহা লাগিবে আমি দিব, যোগাড়-যন্ত্র যাহা করিতে হয়, তাহাও আমিই করিব।

উদয়। আপনার এই নিস্বার্থ পরহিতৈষণায় আমি আজীবন ঋণী থাকিব।

চৌধুরী। না, না। সে বিবেচনা করিও না। আমি নিস্বার্থ নহি। আমার স্বার্থ আছে বৈ কি!

উদয়। সে সামান্য। আপনি বোধ হয়, আপনার পারিশ্রমিক টাকার কথা বলিতেছেন?

চৌধুরী। সে সামান্যই বটে। কিন্তু সে স্বার্থ নহে,—আমি তোমার জন্য খাটিব,—তোমার জন্য টাকা খরচ করিব, কিন্তু ইহার মূলে আমার এক স্বার্থ আছে,—আমার একটি কন্যা আছে, তাহার নাম মালতী। মালতীকে তোমার বিবাহ করিতে হইবে। তাহা হইলে আমি বুঝিব—এত যত্ন, এত অর্থব্যয় সার্থক হইল,—ঐ অতুল ঐশ্বর্য্য আমার মেয়ে ভোগ করিবে।

বিবাহ! উদয়েশ্বরের সর্ব্বাঙ্গে তড়িচ্ছটা ছুটিয়া গেল। বিবাহ,—তাহাকে না পাইলে জীবন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবে না,—তাহাকে ত পাইবই, তবে আবার অন্যকে বিবাহ করিব কি প্রকারে?

ইহার কিঞ্চিৎ পরেই চৌধুরী মহাশয়ের ভৃত্য আসিয়া বলিল,—"আপনাদের আহারের উদযোগ হইয়াছে, বাটীর মধ্যে চলুন।"

উদয়েশ্বরকে আহারের জন্য অনুরোধ করিয়া, তাহাকে সঙ্গে লইয়া চৌধুরীমহাশয় বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

উদয়েশ্বর মালতীকে দেখিল। মালতী আহারীয় পাত্রদ্বয়ের নিকটে বসিয়া বিড়ালের ক্ষুধিতাকাঙ্ক্ষা হইতে সেগুলিকে রক্ষা করিতেছিল,—কার্য্য-ব্যপদেশে চৌধুরীমহাশয় তাহার নাম করিয়া ডাকিয়াছিলেন।

উদয়েশ্বর তাহাতেই মালতীকে চিনিতে পারিয়াছিল। মালতী ষোড়শী—যৌবনের নবীন তরল অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সে দেহ ঘিরিয়া রাখিয়াছে। উদয়েশ্বর সে রূপ দেখিয়া প্রীত হইল, কিন্তু মুগ্ধ হইল না। মুগ্ধ সে হয় না। মনে মনে ভাবিল, এ রূপ উপভোগ্য বটে, কিন্তু পূজা করিবার নহে। যাহা হউক, যদি এই উপলক্ষে অত টাকা পাওয়া যায়, ইহাকে বিবাহ করিতে দোষ কি? বিবাহ এক,—প্রেম আর!

ভ্রান্ত যুবক ইহাই স্থির করিল। তারপরে, বাহিরে আসিয়া উকীলের সহিত অন্যান্য পরামর্শ স্থির করিয়া এবং বিবাহে সম্মতি জানাইয়া বিদায় লইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পর দিন, যখন দ্বিপ্রহরের রৌদ্র একটু স্তিমিত হইয়া তৃতীয় প্রহরের নিস্তব্ধকোলে ঢলিয়া পড়িতেছিল, সেই সময় উদয়েশ্বর আদালত হইতে আবশ্যকীয় কাজ-কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া, তাহার ক্ষুদ্র, নিস্তব্ধ, শোভা-সৌন্দর্য্যহীন বাসায় ফিরিয়া যাইতেছিল।

সৌন্দর্য্য সন্দর্শন উদয়েশ্বরের বাতিক। যে পথে যাইতেছিল, সেই পথের ধারে সুবিখ্যাত চিত্রকর মহিমাচরণের বাড়ী। মহিমাচরণের চিত্র-শিল্পের সুখ্যাতি তখন ভারতের সর্ব্বত্র। বড় বড় লোকের ছবি আঁকিয়া মহিমাচরণ বিশেষ প্রতিপত্তি ও প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাহার চিত্রাগারে অসংখ্য চিত্র সাজান,—এ পথে যাইতে হইলে উদয়েশ্বর একবার তাহার দোকানে প্রবেশ করিয়া কিয়ৎক্ষণ তাহা দর্শন না করিয়া যাইত না। আজি আবার তাহাতে চিত্তের একটু স্ফূর্ত্তিও আছে। কেননা, উকীলের কার্য্যালয়ে গিয়া যতদূর জানা হইল, তাহাতে বুঝিতে পারিয়াছে,--প্রাণকৃষ্ণ রায়ের অগাধ সম্পত্তি নিশ্চয়ই করায়ত্ত হইবে। আরও বিশেষ ভরসার কথা এই যে, বিষয় পাইবার বিষয়ে যদি সন্দেহ থাকিত, তবে কখনই উকীলমহাশয় মেয়ের বিবাহ এই দীনহীনের সহিত দিতে চেষ্টা করিতেন না। কাজেই তাহার মনে আশার তীব্র আলোক প্রোজ্জ্বল প্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আলোর ধারে অন্ধকার বিশ্বপ্রকৃতির চির নিয়মিত বিধি-লিপি।

উদয়েশ্বরের মনে হইতেছিল, যদি এতটা বিষয় পাই, সুখী হইব। কিন্তু সুখের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইবে কেমন করিয়া? সেই মানসী প্রতিমাকে না পাইলে কেবল ঐশ্বর্য্যেই কি সুখ হইবে? সে কি আসিবে?

নিশ্চয় আসিবে!—তাহার মনে হইল, হয়ত তাহার সেই চিরাকাঙ্ক্ষিত প্রিয়তম, তাহারই দ্বারে আসিয়া মনোবেদনায় ফিরিয়া গিয়াছে; সে ফিরিয়া চাহে নাই, এবং তাহার কনক-কিঙ্কিনীর করুণ-নিক্কণ—হৃদয়ের উদ্বেলিত ঝটিকা শুনিতে দেয় নাই।

উদয়েশ্বর এমনই হৃদয় লইয়া চিত্রশালায় উপস্থিত হইল। সেখানে মহিমাচরণ একখানি কাষ্ঠাসনে একটি যুবককে বসাইয়া তুলি ধরিয়া তাহার দিব্যকান্তি অাঁকিতেছিল। উদয়েশ্বর সেইস্থানে উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়া সেই যুবকের মুখের দিকে চাহিল,—যুবক স্থির, নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছে। আ মরি! কি রূপ! উদয়েশ্বর অনিমিক্‌লোচনে তাহাকে দেখিল। উদয়েশ্বর যেন তাহাকে আজন্ম দেখিয়া আসিয়াছেন,—এ যে, তাঁহারই ধ্যানের ছবি। সেই মানসী প্রতিমার মুখ, চোখ। সেই রং, সেই ভাব—তবে এ পুরুষ কেন? উদয়েশ্বরের অন্তরাত্মা বলিল,—"আবরণ ভেদ কর। দেখিবে, এ আমারই আরাধ্যা দেবী-প্রতিমা। ইহাকেই জন্ম জন্ম ধরিয়া ভালবাসিয়া আসিয়াছি। ইহারই চরণ-তলে হৃদয় বিক্রীত—এই সেই।"

উদয়েশ্বর একটু দূরে একখানা কাষ্ঠাসন টানিয়া লইয়া উপবেশন করিলেন এবং স্খলিত-কণ্ঠ নিদাঘের চাতক যেমন নীরদের প্রতি চাহিয়া থাকে, সেইরূপ সেই যুবকের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

একজন আর একজনের দিকে হৃদয়ের সমস্ত বৃত্তি একমুখী করিয়া থাহিয়া থাকিলে, সে নিশ্চয়ই চাহিবে। যুবকও চাহিল,—চোখে চোখে মিলিল। যুবক একটু মৃদু হাসিয়া চিত্রকরকে বলিল,—"আজ এই পর্য্যন্ত থাক্, আমার কষ্ট হইতেছে।"

চিত্রকর তুলিকা তুলিল, যুবক উঠিয়া বাহির হইল। চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, যুবক যেন সেই প্রকারে উদয়েশ্বরকে

আকর্ষণ করিল। উদয়েশ্বর উঠিয়া যুবকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহির হইল।

দুই জনেই রাস্তার উপরে। উদয়েশ্বরের হৃদয়ে তড়িৎ-ক্রিয়া হইতেছিল। অন্তরের অন্তস্তল হইতে কে যেন লুঠিয়া লুঠিয়া বলিতে-ছিল,—"এ বিরল আবরণ ভেদ কর; দেখিবে ইহাকেই শত শত বার শত শত রূপে ভাল বাসিয়াছ,—ইহারই আকুল-আকর্ষণে যুগে যুগে জন্মে জন্মে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ।

উদয়েশ্বর কোন কথা কহিতে পারিতেছিল না। যুবক মৃদু হাসিয়া উদয়েশ্বরের আকুল অন্তরে এক উগ্রসুধা বিকীর্ণ করিয়া দিয়া বলিল,— "তুমি আমার দিকে ওরূপে চাহিতেছ কেন?"

উদয়েশ্বর কি উত্তর দিবে খুঁজিয়া পাইল না। কথায় এত মাধুরী— এমন মোহিনী শক্তি আছে, তাহাত উদয় পূর্ব্বে জানিত না।

যুবক পুনরপি বলিল,—"যদি আমার সহিত কথা না কহিবে, পিছু পিছু আসিলে কেন? আমি তবে যাই?"

উদয়েশ্বর আনন্দোচ্ছল, বেদনাপ্লুত, উচ্ছ্বাসাকুল হৃদয় চাপিয়া বলিল,—"তুমি কে? আমি যেন তোমায় চিনি,—কত দিন হইতে যেন চিনি! তোমায় যেন দেবীরূপে চিনি,—কিন্তু তুমি পুরুষ কেন?"

যুবক উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিল,—"তুমি কি বলিলে, আমি তাহার একটি বর্ণও বুঝিলাম না।"

উদয়। বুঝাইতে পারিতেছি না,—তোমায় দেখিয়া আমি আপ-নাকেই আপনি বুঝিতে পারিতেছি না।

যুবক। তবে আমি যাই?

উদয়। কোথায়?

যুবক। আমার বাড়ী।

উদয়। সে কোথায় ?

যুবক। কেন, আমার বাড়ীর খোঁজে তোমার প্রয়োজন কি ?

উদয়। আমি সেখানে যাইব।

যুবক। কি প্রয়োজন ?

উদয়। তোমায় দেখিতে।

যুবক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল! তাহার হাসি যেন লহরে লহরে ক্রীড়া করিয়া, মণ্ডলে মণ্ডলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উদয়েশ্বরের দর্শন ও স্পর্শন ইন্দ্রিয়কে স্বর্গ-সুখ উপভোগ করাইল। যুবক হাসিয়া বলিল, "আমার কি দেখিবে ? কেন দেখিবে ?

উদয়। লোকে চাঁদ দেখিয়া সুখী হয়, কেন সুখী হয়—তাহা বোধ হয় বুঝাইয়া বলিতে পারে না। আমি বোধ হয়, সারা জীবন ধরিয়া তোমাকে দেখিব।

যুবক আবার হাসিল। হাসিয়া বলিল, "তবে যাইও।"

উদয়। কোথায় যাইব ?

যুবক। কালিন্দীনদীর তীরে, মোকদ্দম্ সাহের আড্ডায় থাকি। আমার অনুসন্ধানে সন্ধ্যার পরে যাইও। দিনেও বেলা এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াই।

এই সময় একখানা শিবিকা আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল, যুবক হাসিতে হাসিতে তাহাতে আরোহণ করিয়া চলিয়া গেল।

বর্ষার প্রথম বারিপাতে যেমন দীর্ণ-বিদীর্ণ শুষ্ক ভূমিতে সহসা শত তৃণের উদ্ভব, তেমতি উদয়েশ্বরের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত হৃদয়ে যেন আশা ও আনন্দের শত শষ্প সমুদ্ভব হইল। কিন্তু একটা মর্ম্মন্তুদ বায়ু একবার সেই শষ্পের উপর দিয়া যেন কাঁদিয়া বলিয়া গেল,—"এ যে পুরুষ!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রাচীন গৌড়নগর কালিন্দী, মহানন্দা ও গঙ্গায় বেষ্টিত ত্রিকোণ ভূখণ্ডে অবস্থিত ছিল।

কালিন্দীর তীরে মোক্‌দুম শাহ নামক এক যাদুবিদ্যা-বিশারদ মুসলমান ফকিরের আড্ডা। ইঁহার আড্ডা কেবল যে, এই স্থলেই ছিল, তাহা নহে। বর্ত্তমান মালদহ জেলার অনেক স্থলেই ইঁহার আড্ডা ছিল, এখনও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এখন পর্য্যন্তও ইহার অদ্ভুত ক্ষমতার কথা লোকের মুখে মুখে ঘোষিত হইতেছে। ইনি সাধন-বলে বহিঃপ্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া বিভূতিবিদ্যায় বিখ্যাত হইয়াছিলেন। প্রবাদ, ফকির নাকি বনের ভীষণ ব্যাঘ্রগুলিকে পর্য্যন্ত বশীভূত করিয়া রাখিতে পারিতেন; এবং ব্যাঘ্রের উপরে আরোহণ করিয়া সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতেন। তদ্ভিন্ন আরও নানাপ্রকার অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য তাঁহার ছিল। এখনও পর্য্যন্ত তদ্দেশে মোকদুম শা ফকিরের নামে সকলে ভক্তি করিয়া থাকে।

উদয়েশ্বর যুবককে পরিত্যাগ করিয়া অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলেন না, উৎক্ষিপ্ত লোষ্ট্র যেমন মাধ্যাকর্ষণের বলে ছুটিয়া নিম্নমুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, উদয়েশ্বরও তদ্রূপ আত্ম-বিস্মৃত হইয়া সন্ধ্যার সময় মোকদুম শার আড্ডায় গিয়া উপস্থিত হইল।

সে স্থানটি অতি মনোহর। পশ্চিমে বিস্তীর্ণ-জলাশয়-কালিন্দী তাহার জল-বাহু প্রসারিত করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত স্নিগ্ধ করিতেছে। তীরে শ্যাম-শষ্পাস্তৃত প্রান্তর। প্রান্তর মধ্যে বিবিধ বৃক্ষ লতা। আম্রবৃক্ষই সমধিক। রঞ্জন, চম্পক, কুটজ, পারুল প্রভৃতি বৃক্ষও অল্প নহে।

ক্বচিৎ বাতাবীলেবুর বৃক্ষ, ক্বচিৎ কুঞ্জলতার ঝোপ, ক্বচিৎ কাঁটালী চাঁপার ঝাড়। বসন্তে বৃক্ষে বৃক্ষে কুসুম-সুষমা।

উদ্যান-মধ্যে দূরে দূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি কুটীর। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে,—প্রায় সকল কুটীরে কুটীরে ক্ষুদ্র দীপশিখায় সান্ধ্যবায়ু-বিকম্পিত কম্পন-আলোক-কিরণ।

উদয়েশ্বর সেখানকার শোভায় মুগ্ধ হইলেন ও শ্রান্তি দূর করিলেন, কিন্তু যাইবেন কোথায়? এত কুটীরের মধ্যে সেই যুবক কোথায় থাকেন, তাহার সন্ধান কেমন করিয়া হয়?

একজন লোক, স্কন্ধে একটা মৃৎকলসী লইয়া কালিন্দীতে জল লইতে আসিতেছিল। উদয়েশ্বর তাহাকে দেখিয়াই বুঝিলেন, লোকটা এই কুটীরাশ্রমের একজন ভৃত্য হইবে। তাহাকে যুবকের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন,—বর্ণনা ও অবস্থা শুনিয়া ভৃত্যটি একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "মবারক শার নিকটে যান।"

উদয়। মবারক শা কে?

ভৃত্য। এই বাগানের সর্দ্দার। এই পথে গিয়া তাঁহার নাম করিলেই যে কেহ দেখাইয়া দিবে।

উদয়েশ্বর চলিয়া গেলেন। বাগানের মধ্যে গিয়া, সহজেই মবারক শার সাক্ষাৎ পাইলেন। মবারক শার দেহ দীর্ঘ ও মাংসল, বর্ণ গৌর;—পরিধানে গেরুয়া কাপড়; দেখিলে ভক্তি হয়। উদয়েশ্বর তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া আপনার ঈপ্সিত বিষয়ের কথা বলিলেন।

মবারক হাসিয়া বলিলেন,—"বেশ, দেখা হইবে, তার আর আশ্চর্য্য কি! তবে এখন সে কোথায় আছে,—জানি না। এই পাশেই তার ঘর—ঘরে দরোজা ভেজান আছে,—চলুন আমি আপনাকে রাখিয়া আসি।"

মবারক উদয়েশ্বরকে পার্শ্বের গৃহে লইয়া গেলেন। সে চাটাইয়ের বেড়া দেওয়া একখানি পর্ণ-কুটীর। কিন্তু গৃহের মধ্যে উত্তমরূপে সাজান, এবং বহু মূল্যবান দ্রব্যাদিতে পরিশোভিত।

একটি সুন্দর মখমলাবৃত শয্যা পাতা ছিল, তাহার উপরে উদয়েশ্বরকে বসাইয়া মবারক বলিলেন,—"আপনার আহারের কি হইবে?"

উদয়েশ্বর কৃতজ্ঞ-নম্রস্বরে বলিলেন,—"সে জন্য আপনাকে বিশেষ কোন চেষ্টা করিতে হইবে না।"

মবারক ঔদাস্য-ব্যঞ্জক হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"বিশেষ কোন চেষ্টা না করি, সামান্যও ত করিতে হইবে? আপনি অতিথি। অতিথিসৎকারই ফকিরের ধর্ম্ম। আরও একটি কথা।"—

উদয়। কি কথা মহাশয়?

মবারক। আপনি বোধ হয় হিন্দু হইবেন? আমরা সকলেই মুসলমান। আপনার আহারের কি হইবে? কিন্তু পীর মোকদুম শার প্রতি হিন্দু-মুসলমানে সমান ভাবে ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। অনেক হিন্দু আমাদের আশ্রমে আহার করিয়া থাকেন।

উদয়েশ্বর সে কথায় স্বীকৃত হইতে পারিলেন না। তিনি ব্রাহ্মণ,—ব্রাহ্মণত্বের পরম গৌরবান্বিত উদয়েশ্বর মুসলমানের জলটুকুও স্পর্শ করিতে পারিবেন না। তিনি বলিলেন,—"মহাশয়; আপনার ভদ্র ব্যবহারে আমি পরম আপ্যায়িত হইলাম, কিন্তু আমি রাত্রে কিছুই আহার করিব না।"

মবারক। এখানে কেহ উপবাসী থাকিতে পারে না। আপনি আসুন,—নিজে ঐ পাত্রটি লইয়া আসুন; নদী হইতে জল লইয়া আসিবেন, তারপরে সুপক্ক ফলাদি আছে, তাহাই খাইবেন।

উদয়েশ্বর তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। তখন মবারক একজন ভৃত্যকে

ডাকিয়া উদয়েশ্বরের সঙ্গে দিলেন,—উদয়েশ্বর নদী হইতে জল লইয়া আসিলেন।

মবারক বাহিরে থাকিলেন,—যে গৃহে হিন্দু জল লইয়া আসিয়াছেন, সে গৃহে তিনি যাইতে পারিবেন না। বাহির হইতে ফলাদি গৃহমধ্যে প্রদান করিলেন। বলিলেন, "আপনি আহার করিয়া এই স্থানেই থাকুন, জাহানারা আসিলে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।"

মবারক চলিয়া গেলেন। উদয়েশ্বরের হৃদয়-তন্ত্রী বড় বেসুরা বাজিয়া উঠিল,—জাহানারা! জাহানারা ত মেয়ে মানুষের নাম! তবে কি সেই যুবক, যুবতী? —আমার ধ্যানের প্রতিমা রমণী—জাহানারাও কি রমণী? কিন্তু—কিন্তু—

সভয়ে উদয়েশ্বর দেখিলেন, একজন অতি দীর্ঘাকার মনুষ্য শ্বেত বস্ত্রে দেহ আচ্ছন্ন করিয়া হন হন করিয়া সেই গৃহের দরোজায় সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। উদয়েশ্বর স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন,—তাহার সেই অস্বাভাবিক দীর্ঘ দেহের দীর্ঘ চক্ষু দুইটি হইতে যেন অগ্নির ঝলক বহিয়া গেল।

উদয়েশ্বর চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন,—আর কোথাও সে মূর্ত্তিকে দেখিতে পাইলেন না। তখন চন্দ্রদেব দিক্‌চক্রবাল হইতে মন্থরগমনে উত্থান করিয়া শতশাখ-বৃক্ষ-শ্রেণীর চিক্কণ-শ্যাম পত্রাবলির মধ্যে কখনও দৃশ্য, কখনও অদৃশ্য হইতেছিলেন এবং বাগানে পারুল, কুটজ ও বাতাবী ফুলের মধুর গন্ধ সেই শান্ত রজনীতে মায়া-মাধুরীর সঞ্চার করিতেছিল।

উদয়েশ্বর, মুগ্ধ ও চকিত হৃদয়ে বাগানের দিকে চাহিতেছিলেন,—সহসা বৃক্ষ-পত্র কাঁপাইয়া বৃক্ষশাখাভঙ্গের শব্দ তুলিয়া একটা ঝটিকাবেগ উত্থিত হইল,—মুহূর্ত্তে কোথাও কিছু নাই,—সেই অমিয় জ্যোৎস্না-মাখান স্নিগ্ধ-শ্রী। উদয়েশ্বর ভীত হইলেন,—এ কি ভৌতিক কাণ্ড।

উদয়েশ্বর চকিতনেত্রে চাহিয়া দেখিলেন,—সেই চাটাইঘেরা গৃহখানির ফাঁকে ফাঁকে যেন অগণ্য নর-কঙ্কাল ঝুলিতেছে। কি ভীষণ! নরকঙ্কালেরা হো হো করিয়া বিকট হাসি হাসিয়া উঠিল,—বাহিরে প্রলয়ের নিশ্বাসের মত ঝটিকা-প্রবাহ আবার উঠিয়া পড়িয়া মুহুর্মুহুঃ বজ্রনির্ঘোষের শব্দ করিতে লাগিল,—শত আর্ত্তের কণ্ঠস্বর এককালীন উত্থিত হইল,—একটা দম্‌কা বাতাসে গৃহস্থিত মৃৎপ্রদীপের ক্ষীণ আলোকটি নিবিয়া গেল। অন্ধকার—গাঢ় অন্ধকার—অনন্ত, দুর্ভেদ্য, মরণ-পথের অন্ধকার—আর বোধ হইতে লাগিল, যেন সেই নর-কঙ্কালগুলা নামিয়া আসিয়া তাহাদের মেদ-মজ্জা-ত্বকশূন্য অস্থিময় হাতগুলা দিয়া উদয়েশ্বরকে জড়াইয়া ধরিতে আসিতেছে,—কেহ কেহ বা মাংসশূন্য দন্তপংক্তি বাহির করিয়া উদয়েশ্বরকে চর্ব্বণ করিতে ছুটিতেছে! উদয়েশ্বর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছিলেন,—সহসা দপ্ করিয়া আলো জ্বলিল, যেন একেবারে শত বিজলী জ্বলিয়া উঠিল,—শ্বেত শুভ্র উজ্জ্বল মধুর আলোক। যেন স্বর্গ-পথের আলোক! উদয়েশ্বর যদিও মূর্চ্ছিত হইয়া মাটিতে পড়ে নাই, তথাপি যে তাহার সম্যক্-জ্ঞান ছিল, তাহা নহে। চেতনে-অচেতন স্তব্ধ হৃদয়ের আকুল-নয়নে উদয়েশ্বর দেখিলেন,—তিনটি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্প বাতাসে জড়াইয়া উড়িয়া আসিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল,—একবার আলোক নিবিল, আবার জ্বলিল,—সেই উজ্জ্বল আলোকে মুগ্ধ নয়নে উদয়েশ্বর দেখিল তিনখানি দেবী-প্রতিমা।

দেবীত্রয় পাশাপাশি অবস্থিতা। যেন আশ্বিনের শারদীয়া প্রতিমা—পাশাপাশি লক্ষ্মী-সরস্বতী,—মধ্যস্থলে ভগবতী। উদয়েশ্বর মোহাকুলিত নয়নে ভীত-চকিত-দৃষ্টে চাহিয়া দেখিল, মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া তাঁহার আজন্মের ধ্যানধারণার মানসী-প্রতিমা,—মুখে হাসি নাই, কিন্তু আকর্ষণের

আকুলতায় পূর্ণ,—শতচাঁদের শোভা তাহাতে প্রতিভাত। সে মুখ দেখিয়া, সে যৌবন-সৌন্দর্য্য দেখিয়া উদয়েশ্বর আকুল হইল। তাহার পার্শ্বে সৌন্দর্য্যের নবনলিনী মালতী। মুখে হাসির সুধাধারা বহিতেছে—সর্ব্বাঙ্গে প্রসন্নতার ছটা। দক্ষিণ পার্শ্বে লোল-চর্ম্মা এক বৃদ্ধা।

উদয়েশ্বর অশমিত নিশ্বাসে দেখিল, ঐ মূর্ত্তিত্রয়ের হস্তে একটি অদৃষ্ট-তন্তু ফিরান রহিয়াছে। বৃদ্ধার হস্তে একখানি তালপত্রের পুঁথি। বৃদ্ধা গম্ভীর অথচ মধুর স্বরে ডাকিয়া বলিলেন,—"উদয়েশ্বর! আমি তোমার মাতৃ-রূপা জননী-শক্তি—এই দেখ, আমার বাম হস্তে তোমার অদৃষ্ট-লিপির পুরাণ পুঁথি। আর এই যে, আমার হাতে তোমার অদৃষ্ট-তন্তু দেখিতেছ,—ইহার দুইটি অগ্রভাগ দুইটী রমণী টানিয়া লইয়াছে। কিন্তু জন-শক্তি বা মাতৃ-শক্তির একটা প্রবল সামর্থ্য আছে, তাহা আমারই হাতে। দুইটি অগ্রভাগ দুইজনে টানিয়া লইয়াছে। অদৃষ্ট-তন্তুকে সোজা কথায় কর্ম্মসূত্র বলা যাইতে পারে। তোমাকে ঐ সূত্রে কত খেলাইবে, কত নাচাইবে, তোমার সোণার দেহ চূর্ণ করিয়া ভাঙ্গিয়া দিবে। সাবধান! পুরুষকার বলিয়া একটা জিনিষ আছে,—সেটাকে অবলম্বন করিলে, আর অদৃষ্ট-তন্তু-তাড়নায় বায়ু-বিচলিত তুলার মত ছুটিয়া বেড়াইতে হয় না। ঐ দেখ, চাহিয়া দেখ—ধীরে স্থিরে চাহিয়া দেখ,—তোমার অদৃষ্ট-তন্তু হাতে করিয়া উহারাও জন্মে জন্মে তোমারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কত প্রেম, কত আদর, কত হিংসা, কত দ্বেষ লইয়া তোমার পিছু পিছু ছুটিতেছে—তাহা বলিবার নহে।"

উদয়েশ্বর দেখিল, বৃদ্ধার কথা সমাপ্ত হইবামাত্র, তাহার মানসী-প্রতিমা প্রেম-কৌটিল্য চক্ষুতে চাহিয়া আকুল-আহ্বান করিল। মালতী প্রেমস্নিগ্ধ চক্ষুতে ডাকিয়া ডাকিয়া নিস্তব্ধ হইল।

সহসা বিজলীর বিকাশ থামিয়া গেল। সমস্ত গৃহ অন্ধকার,—বাহিরে আবার ঝড়ের শব্দ। আবার নর-কঙ্কালের বিকট তাণ্ডব! উদয়েশ্বর মূর্চ্ছিত হইয়া শয্যার উপরে ঢলিয়া পড়িলেন।

কতক্ষণ পরে, পূর্ব্বাশার গগন-সরোবরে ধীরে ধীরে উষারাগের রক্তোৎপল বিকশিত হইয়া উঠিল। দধিয়াল, দিবসের স্বাগত-গীতি গাহিতে আরম্ভ করিল,—বাতাবীফুলের সৌরভ যেন আরও একটু ঘোরাল হইয়া উঠিল। সেই উষানিল-বীজনে উদয়েশ্বর চেতনা প্রাপ্ত হইলেন। চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন,—দিকে দিকে প্রকৃতির অঙ্গে নবীন সুষমা ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

পূর্ব্বরাত্রের সমস্ত ঘটনা তাঁহার স্মৃতি-পথে উদিত হইল,—সেই সকল ভীষণতার মধ্যে মূর্ত্তিত্রয়ের কথা মনে পড়িল,—সহসা সেই মুহূর্ত্তেই প্রকৃতির উষাকে লজ্জা দিয়া মানুষী উষা উদয়েশ্বরের সম্মুখে আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল;—"তুমি কা'লই আসিয়াছিলে? আমি আমার একটি সখীর নিমন্ত্রণে তাঁহার ঘরে কা'লরাত্রে ছিলাম। এখন মবারকের মিকট তোমার আগমনবার্ত্তা শুনিয়াই আসিতেছি। রাত্রে কোন কষ্ট হয় নাই ত?"

উদয়েশ্বর স্তম্ভিত। জন্মজন্মান্তরের ধ্যানের প্রতিমা—শত চাঁদ নিঙড়ান সৌন্দর্য্যের প্রতিমা,—স্বপ্ন-দৃষ্ট চিত্র-প্রতিমা,—এ ত রমণী!

উদয়েশ্বর বলিলেন,—"কা'ল তুমি যে পুরুষ ছিলে?"

রমণী হাসিয়া বলিল,—"তুমি চাহ রমণী, আমি পুরুষ থাকিলে চলিবে কেন?"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সে দিন ভাদ্রমাসের শুক্লা একাদশী। দিবসের অবসান সময়;—প্রকৃতি হাস্যমুখী। শারদ-অপরাহ্নে বর্ষাধৌত প্রকৃতির নয়ন-মুগ্ধকর স্নিগ্ধ শ্যামল-শ্রী, রৌদ্রের হিরণ্ময়ী আভা; পথে ধূলিরাশির অপ্রাচুর্য্য, দিঙ্মণ্ডলের প্রসন্নভাব, নদীতীরে কাশকুসুমের বিকাশ, সুনীল অম্বরপথে নির্গলিতাম্বুগর্ভ অভ্রশুভ্র মেঘের নীরব নিশ্চিন্ত লঘুগতি—এ সকল বিমল শোভা,—ধরাতলে স্বর্গ-শোভার ক্ষীণ বিকাশ।

উদয়েশ্বর আজি সারা দিবস ম্রিয়মাণ। তাহার অন্তর রাজ্যের উপর দিয়া যেন আজি একটা ঝটিকা প্রবাহ বহিয়া গিয়াছে। সে বুঝিতে পারে নাই—এ কিসের রহস্য, এ কেমন ঝটিকা! দিবসের অবসান-মুহূর্ত্তে উদয়েশ্বর তাহার ক্ষুদ্র গৃহের বারেণ্ডায় বসিয়া উদাস-নয়নে আকাশের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছিল? দূরে—কাহাদের গৃহ-ছাদ হইতে তাহারই হৃদয়ের মত বাঁশির উচ্চ, অত্যন্ত করুণ সুর যেন সেই ছায়াচ্ছন্ন স্তব্ধ সান্ধ্যপ্রকৃতির মাতৃ-বক্ষে মর্ম্মাহত বেদনাকাতর সন্তান-জীবনের নিদারুণ ক্ষোভ ও হাহাকারের ন্যায় ধ্বনিত হইতেছিল।

উদয়েশ্বর ভাবিতেছিল, জগৎটা কি রহস্যের অক্ষয় খনিয়া? ইহাতে কত রহস্য পরিপূর্ণ আছে, তাহা কি কেহই বুঝিতে সক্ষম নহে? আর মানুষের প্রাণ, এ প্রাণে এত আকুল-আকাঙ্ক্ষা কেন? মানুষ হইয়া মানুষের জন্য এত প্রাণ কাঁদে কেন? কে সে? সেওত মানুষ,—আমিও মানুষ। মানুষ হইয়া মানুষ লইয়া কি করিব? জাহানারা কি মানুষী,—না অপদেবতা? তাহার কথা, তাহার ভাব, আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। আজি ছয়মাস অবধি তাহাকে দেখিয়া

আসিতেছি—ছয়মাস ধরিয়া তাহার সহিত আলাপ-আপ্যায়িত করিয়া আসিতেছি,—প্রাণপণে তাহাকে অধ্যয়ন করিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে বুঝিতে পারিলাম না,—তাহার হৃদয়ের গুপ্ত-রহস্য একবর্ণও আমার হৃদ্‌বোধ হইল না। তবু কিন্তু তাহার জন্য প্রাণের আকুল আকাঙ্ক্ষা—জীবনের প্রবল আকর্ষণ বিদূরিত হইল না। কেন এমন হয় ?

উদয়েশ্বরের সহসা স্মরণ হইল, আমি যে দিন সর্ব্বপ্রথমে মোকত্থম শাহার বাগানে গমন করিয়াছিলাম, সেদিন যে প্রহেলিকাপূর্ণ স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, জাগ্রতে যে বিভীষিকা দর্শন করিয়াছিলাম, তাহার অর্থ কি ? জানিনা, সে সকলের জটিল কোন রহস্য আছে কি না !

উকীল জগন্নাথ চৌধুরীকে এত দিন কথার ছলনে নিবৃত্তি করিয়া রাখিয়াছি,—আর চলে না, আগামী পরশ্বঃ আমার বিষয় পাইবার শেষ মোকদ্দমার দিন,—এই দিনেই আমি সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইয়া তায়দাদ প্রাপ্ত হইব। কিন্তু জগন্নাথ চৌধুরী বলিতেছেন—আগামী কল্য আমার কন্যা মালতীর সহিত বিবাহ না করিলে, আমি কিছুতেই তোমায় বিষয় পাইতে দিব না। যে সকল কাগজ এখনও দেখানও হয় নাই—যাহা আমার নিকট আছে—যাহা না দেখাইলে বিষয় পাইবে না,—তাহা দেখাইব না। আমার কন্যার সহিত বিবাহ করিবে—আমার কন্যা সুখী হইবে বলিয়াইত আমার এত আয়োজন! কি করি,—এতটা বিষয়! ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য হাত ছাড়া হয় ! রমণীর সৌন্দর্য্য যেমন মানুষের প্রলোভনীয়—অর্থও তেমনি প্রয়োজনীয়! মালতীও সুন্দরী! কিন্তু স্বপ্নে কি দেখিয়াছিলাম ?—মালতী, জাহানারা ও এক বৃদ্ধা, আমার অদৃষ্ট-তন্তু হাতে করিয়া রহিয়াছে! সে কি কথা ? আমার, অদৃষ্ট-তন্তু কতকগুলি

স্ত্রীলোকের হাতে! এ কোথাকার রহস্য! এ রহস্যের মর্ম্মোভেদ কে করিবে?” স্বপ্ন হয়ত অমূলক চিন্তা মাত্র। কিন্তু মালতীকে বিবাহ করিলে জাহানারাকে পাইব কি? সে বুঝিবে আমি তাহাকে ভাল বাসি না, তবে সে আমায় ভাল বাসে না—সে ভাল বাসিতে জানে না। সে জানে কলা-বিদ্যা,—সে জানে স্বাধীনতার আনন্দ করিতে; সে ভালবাসিতে জানে না। আমি অনেক প্রকারে দেখিয়াছি, সে এ পথের পথিক নহে—এ রসের আস্বাদ সে পায় নাই, অথবা আমার ভুল হইতে পারে—সেও আমার মত মনে মনে কাহাকে ভালবাসে! ভালবাসা যে কাহার কোথায়,—কে তাহা বলিতে পারে? কিন্তু জাহানারা যদি আমাকে ভালই বাসিত, তবে আমি কি করিতাম—সে যে মুসলমান!

মালতীকে বিবাহ করিয়া সুখী হই না কেন? ঘর-সংসার পাতাই না কেন?—কিন্তু জাহানারা যে জানিবে আমি তাহাকে ভাল বাসি না, প্রাণ থাকিতে প্রাণে তাহা সহ্য হইবে না। তবে কি করিব,—বিষয়ের মায়া পরিত্যাগ করিয়া কি এ দেশ হইতে চলিয়া যাইব? এখানে থাকিলে বিষয়ের প্রলোভন থাকিবে,—আরও জাহানারা মুসলমান! ব্রাহ্মণ হইয়া মুসলমান-সম্পর্কে যাওয়া আমার শ্রেয়স্কর নহে।

এদিকে সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার ধরণীতল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। উদয়েশ্বর সেই অন্ধকারে ডুবিয়া পড়িয়া আরও অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া ভাবিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল,—স্বপ্ন সত্য হউক, মিথ্যা হউক—ব্যাপার যেরূপ দাঁড়াইতেছে, তাহাতে ইহা মঙ্গলের পথে চলিবে বলিয়া জ্ঞান হইতেছে না। আমার পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ। আমার এখানে কি আছে—এই ভাড়াটে ক্ষুদ্র গৃহ—আর ঐ মাটির আসবাব। মালতী ও জাহানারায় আমার সোণার দেহ চূর্ণ বিচূর্ণ

করিবে—স্বপ্নে এই দৈববাণী শুনিয়াছিলাম—ঘটিয়াও উঠিতেছে তাহাই,—অতএব পথের পথিক পরগৃহবাসী আমার আর এখানে থাকা প্রয়োজন নাই,—জাহানারার ধ্যানের প্রতিমা বুকে লইয়া দেশান্তরে চলিয়া যাই।

উদয়েশ্বর তাহাই স্থির করিয়া, তখনই উঠিয়া তাহার ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে গমন করিল। এবং দীপ জ্বালিয়া সেই রাত্রেই গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

উদয়েশ্বর জাহানারার জন্য অনেক করিয়াছিল। প্রথম দর্শনাবধি আজি ছয়মাস অতীত হইতে চলিল, উদয়েশ্বর তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়াছে, কিন্তু তাহাকে কিছুমাত্র জানিতে পারে নাই। জাহানারা এক অদ্ভুত রকমের রমণী। সে উদয়েশ্বরের দেখা পাইলে প্রাণ ভরিয়াই আমোদ-আহ্লাদ করিয়া থাকে—গান গল্প গুজব সমস্তই করে, কিন্তু প্রণয়ী যাহাতে প্রণয়ের ভাব বুঝিতে পারে, এমন একটু করুণা কখনও উদয়েশ্বর জাহানারাতে দেখিতে পায় নাই। কত প্রকারে—কত ভাবে উদয়েশ্বর আপন প্রাণের লুকান কাহিনী জাহানারাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে, জাহানারা হাসিয়া ব্যঙ্গ করিয়া কথার ছল করিয়া তাহা আকাশে বিলীন করিয়া দিয়াছে। ভালবাসিয়া প্রতিদানে ভালবাসা না মিলিলে স্বার্থময় ভালবাসায় সুখ হয় না—হতাশা জন্মে। উদয়েশ্বরের তাহাই হইয়াছে,—বিশেষতঃ স্বপ্নের একটা বিভীষিকা বা ভয় তাহার অন্তরে জড়াইয়া গিয়াছে। জাহানারার সহিত ইচ্ছা করিয়াই উদয়েশ্বর আজি কয়েকদিন হইতে সাক্ষাৎ করে নাই। অদর্শনে যাতনা আরও বাড়িয়া পড়িয়াছে—উদয়েশ্বরের এস্থান পরিত্যাগের সংকল্প কাজেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়া গেল।

উদয়েশ্বর তাঁহার সামান্য দ্রব্যাদি গুছাইতে বিশেষরূপে ব্যস্ত আছে। সেই অনতি-উজ্জ্বল দীপালোকোদ্ভাসিত ক্ষুদ্র গৃহে জাহানারা উদয়েশ্বরের পরম বিস্ময় উৎপাদন করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দ্রব্যাদির মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার রূপে যেন সমস্ত গৃহখানা জাগিয়া বসিল। সে উদয়েশ্বরের মুখপানে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল,—"তুমি এখান হইতে চলিয়া যাইতেছ কেন? আমায় ভালবাস বলে কি? আমিও ভালবাসি।"

উদয়েশ্বর কম্পিতহৃদয়ে জাহানারার মুখের দিকে চাহিল—সে তখন একটা কাপড়ের পুঁটলী বন্ধনে ব্যাপৃত ছিল—বসিয়া পড়িল। সহসা কোন কথা কহিতে পারিল না। জাহানারার কমণীয় ও রমণীয় তনুলতা, ইহুদী নারীর মত সুঠাম গঠন, আরক্ত কপোলতল, সুগোল কোমল মুখমণ্ডল, অয়ত নয়নের স্নিগ্ধ দৃষ্টি—আর সেই 'আমিও ভাল-বাসি' কথা—একত্রে উদয়েশ্বরের সংজ্ঞা শূন্য করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অনেক অপেক্ষা করিয়াও জাহানারা যখন উদয়েশ্বরের মুখে একটি কথাও শুনিতে পাইল না, তখন পুনরপি বলিল,—"তুমি কি আমার উপর রাগ করিয়াছ? কিন্তু আমার দোষ কি—তোমাতে আমাতে বিবাহ হইবে না।"

উদয়েশ্বর এবার কথা কহিল। বলিল,—"জাহানারা—প্রাণের জাহানারা; আজি আমার মানব-জীবন সার্থক হইল। তুমি আমায় ভালবাস—তোমার মুখে এ কথা শুনিয়া আমি আজি যেরূপ সুখী হইয়াছি—পৃথিবী-পতি হইলেও সেরূপ সুখী হইতে পারিতাম না।"

জাহানারা দাঁড়াইয়াছিল, পার্শ্বপতিত একটা মাছুরের উপরে বসিয়া পড়িয়া বলিল,—"কেন উদয়েশ্বর; তুমি ওকথায় এত সুখী হইলে?"

উদ। কেমন করিয়া বুঝাইব—কেমন করিয়া বলিব, আমি কেন ঐ কথায় অত সুখী হইলাম! বুঝি তাহা বলিবার—বুঝাইবার ভাষা নাই।

জাহা। আমার ভালবাসাই কি তাহার কারণ? আর তাহার প্রতিদানে ভালবাসা পাইবার আশাই কি সে সুখের কারণ উদয়েশ্বর? যদি তাহাই হয়—তবে এ পাপ হইতে ফিরিয়া পড়! ভালবাসিয়া ভালবাসা পাইবার আশা করা যাহা, বিষধর সর্পের মুখচুম্বন করাও তাহা।

উদ। কেন জাহানারা?

জাহা। স্ত্রীজাতি অবিশ্বাসী।

উদ। আর, পুরুষই কি কেবল বিশ্বাসী। কোন কোন স্ত্রীলোক যেমন অবিশ্বাসী,—অধিকাংশ পুরুষও তদ্রূপ অবিশ্বাসী।

জাহা। প্রণয়ে সেই ভয়—ভালবাসার মধ্যে ঐ একটা প্রবল কীট। দেখিয়া শুনিয়া বুঝিতে পারা যায়, ভালবাসা কুসুমের মধ্যে ঐ কীট প্রবেশ করিয়া তাহা নষ্ট করিয়া দেয়। তবে সাধ করিয়া কেন সে জ্বালায় জ্বলিতে যাওয়া? সুখের বেদনা সাধে কেন সহ্য কর? জীবনের সুখ খুঁজিতে গিয়া—পরের মুখের একবিন্দু হাসির লাগিয়া, তিলেক দর্শনের জন্য কেন সারা জীবনের সুখ নষ্ট করা?

উদ। অবিশ্বাস! অবিশ্বাসী কয়জন আছে? দু'একজন থাকিলে সমস্ত বিশ্বসংসারকে অবিশ্বাস করিয়া কেন পরমসুখে বঞ্চিত হও জাহানারা? মানুষ মরে দেখিয়া কে কবে পুত্রস্নেহ বিসর্জ্জন দিতে পারিয়াছে?

জাহা। কিন্তু সকল দেশের সকল শাস্ত্রেই বলে, রমণীকে অঙ্কে রাখিয়াও বিশ্বাস করিতে নাই।

উদ। ভুল—মহাভুল।

জাহা। কাদের ভুল? শাস্ত্রকারগণের?

উদ। না,—আমাদের।

জাহা। কিসের ভুল?

উদ। বুঝিবার।

জাহা। কি বুঝিবার?

উদ। শাস্ত্রবাক্যের উদ্দেশ্য বুঝিবার।

জাহা। বুঝিতে পারিলাম না।

উদ। মানুষের ক্ষুদ্র হৃদয়ের ক্ষুদ্র প্রেম নিতান্ত বিশ্বাসের মৃত জড়বৎ হইয়া থাকে, তাই তাহাকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য মিথ্যা অপবাদ বা

অবিশ্বাসের কথা পাড়িয়া দেওয়া। আরও, নারীকে অবিশ্বাস করিয়া কোথায় শান্তি পাইব জাহানারা? নদী শস্য বিনাশ করে বলিয়া পিপাসার জন্য কোথায় যাইব?

জাহা। তোমার কথায় তুষ্ট হইলাম। কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণ,—আমি মুসলমান।

উদ। যদি তুমি আমায় কৃপা কর,—ভালবাস; আমি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।

জাহা। ছি ছি উদয়েশ্বর বড় ব্যথিত হইলাম! ক্ষুদ্র এক রমণীতে আকৃষ্ট হইয়া আপন জাতীয় ধর্ম্ম যে পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহার প্রেম যে অতিশয় অস্থায়ী ও পণ্য, তাহা তোমাকে বলাই বাহুল্য।

উদ। জাহানারা—আমি তাহা ভালরূপই জানি। কিন্তু আমাতে ধর্ম্মের কি আছে? ব্রাহ্মণের ছেলে—ত্রিসন্ধ্যা পূজা আহ্নিক করিতাম,—ধর্ম্মের আলোচনাও করিতাম, কিন্তু তোমাকে দেখিয়া অবধি আমার সকলই গিয়াছে—দেবতার ধ্যান-ধারণা বিদূরিত হইয়াছে। আছে কেবল তোমার রূপ ধ্যান,—আর আছে ব্রাহ্মণের চিহ্নস্বরূপ সর্প-পরিত্যক্ত খোলসের ন্যায় শুধু পৈতাখানা। ধর্ম্ম কেবল নামে আছে—ধ্যেয় তুমি, তোমার জন্য সেই খোলসখানা ফেলিয়া দেওয়া আর কঠিন কি?

জাহা। ছি ছি উদয়েশ্বর; ইহার নাম কি ভালবাসা—এত আত্মবিস্মৃতি। তুমি পুরুষ—প্রকৃতিকে জয় করাই কি তোমার ধর্ম্ম নহে? আর তুমি যদি প্রকৃতির বশীভূত হইয়া আত্মবিস্মৃতির মেঘে সমস্ত হৃদয়খানা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে—তোমার ভালবাসার মহিমা কি করিয়া বুঝিতে পারিব! কি করিয়া তোমার ভালবাসার কিরণ আমার হৃদয়ে আপ্লুত, স্নিগ্ধ ও উল্লাসিত হইবে? তুমি পুরুষ,—পুরুষ আর মহাবৃক্ষ সমতুল। ঐ শতবাহু বটবিটপীর মত দৃঢ় থাকিবে—ঐ অচল অটল-

ভাবে আপনার উপরে আপনি স্বতন্ত্র রহিবে। আমরা নারী—নারী আর লতা সমান। পুরুষ-বৃক্ষ দৃঢ় অটল অচল থাকিলে তবেত রমণী-লতা আশ্রয় পাইবে? যদি বৃক্ষ, লতার কোলে আপনাকে হারাইয়া বসে—তবে কে লতিকায় আশ্রয় হইবে—কে সংসারের ভার বহিতে পারিবে? পুরুষ কিছু স্নেহময়, কিছু উদাসীন, কিছু মুক্ত, কিছু জড়িত হইবে,—আর আমরা আপন হারাইয়া ভালবাসিব। তাহার গঠনে গঠিত হইব। বৃক্ষ যেমন সহস্র পক্ষীর বাসস্থান, পাথকের আশ্রয়, ঝটিকার বিরোধী, উত্তপ্ত ধরণীর ছায়া—তোমরাও তেমনি আত্মীয় স্বজন্ স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের এবং সঙ্গে রমণী-প্রেমের রক্ষক। সমস্ত দিয়া ভালবাসিবে কেন?

উদ। জাহানারা; আমার কথা আমি বলিলাম—মুক্ত হৃদয়েই বলিয়াছি। আমি যদি জাতি ত্যাগ করি, তুমি আমায় বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছ?

জাহা। আমায় বিবাহ করিয়া থাইতে দিবে কি? থাকিবে কোথায়?

উদয়েশ্বর একটু চিন্তা করিয়া বলিল,—"একটা বিষয় পাইবার কথা হইতেছে, পাইলে ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্যলাভ হইবে।"

জাহা। তুমি এখন কোথাও যাইও না। বিষয়টা হস্তগত করিবার চেষ্টা কর।

উদ। তাহা হইলে আমাকে বিবাহ করিবে? বল, জাহানারা; বলিয়া আমায় সুখী কর।

জাহা। সে দিন আমাদের বাগানে গিয়া মুসলমানের স্পর্শ জলটুকু খাও নাই—আর এখন খানা খাইতে পারিবে।

উদ। তোমার স্পৃষ্ট অখাদ্যও খাইতে পারি।

জাহা। আমার আত্মীয় স্বজনে না খাওয়াইয়া ছাড়িবে কেন?

উদ। তোমার জন্য আমি জ্বলন্ত অঙ্গার সেবন করিতে পারি।

জাহা। তবে তাহাই,—আগে বিষয়টা হস্তগত কর। তারপরে এ বিষয়ের পরামর্শ করা যাইবে।

উদ। তবে কি যাইব না? এ হৃদয় তোমারই করে অর্পিত থাকিল,—দেখ যেন ভুলিও না।

জাহানরা মৃদু হাসিয়া বলিল—"প্রয়োজন বুঝিলে, উহা কোন খরিদ্দারের নিকট বিক্রয় করিব, অথবা প্রাণের কাঙ্গাল দেখিয়া বিলাইয়া দিব। এখন তবে বিদায় হই।"

জাহানারা দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। রাস্তায় পাল্কী অপেক্ষা করিতেছিল, উদয়েশ্বর জানেলা, পথে চাহিয়া দেখিলেন, জাহানারা পাল্কীতে উঠিয়া রাজপথ বহিয়া চলিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জাহানারা চলিয়া গেল, উদয়েশ্বরের জ্ঞান হইল, যেন কোন্ মোহিনীমন্ত্রবলে তাহার হৃদয়ের সমস্ত বৃত্তিগুলি অপহরণ করিয়া সে পলায়ন করিয়াছে,—তাহার আর কোন বিষয় ভাবিবার শক্তি নাই, কোন বিষয় স্থির করিবার সামর্থ্য নাই—বুঝি তাহার গতি-শক্তিও রোধ হইয়া গিয়াছে।

তারপর অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, উদয়েশ্বর স্থাণুর ন্যায় অচল হইয়াই সেই বিক্ষিপ্ত দ্রব্যরাশির মধ্যে যেন নিশ্চিন্ত ভাবেই বসিয়াছিল, এতক্ষণে উঠিয়া এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া একবার বাহিরে যাইতেছিল—এমন সময় একজন লোক তাহার ক্ষুদ্র গৃহের দরোজার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, উদয়েশ্বর তাহাকে চিনিতে পারিল,—সে উকীল জগন্নাথ চৌধুরীর দরোয়ান পাঁড়ে ঠাকুর।

পাঁড়েঠাকুর অভিবাদন করিয়া বলিল,—"বাবু আপনাকে এখনই একবার ডাকিয়াছেন।"

উদয়েশ্বরের কাণের কাছে যেন জাহানারার সেই কোকিলগঞ্জিত স্বরে ধ্বনিত হইল,—"আগে বিষয়টা হস্তগত কর, তারপরে দেখা যাইবে।"

উদয়েশ্বর বলিলেন,—"আমি একটু পরেই যাইতেছি, তুমি যাও।"

"বিশেষ প্রয়োজন, শীঘ্র আসিবেন"—এই কথা বলিয়া পাঁড়েঠাকুর প্রস্থান করিলেন। উদয়েশ্বরও গৃহের অর্গল বন্ধ করিয়া দিয়া উকীলবাড়ী গমন করিলেন।

জগন্নাথ চৌধুরী তাঁহার সুসজ্জিত বৈঠকখানায় বসিয়া কতক-

গুলি কাগজ পত্র দেখিতেছিলেন, উদয়েশ্বর তথায় গিয়া দর্শন দিলেন।

দর্শনীয় কাগজগুলি একত্র করিয়া পার্শ্বে রাখিয়া চৌধুরী মহাশয় উদয়েশ্বরকে বসিতে বলিলেন। উদয়েশ্বর আসন পরিগ্রহ করিলে চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—“উদয়েশ্বর, আমি এতটা বিষয় ও আমার স্নেহের কন্যা লইয়া তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছি—আর তুমি যেন আমার ভয়ে দূরে দূরে পলাইয়া যাইতেছ। কেন, তোমার কি এ বিবাহে মত নাই? বিষয়ে আশা নাই?”

উদয়েশ্বর বিশেষরূপে অবগত হইয়াছেন, চৌধুরী মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ না করিলে বিষয়ে বঞ্চিত হইতে হইবে। কিন্তু বিষয় লাভ করিতে না পারিলে, জাহানারা লাভ হইবে না—বুঝি হৃদয়ের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া সারা জীবন ছুটাছুটি করিতে হইবে। কখনও জাহানারার নিকটে উদয়েশ্বরের ভালবাসার একটি ভাবও অবগত হইতে পারে নাই, আর আজি এক নিশ্বাসে, স্পষ্টই সে বলিয়া গিয়াছে—সে ভালবাসে। বিষয় হইলে বিবাহেরও ব্যবস্থা হইবে, তেমন আশাও দিয়া গিয়াছে। কাজেই বিষয়ের আশা পরিত্যাগ করা যায় না। যদিও উদয়েশ্বর পূর্ব্ব হইতেই বিষয়ানুরক্ত—তথাপি জাত্যভিমানী। কিন্তু সে অভিমান জাহানারার প্রদীপ্ত রূপের আঘাতে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া বিদূরিত হইয়াছে,—সকলেরই এমন হয়। মানুষের সাধের সাজান প্রাসাদ,—কল্পনার গাঁথুনী, কোথাকার এক নিরর্থক আগুণে পুড়িয়া চূরমার হয়।

উদয়েশ্বর বলিল,—“আপনি আমার প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ করেন, তাহাতে আমি যত দিন জীবিত থাকিব, কখনই ভুলিতে পারিব না। ঐশ্বর্য্য ও কন্যা একত্রে আমায় দান করিতেছেন।”

চৌধুরী। আমিত দান করিতেছি—কিন্তু তুমি যে গ্রহণে অসম্মত।

আজি ছয় মাস গত হইল, এত দিন বিবাহ করিলে, তুমি যে অতুল ঐশ্বর্য্যের ও ভদ্র ললনার স্বামী হইতে পারিতে।

উদ। নানা কারণে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। ভাল, এটা ভাদ্র-মাস—এ মাসে কেমন করিয়া বিবাহ হইবে?

চৌধুরী। ভাদ্র মাস?—তাই কি; কেবল মাস লইয়া হিন্দুত্বের গোলযোগ তোলা,—হাঃ হাঃ—আমরা হিন্দু কিসে? হিন্দুত্বের আমাদের কি আছে? ম্লেচ্ছের ভৃত্য—ম্লেচ্ছের কৃপা ও প্রসাদভোজী—ওসকল কিছু না। কিছু না। যখন হিন্দু রাজা ছিল, তখন হিন্দুয়ানী ছিল,—জান কি উদয়েশ্বর; ধর্ম্মটা আর কিছুই নহে, রাজার শাসন—যখন যে ধর্ম্মাবলম্বী রাজা থাকেন, তখন সেই ধর্ম্মই প্রচলিত থাকে—থাকাও তাই কর্ত্তব্য। ওসকল তুমি কিছুই মনে করিও না—বিশেষতঃ ভাদ্র-মাসেও অনেক ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বিবাহ হইয়া থাকে।

চৌধুরী মহাশয়ের ধর্ম্ম-জ্ঞান ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি অবগত হইতে পারিয়া উদয়েশ্বর কি ভাবিল, জানি না। তবে উদয়েশ্বরের হৃদয়ের ধর্ম্মপ্রবৃত্তিও এখন ইহা হইতে পরিমাণে যে অধিক, তাহাও নহে। জাহানারাকে যখন না দেখিয়াছিল—তখন এরূপ কথা শুনিলে, উদয়েশ্বর কি ভাবিত বলা যায় না। এখন যেন কথাগুলা তাহার নিকট একটু জ্ঞানগর্ভ বলিয়াই বোধ হইল।

চৌধুরী মহাশয় পুনরপি বলিলেন,—"বিষয়ে যদি তোমার প্রয়োজন থাকে, আর বিলম্ব করিলে চলিবে না। আগামী কল্যই বিবাহ করিতে হইবে। কেননা, পরশ্বঃ তারিখে তোমার বিষয় পাইবার মোকদ্দমার দিন!"

উদয়েশ্বর বিবাহে সম্মতি জানাইল। বিবাহ-ব্যয়ের [illegible] কথা আর পাড়িল না; কেননা, তাহা চৌধুরী মহাশয়ই প্রদান করিবেন,—উদয়েশ্বরের এতদিনকার সমস্ত ব্যয়ই তিনিই নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন।

উদয়েশ্বর বিদায় হইল।

রাজপথে বহির্গত হইয়া উদয়েশ্বর ভাবিল,—"বিষয় পাইবার আশায় বিবাহে সম্মতি দিলাম, জাহানারাকে এ কথা জানান হয় নাই—সে যদি বিষয় লাভ ও বিবাহ দুইটি কথা একত্রে শুনিয়া আর আমাকে ভাল না বাসে, তখন আমার গতি কি হইবে? জাহানারা ব্যতীত আমার হৃদয় আর কিছুই চাহে না—শত ইন্দ্রের সাম্রাজ্যেও আমার সুখ হইবে না। মৌন-মুগ্ধ সন্ধ্যা যেমন ধীরে ধীরে প্রকৃতির অঙ্গ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে, আমারও হৃদয় হইতে তেমনি আশা-বাসনা সকলি গিয়াছে,—আছে এক জাহানারা! জাহানারার প্রেমই আছে। জাহানারাকে জানাইয়া তবে বিবাহ করিতে হইবে। কাল বিবাহ, আর সময় পাইব না।

উদয়েশ্বর তখনই মোকদ্দমশার বাগানে গিয়া জাহানারাকে বিবাহের কথা বলিবার জন্য প্রস্তুত হইল; সে তখনই সে পথে যাত্রা করিল। উদয়েশ্বরের হৃদয়ের ভাব তখন যেরূপ ছিল, তাহা কল্পনায় ভাবা যায়, মুখে বলা যায় না।

বিমুক্ত পল্লীপথে আসিয়া সে সোহাগময় প্রভায় পরিপ্লাবিত প্রশান্ত মধুযামিনী, সুকোমল পাণ্ডু শোভার সুষমায় নিমজ্জিত অবারিত ক্ষেত্র-ভূমি নেত্র ভরিয়া দেখিবার জন্য দাঁড়াইল। অনুক্ষণ ভেকবৃন্দের অনুচ্চ ধৈবত রাগিণী শূন্যে বিলীন হইতেছিল। দূরস্থিত পাপিয়া চন্দ্রিকার মনোহারিতার সহিত আপনার সন্দীপন সঙ্গীত বিমিশ্রিত করিতেছিল. সে সঙ্গীত-স্বপ্ন ছাড়া আর কোনও চিন্তা মনে আনে না—সেই ললিত মূর্চ্ছনাময় সঙ্গীত চুম্বনের জন্যই তানলয়ান্বিত।

উদয়েশ্বর পুনরায় চলিতে লাগিল,—কিন্তু সে সাহস হারাইতেছিল, —কেন তাহা নিজেই বুঝিতে পারিল না। তাহার মনে হইল, কে যেন

তাহাকে বলহীন করিতেছে; সে সহসা ক্লান্ত হইয়া পড়িল। তাহার প্রবল ইচ্ছা হইল, একবার এখানে বসি, একবার জাহানারার সেই অপার্থিব রূপরাশি ভাবিয়া লই। আকাশে বসিয়া চাঁদ কৌতুকে হাসিতেছে, নিশীথের তারা লুকাইয়া লুকাইয়া চাহিতেছে—ইহারা প্রেম খুঁজিতেছে; প্রেম আর কোথাও নাই—কেবল জাহানারায়। প্রেমের হিল্লোলে কেবল তাহারই অধরে হাসির ক্ষীণ রেখা নিমিষে জাগিয়া উঠে, আবার নিমিষে মিলায়,—সে বোধ হয় কেবল বিরহের আশঙ্কায়। সন্ধ্যার বাতাস লাগিয়া দীপশিখা কাতর-কম্পিত হয়,—সে বুঝি নির্ব্বাণের ভয়ে।

এখানে, নিম্নে, ক্ষুদ্র তটিনীটির বাঁকে বাঁকে সুদীর্ঘ দেবদারু তরুশ্রেণী জোট বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া; খানিকটা 'সুদৃশ্য কুজ্‌ঝটিকাস্তর নদীতট ও ভূমিভাগ ব্যাপিয়া বক্রগামিনী স্রোতস্বিনীকে আচ্ছাদিত করিয়া, একখানি সূক্ষ্ম স্বচ্ছ আস্তরণের মত নিরালম্বে ঝুলিতেছিল; চন্দ্র-কিরণে সেই শুভ্র বাষ্প ভেদ করিয়া উহাকে রৌপ্য-মণ্ডিত ও সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল।

উদয়েশ্বর প্রবল ও পরিবর্দ্ধমান উত্তেজনায় মর্ম্মে মর্ম্মে অনুবিদ্ধ হইয়া আসিল। তাহার মনে হইতে লাগিল,—রাত্রি যদি নিদ্রা, চেতনার বিলোপ, বিশ্রামের জন্য জগৎকে ভুলিয়া যাইবার জন্য, তবে কেন আজি-কার নিশি দিন লোকের অপেক্ষাও রমণীয়,—অরুণোদয় ও সূর্য্যাস্তের অপেক্ষাও মধুর ?, এই মন্থরগামী মনোহর তামকাটি সূর্য্যের অপেক্ষাও কবিত্বময়; এমন সূক্ষ্মদর্শী যে, মনোহর জ্যোতিষ্কপতি যে সকল অতি সুকুমার অতি নিভৃত পদার্থকে প্রোজ্জ্বল করিতে পারে না, ইহা তাহা-দেরই আলোকিত করিবার জন্য সৃষ্ট। এই সব ছায়া-বিচিত্র কাননকে আলোক-দীপ্ত করিতে সূর্য্য কেন আসিয়াছিল ?

প্রকৃতির কেন এই আধ অবগুণ্ঠন। বক্ষ কেন কম্পিত হইতেছে? মন কেন উত্তেজিত? শরীরের কেন এই আকুল উত্তেজনায় বিপুল অবসাদ?

কেন এই বিচিত্র মায়ার বিকাশ? মানুষ ত দেখিতেছে না,—এখন যে সকলেই সুখ-শয্যায় নিদ্রাতুর। এই সমুদয় দৃশ্য কাহার জন্য? কাহারই বা তৃপ্তির জন্য এই স্বর্গ-মর্ত্ত্য-বিপ্লাবিনী কবিত্ব-ধারা?—

যাহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে,—যাহারা কঠোর সংসারে সন্ত জীবন লইয়া কেবল যশঃ আর খ্যাতির জন্য ব্যস্ত, কতকগুলি লোককে আপনার করিয়া সমস্ত বিশ্বসংসার ভুলিয়া বসিয়া থাকে, তাহারা বুঝি—এ সকলের কিছুই বুঝিতে পারে না। সাধ করিয়া তাহারা আনন্দ ও শান্তি,প্রেম ও কবিত্ব দূরে রাখিয়া দেয়।

উদয়েশ্বর ভাবিতে ভাবিতে মোকদ্দমশার বাগানে গিয়া উপস্থিত হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বাগান-প্রান্তচারিণী নদী-সৈকতে দুইটি অস্পষ্টমূর্ত্তি—সমুজ্জল নীহারে পরিস্নাত তরুতোরণের নিম্নে পাশাপাশি বিচরণ করিতেছিল।

উদয়েশ্বর আরও নিকটস্থ হইয়া অস্পষ্ট মূর্ত্তি স্পষ্ট দেখিল, দুইটিই রমণী। উভয়ে উভয়ের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া আছে। উদয়েশ্বরের প্রাণে পূর্ব্ব প্রশ্নের উত্তরের সৃষ্টি হইল,—তাহার প্রাণ বলিল—এই যৌবন-সুষমাময়ী সুন্দরীদ্বয়কে ঘিরিয়া রাখিবার জন্যই বুঝি প্রকৃতির এই দিব্য দৃশ্য বিরচিত। বোধ হইতেছিল, সেই সুন্দরীদ্বয় মিলিয়া স্বর্গ মর্ত্ত্যের সমস্ত শোভার একত্র বিকাশ করিয়া দিয়াছে—বুঝি সেই-জন্যই এই শান্ত রজনী সৃষ্ট!

রমণীদ্বয়ের মধ্যে এক জাহানারা, অপরা সফিনা। সফিনা মোক-দুমশার প্রতিপালিতা কন্যা—জাহানারার সহচরী।

উদয়েশ্বর নিকটস্থ হইলে সফিনা বলিল,—ও কে জাহানারা? একটি পুরুষ নয়?"

গোলাপের পাপড়ির মত ফুল্ল অধরোষ্ঠ দুখানি কম্পিত করিয়া জাহানারা বলিল,—"হাঁ পুরুষনামধারী বটে! উহার নাম উদয়েশ্বর। আমার রূপের ঘোরে পড়িয়া ছটফট করিতেছে। নিকটস্থ হইয়াছে,—এখন চুপ কর, উহার সম্বন্ধে অনেক রহস্য শুনাইব।"

উদয়েশ্বর নিকটস্থ হইল। তাহার প্রাণের তারে উদ্দীপন-রাগিণীর আলাপচারি হইতেছিল।

জাহানারা বলিল,—"আবার এখনই কেন? রাত্রি অনেক হইয়াছে, সমস্ত নর-নারী নিদ্রিত,—তুমি বিনিদ্র কেন?"

উদ। তোমার সঙ্গে উনি কে ?

জাহা। আমার সহচরী—উঁহার নিকটে আমার কোন কথা গোপন নাই,—তুমি সব বলিতে পার।

উদ। আমি তখন তোমাকে একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, আমার সেই বিষয়টা লাভ করিতে হইলে আর একটি রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে হয়,—

জাহা। বুঝিয়াছি। আর একটি বিবাহ করিলে পাছে আমি অসন্তুষ্ট হই—এই ভয়, না ?

উদ। হাঁ।

জাহা। সে ভয় তোমার নাই। তুমি স্বচ্ছন্দে বিবাহ করিয়া বিষয় লাভ কর। আর এখানে দাঁড়াইও না। এত রাত্রে—এখানে আমাদের নিকটে থাকিলে দোষ হইতে পারে,—তুমি চলিয়া যাও। আবার সময় ও আবশ্যক মতে আমি গিয়া দেখা করিব।

উদয়েশ্বর আর দাঁড়াইল না। দিগন্ত-বিস্তারী জ্যোৎস্না-সাগরে ভাসিয়া দূর হইতে দূরান্তরে চলিয়া গেল। বকুল বৃক্ষের উচ্চ ডালে বসিয়া পাপিয়া এই সময় একবার সপ্তমে সেই পুরাতন কাহিনীটির পুনরাবৃত্তি করিয়া দিল।

সফিনা বলিল,—"তোমার মতলব কি জাহানারা ? খসম কাড়িয়া ঘর-সংসার পাতাইবে নাকি ?

জাহানারা হাসিয়া বলিল,—"খসম মিলিবে কোথায় ?

স। কেন, ঐ পুরুষটি !

জা। কে পুরুষ ? যে প্রকৃতির গোলাম—যে প্রকৃতির জন্য পাগল, সেই পুরুষ ? পুরুষ ত প্রকৃতির অতীত। রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি সকলই ত প্রকৃতি ; এ সকলের অতীত যে, সেই ত পুরুষ—

রমণী প্রকৃতি এইজন্য পুরুষকে ভুলাইয়া বশীভূত করে—অর্থাৎ আপনার অধীন করে। অধীন করিলে সে পুরুষ থাকে না—প্রকৃতিরও অধীন বা হীন হয়;—যে প্রকৃতির অধীন; তাহাকে আর প্রকৃতি ভজনা করিবে কেন?

স। তোমার বড় কথা রাখিয়া দাও। কিন্তু লোকটা তোমার প্রেমে হাবু ডুবু খাইতেছে।

জা। সেইজন্যই আমার এত উদ্যোগ।

স। তাহার কারণ? এক জনকে অমন করিয়া উদাস করা—পাগল করা কি কর্ত্তব্য?

জা। জগতে প্রকৃতির রস-তত্ত্ব উপভোগ করিতে সকলেরই বাসনা;—কিন্তু যাহার দ্বারা যে, যে রস গ্রহণ করিবে, তাহার দ্বারাই তাহাকে সে রস গ্রহণ করিতে হইবে; নতুবা হয় না। তুমি যে গোলাপ ফুলের চারাটি লাগাইয়া দুই বেলা জল ঢালিতেছ; কেন জল ঢালিতেছ, বল দেখি?

স। জল না ঢালিলে সে মরিয়া যায়।

জা। তবে তাহার রস গ্রহণের আবশ্যক,—এই ত?

স। হাঁ।

জা। ভাল, তাহাকে তুলিয়া একটা জলের জালার মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়া দিলে সে কি বাঁচিবে? বাঁচিবে না। কেন বাঁচিবে না, বুঝিয়াছ?—নিজে জল লইলে তাহার জল লওয়ার সাধ মিটে না। মাটির দ্বারা জল লইলে তবে জলের সাধ মিটিবে। তেমনি এক একটি মানুষও এক একটি মানুষের দ্বারায় রস-তত্ত্ব-স্বাদ গ্রহণ করিতে পারিলে, তৃপ্ত হইতে পারে। যত দিন তাহার সে মানুষ না জুটে—তত দিন তাহার রসের আশা মিটে না। তাই পিপাসিত কণ্ঠে ছুটিয়া ছুটিয়া মানুষ জন্ম জন্ম

ঘুরিয়া বেড়ায়। ব্যভিচার বল, রূপের আকাঙ্ক্ষা বল—আকুল পিয়াসা বল, সবই সেই মানুষটির অনুসন্ধান।

স। তুমি কি উহার ভাই?

জা। জানি না,—কে কাঁহার কি?

স। তুমি উহার পিপাসিত কণ্ঠে প্রেম-জল-ধারা বর্ষণ করিবে কি?

জা। দূর, তা কেন?

স। কেন ভুলাও দিদি? অহি, অগ্নি আর ভালবাসা, ইহা লইয়া খেলা করা চলে না। খেলা করিতে গেলে কোন্ সময়ে—কোন্ ভ্রান্তি-অলক্ষ্যে যে অনিষ্ট করিয়া বসে, তাহা জানা জায় না। অহির দংশন, অগ্নির দহন—ভালবাসায় উভয়ই বর্ত্তমান। সখি; কখনও উহা লইয়া খেলা করিও না,—কোন্ অমঙ্গল-মুহূর্ত্তে হৃদয়-পঞ্জর ধসাইয়া দেয়, তাহা জানা যায় না।

জাহানারা হাসিয়া বলিল,—"শ্রীমতীর প্রেমে এত বিভীষিকা কেন? কানুর বিরহে বুঝি মর্ম্ম-দহন অতিরিক্ত হইয়াছে?"

সফিনা কোন কথা কহিল না। সে যেন অন্যমনস্কভাবে কি ভাবিতেছিল এবং দূর হইতে কেতকীফুলের গন্ধ আসিয়া তাহাদিগকে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

তারপরে কিয়ৎক্ষণ সেখানে অবস্থান করিয়া উভয়ে আশ্রম-কুটীরে গমন করিল।

গৃহমধ্যে একটা সাজিতে পুঞ্জীকৃত সন্ধ্যার আধফোটা সুগন্ধি পুষ্প চয়িত ছিল; জাহানারা তাহার নিকটে গিয়া উপবেশন করিল, তাহার মনে হইতেছিল—সফিনা বলিল, অহি, অগ্নি, ভালবাসা লইয়া খেলা করিতে নাই। ইহারা কখন, অলক্ষ্যে আত্ম-বিক্রম প্রকাশ করিয়া বসে, তাহা কেহ বুঝিতে পারে না; অহির বিষ, অগ্নির দাহ,—ভালবাসায়

উভয়ই সহ্য করিতে হয়। কৈ, আমিত উদয়েশ্বরের ভালবাসা লইয়া খেলা করিয়া আসিতেছি,—আমার কি হইয়াছে ?

সহসা যেন জাহানারা দেখিতে পাইল, অদূরে পর-মর্ম্মঘাতী ঠাকুরটি তাঁহার অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া জাহানারাকে বিদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টিত আছেন,

জাহানারা শিহরিয়া উঠিল। কটাক্ষে অগ্নি-কণা ভাতিল, ঠাকুর ভয়ে কম্পিত হইলেন। আর এক দিন এমনি যোগভঙ্গ করিতে গিয়া, তাঁহার দেহ ভস্ম হইয়াছিল।

মন্মথ শরধনু দূরে রাখিয়া কাতরে ছলনা আরম্ভ করিলেন,—সাধে সাধিয়া যুবতীকে আপনার অধীন করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন।

জাহানারা—কামারূপিণী জাহানারা যুগল বাহু আন্দোলন করিয়া কামকে দূরীভূত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

মদন মনসিজ—মন হইতে উদ্ভূত। জাহানারার মনের সহিত তাঁহার কথোপকথন হইল। এমন সকলেরই হয়,—পরপরিচ্ছেদে সে রহস্যময় কথোপকথনের আভাস বিবৃত হইল। একথা সকলেরই হইয়াছে, সকলেই জানেন—তবে অনুধাবন করা হয় নাই বলিয়া তখন বুঝা যায় নাই। জগৎটা কিন্তু কামের এই কথার ফাঁসিতেই আবদ্ধ ও উন্মত্ত।

নবম পরিচ্ছেদ।

যে রাত্রির কথা বলা হইল তৎপর দিবস যখন বৈকালের রৌদ্র পড়িয়া আসিয়াছিল,—শারদীয় অপরাহ্নের মেঘবিনির্ম্মুক্ত অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের সুবর্ণ কিরণ যখন দিকে দিকে শ্যামা প্রকৃতির অঙ্গে শোভা ঢালিতেছিল, তখন জগন্নাথ চৌধুরীর বাড়ী বিবাহের বাজনা বাজিয়া বাজিয়া সমস্ত সহরখানিতে না হউক, অনেক দূর পর্য্যন্ত আনন্দ ঢালিতেছিল। আ'জ অর্দ্ধরাত্রির সুত'হিবুকযোগে উদয়েশ্বরের সহিত চৌধুরী-মহাশয়ের কন্যা মালতীর বিবাহ হইবে। উকীল-সরকার ধনী চৌধুরী-মহাশয়ের একমাত্র কন্যার বিবাহে অনেক টাকা ব্যয় হইতেছে,—কাজেই লোকজনের বড় হুড়াহুড়ি, বিষম দৌড়াদৌড়ি ও ভারি কোলাহল বাধিয়া গিয়াছে। আজি যেন সমস্ত সহরের খাদ্যদ্রব্য আসিয়া চৌধুরীমহাশয়ের ভাণ্ডারে উপস্থিত হইতেছে। ভাল ভাল বাদ্যকর আসিয়া, বহুপূর্ব্ব হইতেই আসর জমকাইয়া বসিয়া মধ্যে মধ্যে তাহাদের গুণপনা প্রদর্শন করিতেছে।

এই সময় একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যুবক সেই পথ দিয়া যাইতেছিল, তাহার গতি ধীর ও মন্থর। নয়নে যেন কি এক ভাবের মাধুরী মাখান। তাহার সুকুমার অঙ্গের বর্ণ-সুষমায়, মুখমণ্ডলের মধুময় ভাব-বৈচিত্রে দর্শকমাত্রেই মুগ্ধ হইয়াছিল,—যুবক একদৃষ্টে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া প্রাণে যেন কি একটা বেদনা অনুভব করিল। আর সেখানে দাঁড়াইল না,—ত্বরিত-পদে চলিয়া গেল। তাহার চলন-ভঙ্গি দেখিয়া উপমা খুঁজিতে গেলে, রাজহংসীর কথা মনে পড়ে।

সৌধ-শিরে, এক গবাক্ষের নিকটে চৌধুরীমহাশয়ের কন্যা মালতী ও মনোরমা নাম্নী পাড়ার এক যুবতী বসিয়া ছিল। মনোরমা মালতীর একবয়সী; কিন্তু মনোরমা বিবাহিতা ও সন্তানবতী এবং মালতী অবিবাহিতা। জগন্নাথ চৌধুরী, হিন্দুধর্ম্ম বড় একটা মানিয়া চলেন না; ধর্ম্ম মানিয়া অনেকই অনেক সময় কাজ করে না,—তবে এক সমাজ। কিন্তু সমাজের সহিত চৌধুরী মহাশয়ের যে তেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে না। তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত যাহারা অবগত আছে, তাহারা বলে, তিনি সদ্ব্রাহ্মণ নহেন—জন্মগত একটা সর্ব্বজন-জানিত দোষ তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল। সমাজ তাঁহাকে অধিক সম্মানের চক্ষুতে দেখিত না। তিনিও সমাজের উপরে তাহার প্রতিশোধ লইবার বাসনায়, তাহার সমস্ত নিয়মগুলি ভঙ্গ না করিয়া ছাড়িতেন না। হিন্দুসমাজের লোকে বালিকা বিবাহ দেয়, তিনি কন্যাকে পূর্ণ যুবতী করিয়া বিবাহ দিবেন, এই স্থির করিয়াছিলেন। তাই মালতী বয়স্থা হইয়াও অবিবাহিতা।

যখন রাজপথে দাঁড়াইয়া সেই সুন্দর যুবক চৌধুরীমহাশয়ের বাড়ীর দিকে চাহিতেছিল, তখন যুবতীদ্বয় গবাক্ষ-পার্শ্বে বসিয়াছিল,—একবার এক মুহূর্ত্তে যুবকের চক্ষু যুবতীদ্বয়ের চক্ষুতে সংলগ্ন হইয়াছিল,—সে অনেকক্ষণের কথা। তারপর যুবক চলিয়া গিয়াছে।

যুবতীদ্বয় নিঃশব্দে নিস্তব্ধে বসিয়া সময়াতিবাহিত করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে, প্রয়োজন বোধে প্রসঙ্গক্রমে কখনও কখনও এক আধবার উভয়ে কথোপকথন হইতেছিল, আবার নীরবে দুইজনে বাহিরের উৎসব-তরঙ্গের লোক-কোলাহল দর্শন ও বাদ্যাদি শ্রবণ করিতে ছিল।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়া দিগ্বধূর অঙ্গে তাহার স্নিগ্ধ শান্ত কর

অর্পণ করিল। শুক্লপক্ষের সন্ধ্যা চাঁদের কিরণ মুড়ি দিয়া জগতে আসিয়া দেখা দিল,—কাজেই প্রকৃতি প্রফুল্লমুখে তাহাকে সম্ভাষণ করিল,—বিবাহবাড়ীর সমস্ত স্থানেই উজ্জ্বল আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিল। নহবতখানা হইতে ইমনকল্যাণের মধুর আওয়াজ সঞ্চালিত হইয়া শ্রোতাগণের হৃদয়ে পুলক জাগাইল।

মনোরমা বলিল,—"চল, আমরা নিচেয় যাই। হয়ত তোমাকে 'কণে'চন্দনে' সাজাইবার জন্য এতক্ষণ খুঁজিতেছে।"

মালতী মৃদু হাসিয়া বলিল,—"বিবাহ অনেক রাত্রে।"

মনোরমা কুন্দদন্তে অধর টিপিয়া বলিল,—"আর যেন তর্ সহিতেছে না!"

মা। সয় কৈ—অন্যে যে পুত্র প্রসব করিয়া বসিয়াছে।

ম। এত দিন বাপকে বলিলেই হইত।

মা। বলা প্রয়োজন মনে করিনি।

ম। যাক্, বর পসন্দ হয়েছেত?

মা। তুমি কি বর পসন্দ করিয়া বরণ করিয়াছিলে?

ম। আমাদের বিবাহে আর তোমার বিবাহে আসমান্-জমিন ফারাক।

মা। কি প্রকার?

ম। আমার যখন বিবাহ হইয়াছিল, তখন আমার বয়স আট কি নয় বৎসর। তখন কি বর পসন্দের বয়স হইয়াছিল?—আর তোমার বর পসন্দ কেন, নূতন বর প্রসব করিবার বয়স হইয়াছে।

মা। তুমি মর।

মা। আহা! এমন কপাল কি হবে, যে স্বামীর কোলে পুত্র দিয়া মরণের চিতায় পুড়িতে পাইব?

মা। তুমি তোমার বরকে খুব ভালবাস, না ?

ম। ভালবাসার আমি কি জানি,—তিনি আমার খুব ভালবাসেন ; তাঁহার ভালবাসায় আমি ডুবিয়া গিয়াছি। আমায় বলিতে আর আমার কিছুই নাই। আমি কেমন করিয়া ভালবাসিব ?

মা। তোমার রমণীজন্ম সার্থক। আচ্ছা, মনোরমা ; বল দেখি ভালবাসিয়া সুখ, না ভালবাসা পাইলে সুখ ?

ম। আমিত বলিলাম, ভালবাসিতে হয় কেমন করিয়া তাহা জানি না।

মা। বুঝিয়াছি, তুমি স্বামীর অপরিসীম ভালবাসায় আপনাকে হারাইয়া অনন্ত সুখে সুখী হইয়াছ ; কিন্তু তেমন কপাল যদি সকলের না হয় ?

ম। যে রমণীর তাহা না হয়, সে হতভাগী ; তাহার গলায় দিয়ে— বুঝলে ?

মা। তোমার উপদেশ শুনিতে হইলে সাড়ে পনের আনা রমণীকে গলায় দড়ি দিয়ে—বুঝলে, করিতে হয়।

ম। তা যদি না করে, তবে কিসের জন্য তাদের বাঁচিয়া থাকা, আমিত তাহা বুঝিতে পারি না।

মা। কেন, তারা ভাল বাসিয়া বাঁচিবে।

ম। পোড়াকপাল ;—স্বামীতে ভালবাসিবে না, স্ত্রীতে ভালবাসিয়া সুখী হইবে।

এই সময় তথায় একজন দাসী আসিয়া বলিল,—"মনোরমা ঠাকুরাণীকে তাঁর মা ডাক্‌চেন, খোকা কেঁদে সারা হ'ল।"

দাসীর কথা শুনিয়া মনোরমা তথা হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল। দাসীও চলিয়া গেল। মালতী একা বসিয়া থাকিল।

বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল,—স্বামী যদি ভাল না বাসে, তবে

রমণীর গলায় দড়ি দিয়া মরা ভাল—মনোরমা এ কথা কি সত্য? যদি তাহা সত্য হয়; তবে আমার দশা কি হইবে? আমার স্বামী, আমাকে ভালবাসিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। বিবাহের প্রস্তাব হইয়া অবধি এই কয় মাস ধরিয়া তিনি আমাদের বাড়ী যাতায়াত করিতেছেন, আমি ক্রমে ক্রমে তাহাতে আত্ম-সমর্পিতা হইয়া পড়িয়াছি—যত দেখিয়াছি, তত মজিয়াছি; কিন্তু কই তিনিত একদিনও আমার প্রতি কৃপা-কটাক্ষপাত করেন নাই। যেন দেখা হইলেই বিরক্তির ভাবে চলিয়া গিয়াছেন। আমি যদি তাঁহাতে এমন করিয়া না মজিতাম, কাহারও দ্বারায় বাবাকে জানাইয়া এ বিবাহ বন্ধ করিতে পারিতাম—বাবা আমার অমতে আমাকে কখনই এ বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধা করিতেন না; তিনি আমার সুখের জন্য অনেক করিতেছেন। কিন্তু, তাহার উপায় কৈ? আমি যে তাঁহার চরণ ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতে পারি না!

উন্মুক্ত গবাক্ষ-পথ দিয়া চন্দ্রকিরণ আসিয়া মালতীর মুখের উপরে পড়িয়াছিল,—দূর হইতে সমাগত সমীরণ তাহার কপোল-পতিত চিকুরের গুচ্ছ লইয়া, পরিধেয় বসনাগ্র লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল এবং মালতী এক মনে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল। ভাবিতে ভাবিতে প্রাণের রাগিণী সুর হইয়া বাহির হইল; মালতী গুণ গুণ করিয়া গাহিতে লাগিল,—

সে কি হইবে আমার?
ভুলেও কখনো ফিরে চাহিল না একবার!
সাধিনু চরণে ধ'রে, যায় যাবে ফেলে দূরে,
পুনরায় দেখা পেলে সাধিব গো আর বার।
আমি বড় ভালবাসি, সাধি তারে দিবানিশি,
সে গো থাক অভিমানে, দলিয়া আমার প্রাণ।

অতৃপ্ত প্রাণের নেশা অতৃপ্ত এ ভালবাসা,
চাহি না শুনিতে তার এ হৃদয়-ভগ্ন-গান।
সে ফিরে না চায় যদি, তাহাই অমৃত নদী,
বিরক্তি-ভ্রুকুটি রাশি শুধু শুভ্র হাসি তার,
শকতি দিয়াছে কত, মেখেছে মদিরামৃত
জ্বালিয়াছে সুমধুর আলো আনিবার।

ঈষচঞ্চল মারুত, তাহার অনুচ্চ স্বর-লহরী বুকে করিয়া স্তব্ধ গৃহের মধ্যেই ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছিল, এবং নিম্নের রাজপথে বর আসিয়া উপস্থিত হওয়ার বাদ্য-কোলাহলে সমস্ত দিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল।

দশম পরিচ্ছেদ

লেখক জীবনের বহুবিধ কর্ম্মভোগের মধ্যে একটা সবিশেষ উপসর্গ এই যে, একই সময়ে একাধিক ঘটনা একত্র করিয়া লেখা যায় না তাহা হইলে, যাহা যখন চারিদিকে ঘটিত, সমস্ত একত্রে লিখিতে পারিলে, লেখায় বুঝি একটু পারিপাট্য হইত। তাহা হয় না, কাজেই এক সময়ের কতকগুলি ঘটনার মধ্যে একটি আগে লিখিয়া, অপরাপর ঘটনা তাহার পরে বলিতে বা লিখিতে হয়।

যে সময় মালতী তাহার বিবাহ-বাসরের সুখ-শয্যায় সমীপে বসিয়া স্বামীর অনাদর ও ভাবি ভালবাসায় নৈরাশ্য ভাবিয়া আকুল হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে মোকদ্দমশার বাগানোপান্তচারিণী কৃষ্ণা নদীর শ্যাম-শষ্পাস্তৃত তীরে বসিয়া জাহানারাও হৃদয়গত প্রেমের বিশ্লেষণ করিতেছিল। মালতীর প্রাণ হইতে যখন প্রেমের পঞ্চম গীত হইতেছিল. ঠিক সেই সময়ে নদী-সৈকতে বসিয়া জাহানারাও প্রণয় পরাগ-ধূসর-প্রাণে গানে দিগ্বধূর অঙ্গ কাঁপাইতেছিল; তবে উভয়ের ভাব-গত পার্থক্য যাহা আছে, ঘটনার যে অসামঞ্জস্য আছে, সে কথাগুলো আগে বলিয়া লই।

জাহানারা প্রায়ই পুরুষবেশ ধারণ পূর্ব্বক নগর ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত সে বেশে তাহার এত পারিপাট্য ছিল যে, কেহই তাহাকে কোন প্রকারে চিনিতে পারিত না। উদয়েশ্বরের বিবাহ শুনিয়া তাহার উদ্যোগ-আয়োজন দেখিবার জন্য চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীর নিকটে বৈকালে পুরুষবেশে গমন করিয়াছিল,—তারপরে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে ফিরিয়া আসিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করত সন্ধ্যার পরে কানন-চারিণী নদী-সৈকতে গিয়া উপবেশন করিয়াছে।

জাহানারা বাল্যকাল হইতে ফকির মোকদ্দমশার নিকট লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া যোগ অভ্যাস আরম্ভ করে। চিত্তজয়ের জন্য অনেক প্রকার কঠোর সাধনা করিয়াছে,—বহিঃপ্রকৃতিকে বশীভূতা করিবার জন্যও অনেক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়াছে,—অনেক বিষয় আয়ত্বীভূতও হইয়াছে। সে এতদিন ভাবিত, চিত্ত মানুষের আয়ত্বের মধ্যে; তাহাকে যে পথে লওয়া যায়, সেই পথেই যায়। সাধনার বলে চিত্ত মনুষ্যের অধীন হয়। কিন্তু আজি সে চিত্তকে লইয়া বড় বিপদে পড়িয়াছে। যথাযোগ্য শর-শরাসন লইয়া বালক মন্মথ নিকটে ঘুরিতেছে। বল খাটে না বলিয়া ভয়ের ছলনা আরম্ভ করিয়াছে। ভয়ে ভয়ে সাধিয়া যাচিয়া, কাঁন্দিয়া হাসিয়া সে নিকটস্থ হইবার চেষ্টা করিতেছিল,—সে যতবার নিকটে আসিবার উপক্রম করে, ততবার কটাক্ষবিক্ষেপে জাহানারা তাহাকে দূর করিয়া দেয়। কিন্তু আজি যেন অধিক পরিমাণে নিকটস্থ হইয়া পড়িয়াছে। জাহানারার চিত্ত একমুখী হইয়াছিল,—সে বলিল,—"কে তুমি? কেন আমাকে আকর্ষণের পথে লইতে আকুল হইয়াছ?"

ধীরে ধীরে মনের ভিতর হইতে উত্তর হইল,—"আমি মদন। আমার আর এক নাম মনসিজ,—জীবের মন হইতে আমার জন্ম, তাই আমি মনসিজ। আমার নিত্য জন্ম, তাই আমি চিরবালক।

জাহানারার চিত্ত বলিল,—তোমাকে চিনিয়াছি, তুমিই জীবকে বাসনার পথে লইয়া বেড়াও। তোমারই জন্য জীব আকর্ষণের আকুল-আহ্বানে উন্মত্ত,—কিন্তু তুমি আমার নিকটে কেন আসিয়াছ? আমার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে—এ চিত্তে তোমার জন্ম হইতে পারে না!"

ম। সর্ব্বত্রই আমার জন্ম হয়। এমন যোগী যে মহাদেব, তাঁহার চিত্তেও আমার জন্ম হইয়াছিল। আমি শ্রীকৃষ্ণের পুত্র—শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণে-

শ্বর। তাঁহার সৃষ্টি করিবার বাসনাইত কাম। তবে আমার প্রতাপ সৃষ্ট জীবে সর্ব্বত্র না থাকিবে কেন?

জা-চি। অনেক যোগীকে চিত্তজয়ী দেখিয়াছি।

ম। জান কি,—আকাশের মেঘ যতক্ষণ পারে, বারিকণা বক্ষে ধারণ করিয়া রাখে; কিন্তু শীতল বাতাস বহিলে জল-ভার ধারণ করিবার তাহার আর সামর্থ্য থাকে না।

জা-চি। সে শীতল বাতাস কি?

ম। কাহার কি, তাহা কে বলিতে পারে? ফলকথা, সেরূপ ঘটিলে আমি শীঘ্র উপস্থিত হইয়া চিত্ত-মেঘ গলাইয়া দিয়া থাকি। এমন যে, বিশ্বামিত্র ঋষি; শকুন্তলার সৃষ্টি-জন্য তাঁহাকেও গলাইয়া দিয়াছিলাম—এক একটি উদ্দেশ্যে এক জনকে গলিতে হয়,—জগতের একটু বালুকাকণারও উদ্দেশ্য আছে, উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি নাই।

জা-চি। উদয়েশ্বরে আমার কি উদ্দেশ্য।

ম। তা জানি না—আমি উদ্দেশ্য বুঝি না। বুঝি যেখানে যাইতে হয়, সেই খানে যাই। জান কি, আমার আসা-যাওয়া ভুল কথা;—আমি মনেই থাকি, সময় হইলে মন হইতেই উদ্ভূত হই। আমি কেবল ভাব বইত না।

জা-চি। তোমার আর এক নাম কাম,—তুমি মানব-হৃদয়ের জঘন্য বৃত্তি।

ম। আমার এক নাম কাম বটে,—কিন্তু কাম কি জঘন্য বৃত্তি? কামেইত জগৎ রহিয়াছে, "কাম কৃষ্ণ জগন্নাথ" একথা কি তোমার শোনা নাই? কাম অর্থে ইচ্ছা,—নির্গুণ ব্রহ্মের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছাই পরা বা অপরা প্রকৃতি—তাই লইয়াইত জগৎ! তবে তোমরা কাম অর্থে যে জঘন্য বৃত্তি বল,—তাহা কাম নহে, তাহা প্রকৃতির রূপ, রস.

গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতির উন্মত্ততা। জাহানারা; ঐ দেখ, আমার ভাবের নৌকা বাসনার সাগরে ভাসিয়া যাইতেছে—ও নৌকার আমিই মাঝি। দিবারাত্রি কত নর-নারীকে বোঝাই করিয়া লইয়া বেড়াইতেছি। ঐ দেখ, দুই মরাল-মিথুন বাসনার নদীতে মুখোমুখি হইয়া ধীরে ভাসিয়া চলিয়াছে; আর ঐ দেখ, এক পূর্ণ প্রেমের মরালরাজ নৌকার আগে আগে ভাসিতেছে। তুমি এস,—আমার নৌকায় উঠিয়া পড়,—এখানে বড় সুখ। জীবমাত্রেরই হৃদয়ে আমি উৎপন্ন হই, কিন্তু আমার সাধের নৌকায় কেবল মানুষকেই লইয়া থাকি—অন্যান্য জীব বাসনার জলে আমার নৌকার আশে-পাশে ভাসিয়া থাকে। ভাব, ব্রহ্ম। এস,—ঐ দেখ, মালতী উঠিয়াছে—ঐ শোন, সে কি গান ধরিয়াছে,—তুমি তাহার পাশে বসিয়া একটি গান গাও। জগতে কাম আর রাম! তাইত রাধা-কৃষ্ণের মাধুর্য্য-রস।

জাহানারা যেন মন্ত্র-মুগ্ধার ন্যায় মদনের নৌকায় গিয়া উঠিয়া বসিল; সেখানে মালতী ছিল—মালতীর কেশদাম সমীরণে উড়িতেছিল, সেও গান গাহিতেছিল। বাসনার রক্ত-জলে মদনের ভাবের নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছে,—মালতীর পার্শ্বে এলাইয়া পড়িয়া জাহানারা যেন গাহিতেছে,—

শুধু ভুলে কেন জড়াতে যতন,
সারা প্রাণখানি ধেয়েছে,
শিশিরের ভয়ে থাকিয়ে থাকিয়ে,
পাহাড়ী কেন গো কাঁপিছে ?
গাহিছে পাপিয়া গান, চাঁদ করে সুধা দান,
মলয়া মাতাল প্রায় টলে টলে চলিছে,

ওগো ওত দু'দণ্ডের খেলা ভেঙে যাবে তোর বেলা;
জগৎ ভুলের গড়া ভুলে বাঁধা রয়েছে।
ভুল সুখ ভুল শান্তি, ভুল মরণের শ্রান্তি,
জানি সব ভুল তবু ভুলে বেঁধে ফেলেছে।
ওগো জানি আমি এই ধরা, বাসনা-আহ্বান-ভরা,
মিলন-মঙ্গল এর শুধু দুটি' কথা।
হেথাকার ভালবাসা, মুহূর্ত্তের মুগ্ধ আশা,
দু'দণ্ডের হা-হুতাশ দু'দণ্ডের ব্যথা।
ওগো জানি আমি এর পরে, বৈতরণী-পরপারে,
মিলনের তরে আছে এক মহাস্থান।
সেইখানে দুইজনে, বদ্ধ সুখ আলিঙ্গনে,
প্রেমের বন্ধনে হয় দু'য়ে একপ্রাণ।
ওগো তবে কেন আজি সমস্ত পরাণে,
এক ভুলে মোরে ধরেছে ?
ভুলিব ভাবিতে এ সারা পরাণী,
দিবস রজনী কাঁদিছে।
কেন মনে হয় আমিও ভুলিব,
তার আঁখি যদি ভুলেছে,
ওগো কেন মনে হয় এক ভুলে ভুলি,
সে যখন ভুলে ডেকেছে !

জাহানারার ইহা স্বপ্ন নহে, সে বসিয়া বসিয়া তন্ময়ভাবে আপনার চিত্ত-রাজ্যে এমনই ভাবের ঘোর দেখিতেছিল। স্বপ্নে সুখে-দুঃখের ব্যাপার দর্শন করিয়া মানুষ হাসে কাঁদে,—স্বপ্নের বিষয় লোকে জানিতে পারে না, কিন্তু অনেক স্থলে হাসি-কান্না শুনিতে পাওয়া যায়। ভাবের ঘোরে জাহানারা যে স্বপ্ন দেখিতেছিল, তাহা কেহ জানিতে পারে

নাই, কিন্তু যে গান গাহিতেছিল, তাহা পশ্চাৎ হইতে আর একজন শুনিতেছিল,—সে সফিনা।

সফিনা কুন্দ দন্তে অধর টিপিয়া মৃদু হাসিয়া মনে মনে বলিল,—"তখনই বলিয়াছি, অহি অগ্নি আর ভালবাসা লইয়া যে খেলা করিতে যায়, তাহার মরণ নিশ্চয়। জাহানারাও মরিয়াছে।" তারপরে আরও অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া জাহানারার পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিয়া বলিল,—"কিগো সখি; বিরহ-বিকারে বিকলাঙ্গ নাকি ?"

জাহানারার চমক হইল, তাহার ধ্যান ভাঙ্গিল,—কোথায় মালতী, কোথায় নৌকা, কোথায় মদনমাঝি ? কেবল প্রাণের কথা গানে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। সে ভারি লজ্জিতা হইল,—বলিল,—"বিরহ-বিকার আবার কিসে দেখিলে ?"

স। সারা জ্যোৎস্নায়, সারা বৃক্ষ-পত্রে, সারা জল-কল্লোলে তোমার বিরহ-বিকার ঘোষিত হইতেছে।

জা। কাব্য ভিন্ন সইয়ের আমার কথা নাই।

স। আর আমার সখীর যে এখন আস্ত কাব্য গলাধঃকরণ করিলেও নিস্তার নাই !

জা। রহস্য যাক্,—আমার মনটা এমন কেন হ'ল সফিনা ? উদয়েশ্বরের বিবাহ হইবে;—ব্যাপারটা দেখিবার জন্য কেমন ঝোঁক হইল, তাই,—

স। তাই সেখানে দেখিতে গিয়াছিলে,—ঐ ঝোঁকই ত কাল !

জা। না না,—কেমন একটা সখ হ'ল, তাই গেলাম। কিন্তু সেখানে গিয়া বোধ হইতে লাগিল, আমার কোন নিজস্ব পদার্থ যেন এত লোকে জোট পাকাইয়া, এত বাদ্য-কোলাহল করিয়া অপহরণ করিয়া লইতেছে। ছি, ছি,—আমি যে চিত্তজয় করিতে শিক্ষা করিতেছি।

স। তুমি আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত,—আমি বিবাহিতা, প্রেমের চরণে লুণ্ঠিতা, তুমি কুমারী,—যোগিনী। তবে বলি কি, মনটা যদি এত খাপছাড়া হইয়া থাকে, তবে তোমার প্রেমের পাগলকে বিলাইয়া দিলে কেন? সেটি তোমাবৈ জানে না।

জা। মানুষ প্রেম করিতে জন্মে না,—সাধনা করিতে জন্মে।

স। কিসের সাধনা জাহানারা?

জা। কেন, জীবনের।

স। জীবনের উদ্দেশ্য কি? জীবনের উদ্দেশ্য প্রেম। প্রেমের সাধনা-তেই ত এক আনা ষোল আনা হয়,—অণু মিশিয়াই ত মহদণু হয়?

জা। যাহা ভাগ্যে আছে হইবে,—এখন চল ঘরে যাই।

তখন দুইজনে ধীর-মন্থর গমনে মোকদ্দমশার বাগানস্থিত কুটীরে চলিয়া গেল। তাহারা যাইতে যাইতে শুনিতে পাইল, নদীর অপর কূল হইতে জেলে ব্যাসাল জালে মৎস্য শীকার করিতে করিতে গাহিতেছিল,—

"মান ক'রে চ'লে যেও না তুমি,
ওগো সখা; ফিরে এস।"

আর অদূরস্থিত প্রফুল্লিত শেফালিকার রাশি কি জানি কোন্ আবেগভরে ঝরিয়া পড়িয়া তাহার বিমল গন্ধ বাতাসে বিলাইয়া দিতেছিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

"পার্ব্বি ?"

"পার্ব্ব।"

"পার্ব্বি ?"

"পার্ব্ব।"

"পার্ব্বি ?"

"পার্ব্ব।"

"তিন সত্যি কল্লি ?"

"হাঁ,—তা কল্লুম।"

"তা যদি পারিস্, আমি তোকে মুক্ত করে দেবো। তোর যেখানে ইচ্ছা, সেখানে চলে যাস্।"

"আমি তাই চাই,—আমার পুরস্কার তার চেয়ে আর কিছুই নেই। কিন্তু আমি যার বাড়ী আছি, সে যদি না ছেড়ে দেয় ?"

"সে কে! আমিইত হাঘরেপাড়ার সর্দ্দার,—তুই কি জানিস্ না; রোসন ?"

"তা জানি, তবে কাজ সারা হ'য়ে গেলে, যদি কাঙালিনীর জন্যে ততটা আর না কর ?"

"নিশ্চয় ক'র্‌ব্বো। তুই জানিস্ দস্যু-তস্করে মিথ্যে কথা বলে না। মিথ্যে ব'লে কাজ হাঁসিল করে নেয় না। যারা ভদ্রলোক—তারাই মিছে ব'লে—ছলনা ক'রে, কাজ সেরে নেয়।"

"আমি বল্‌ছিলুম, আমি যার বাড়ী আছি, সে যদি আমায় সহজে মুক্তি দিতে না চায়, তখন তুমি কি আমার জন্যে তার সঙ্গে বিবাদ কর্‌বে ?"

"হাঁ—তা নিশ্চয় করবো। শোন রোসন, এই কাজটা হাঁসিল করতে পারলে, নগদ দশ হাজার টাকা পাব। তোকে মুক্তি ক'রে দেবার জন্য নয় তোর বাড়ীওয়ালীকে এক হাজার টাকা দেব!"

"সে যদি তাতেও না ছাড়ে?"

"তখন জোর করে ছাড়িয়ে দিব। হাতিয়ার চালাব,—আমার অবাধ্যি হ'য়ে হাঘরেপাড়ায় কে নিস্তার পাবে?"

"উপরে ভগবান আছেন,—ঐ চন্দ্রদেব আমাদের কথার সাক্ষী হচ্চেন,—আমি তোমার কথায় বিশ্বাস কোরে, এই ভয়ানক কার্য্যে নেমে প'ড়লুম, যা তোমার ধর্ম্মে লাগে, তাই করিও।"

"সে জন্যে তোর কোন ভয় নাই। তুই কাজটা করেই দেখ্ না।"

"দেখ, সর্দ্দার; আমি যে কাজে নিযুক্ত হচ্চি, সে কিরূপ ভয়ঙ্কর কাজ,—একটু গোলযোগ হ'লেই আমার মাথা থাক্‌বে না। তবে কি জান, আমার প্রাণের উপর এক বিন্দুও মায়া নেই,—যার জীবনে মায়া নেই, তার আবার বিপদের ভয় কি? যদি কাজটা সমাধা কর্ত্তে পারি, আমায় মুক্তি দিও—কেবল সেই মুক্তির আশাই আমার আশা।"

"তা হবে রোসন; তা হবে। ভোর হ'তে আর অধিক দেরি নেই। ভোর হবামাত্র যাবি। বেলা চা'রদণ্ডের পর আর কেহ রঙ্গমহলে ঢুকতে পায় না।"

"খুব ভোরেই যাব; কিন্তু আমার বাড়ীওয়ালী বাড়ী না এলে যাব কি?"

"তারা এলো বোলে। বিয়েটায় খাওয়া-দাওয়া পাওনা-থোওনা—খুব ভাল রকমই হচ্চে। জগন্নাথ চৌধুরীর ঐ একটি মাত্র মেয়ে; বেটাও টাকার কুমুর। অবিশ্যি হাঘরদের খাওয়াবে ভাল,—বোধ হয়, জোনা-জাত এক-একটা টাকা দেবে এখন।"

"ভোর হ'তে হ'তে যদি না আসে ?"

"তুই চলে যাস্। কিন্তু সব বিষয়ে যেন হুঁসিয়ারি থাকে। সব কথা যেন মনে থাকে। আর সাজ-পোষাক যা এনে দিয়েছি, সেগুলা এমন ভাবে পর্‌বি, যেন কেউ কিছু কোন রকমে না বুঝ্‌তে পারে।"

"তা সব ঠিক হবে,—সেজন্য তোমার চিন্তা নেই।"

"তবে আমি এখন যাই ?"

"হাঁ যাও।"

"তোর উপরে আমার মস্ত কাজটার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেম,—দেখিস্ রোসন।"

রোসন মস্তক সঞ্চালন করিয়া জানাইল,—"তা দেখ্‌বো।"

যে কথা বলিতেছিল, সে হাঘরেপাড়ার সর্দ্দার। সর্দ্দার চলিয়া গেল। সর্দ্দার যাহাকে রোসন বলিয়া সম্বোধনাদি করিল, সে একটি সুন্দরী যুবতী। এই যুবতীর সহিতই একদিন উদয়েশ্বর শর্ম্মার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এবং ইহাকেই সে ভিক্ষা দান করিয়া গিয়াছিল।

রোসন, রোসনের প্রকৃত নাম নহে। হাঘরেরা ধরিয়া আনিয়া তাহার ঐ নামকরণ করিয়াছে। সে ভদ্রঘরের মেয়ে, কাজেই হয়ত তাহার নাম কৃষ্ণভাবিনী, কমলাননা, জগদম্বা, ত্রিপুরাসুন্দরী, বগলামুখী, কি এমনই একটা কিছু ছিল। হাঘরেপাড়ায় আসিয়া সে নামের পরিবর্ত্তন বা বিলোপ সাধন হইয়া গিয়াছে,—এখন নাম হইয়াছে রোসন। রোসন নামটি স্ত্রীলিঙ্গ কি না, তাহাও হাঘরেরা ঠিক করিয়া দেখে নাই। যাহা হউক, যে নাম তাহারা রাখিয়াছে, সেই নামেই অভিহিত করিতে হইবে।

সর্দ্দার চলিয়া গেলে, রোসন আকাশের দিকে চাহিল। দেখিল, পূর্ব্বগগনে সমুজ্জ্বল প্রভাতের তারা উঠিয়া বসিয়াছে। শ্যামল বৃক্ষ-পত্রের

উপর পুঞ্জীকৃত খদ্যোৎকুলের জ্যোতিঃ ম্লান হইয়া উঠিয়াছে। সে তখন গৃহমধ্যে গমন করিয়া ক্ষীণশিখ যে মাটীর প্রদীপটা জ্বলিতেছিল, তাহার নিকটে বসিল। সেখানে একটা ছিন্ন মাদুরের উপরে ইতস্ততঃ ভাবে কয়েকখানি কাপড় পড়িয়াছিল, কুড়াইয়া লইয়া পরিধেয় কাপড় পরিত্যাগ করতঃ তাহা পরিধান করিল,—তারপরে, সে একটা বড় রকমের বেহালা স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া গৃহের বাহির হইল,—এই সময়ে উষার বাতাস লাগিয়া নিশার প্রদীপটা নিবিয়া বাঁচিল; রোসন বরাবর নদীকূল বহিয়া চলিয়া গেল।

কতদূর গিয়া, রোসন একটা বহুশাখ বটবিটপীতলে উপবেশন করিল। দূরে জলবাহু বিস্তার করিয়া কৃষ্ণা-নদী অলস-গমনে চলিয়া যাইতেছিল, এবং প্রভাত-সমীরণে নৈশ-ফুল্ল কুসুমের গন্ধ দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

সেখানে বসিয়া রোসন ভাবিল,—"আমি কোথায় যাইতেছি? কাহার কাজে যাইতেছি—কিসের জন্য আমার এত সাহস? কিসের জন্য আমার এ কুটীল-পন্থা অবলম্বন! সর্দ্দারের কাজ;—এ কাজের পুরস্কার মুক্তি! কিন্তু মুক্ত হইয়া আমি কি করিব? পিতা মাতা আছেন কি না, সন্দেহ। আমাদের বাড়ী লুটিবার দিন হাবরেরা—তাঁহাদিগকে রাখিয়া আইসে নাই। একটি ছোট ভাই ছিল, সেটিকেও এই হতভাগিনীর সম্মুখে আছাড়িয়া মারিয়া দূরে ফেলিয়া দিয়াছিল,—স্বর্ণখণ্ড রাখালের হস্তে চূর্ণীকৃত হইয়া গিয়াছে। তবে মুক্ত হইয়া কিসের জন্য কোথায় যাইব? স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পাইব,—কিন্তু সে বিচরণে লাভ কি, সুখ কি? আজি সুন্দর অবসর—ঐ কৃষ্ণা নদীর শীতল জলে কেন এ শোকের আগুন লইয়া প্রবেশ করি না! সকল ব্যথাই দূরীভূত হইবে। হাবরের জ্বালাও যাইবে,—হৃদয়ের জ্বালাও জুড়াইবে।

মুক্তি লাভ করিয়া জীর্ণ-দীর্ণ বক্ষ-পঞ্জর চাপিয়া ধরিয়া দেশ হইতে দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়ানতে লাভ কি? আর সেই মুক্তির জন্য এত কুটীল পন্থায় পদার্পণেই বা প্রয়োজন কি?

রোসনের মনে পড়িল, তাহার জীবনের এক প্রয়োজন আছে। সেই যে মধুযামিনীতে দয়ালু ভিক্ষাদাতার দেখা পাইয়াছিল,—আর একবার তাঁহাকে দেখিতে হইবে,—এবং সেই দেখা করাই যেন জীবনের একটা মহান্ কার্য্য হইয়া বাকি পড়িয়া আছে। কিন্তু তাঁহার দেখা পাইলে, সে কি করিবে? তিনি যাহা দান করিয়াছিলেন,—তাহার প্রতিদানে সে কি দিবে? কি দিবে, তাহা সে জগতে খুঁজিয়া পায় নাই—কিন্তু দিতে তাহার বড় সাধ। না দিলে বুঝি, তাহার সারাটা জীবন বৃথা হইবে। রোসন মনে করিত, জগতে দিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত,—এই ধরণী মাঝে যাহার যে শক্তি, তাহা প্রতিজনে, অন্য জনকে বিতরণ করিয়া থাকে। কেহ বা সঙ্গীত, কেহ প্রজ্জ্বলন্ত জ্যোতি—আর কেহ নিজ পরিমল ধন বিলাইয়া দিয়া সুখী হয়। কেবল মানুষ নয়—বিধাতার সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেই দিয়া সুখী হয়; পরস্পর পরস্পরকে দিতে পারিলেই আনন্দ লাভ করে। এই ভাদ্রমাস, কেকতী বৃক্ষকে কুসুম-সাজে সাজাইয়া দিয়াছে; ঐ রজনী, কাতর ঘুমন্তে তাহার বেদনায় বিস্মৃতির শান্তি-সুধা ঢালিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছে। ঐ আকাশ, তরুর শাখায় তাহার সুমধুর কলকণ্ঠ পাখীটিকে দিয়াছে। এই উষা আসিয়া কুসুমে-পাতায় অতি ধীরে ধীরে তাহার শীতল শিশিরবিন্দু মাখাইয়া দিতেছে। ঐত কৃষ্ণার তরঙ্গগুলি ব্যথিতহৃদয়ে তাহার তটের নিকট যখন বিরাম লইতে আসিতেছে,—আসিয়াই আর কিছু বলিতেছে না, প্রথমেই তাহাকে চুম্বন দানে পুলকিত করিতেছে। তবে আমি কি দিতে পারিব না? কিন্তু দিব কি? আমি পথের ভিখারিণী, কাঙালিনী,—আমার আছে কি? আমার যা

আছে, তাই দিব। আমার দেহ নোয়াইয়া তাঁহার শ্রী-অঙ্গে সকলের সেরা আমার সার ধন অর্পণ করিব—যাহা এখন কেবল মাত্র আমার সম্বল আছে। সে, কি? আমার অবসন্ন বিষাদ ভরা এই প্রাণ,—যেমন দূর্ব্বাদলে শিশিরের বিন্দুকণা, তেমনি তাঁহার জন্য এখন যাহা অশ্রুর আকারে কেবল প্রধাবিত। কিন্তু তিনি লইবেন কেন? হো হো; আমি দিব—তাঁহার লওয়ার প্রতীক্ষায় দিব না—আমি দিব সব দিব। আমার সুখ, আমার সাধ, আমার বাসনা, আমার ছায়া, আমার শোকানল-পরিশুষ্ক সুবিমল গ্লানিবিরহিত মদির-উল্লাস, আমার আদর-উচ্ছ্বাস, আমার জীবন-দোলায় দুলিয়া দুলিয়া আমার যে কল্পন স্বপ্নে মগ্ন,—আমার অন্তরাত্মা,—ওগো! যে নিরুদ্দেশে আনিবার হেথায় হোথায় ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়—যাহা কিছু আমার সমস্ত জীবন-ব্যাপী আছে,—তাহা' সমস্ত তাঁহাকে দিয়া তবে মরিব। মরণ ত সোজা কথা—এক বিন্দু ঔষধে, একটু লৌহসূচিকায় অথবা ঐ শীতল জলে মৃত্যু ঘটে তবে দেওয়ার জন্য,—তাঁহার নিকটে লইয়াছি, দিব না? তাতেই ত আজি আমার এই কার্য্যে যাওয়া যাইব বই কি, জীবন রাখিব বই কি—তাঁহাকে দেখিব,—দিব,—তবে মরিব।

রোসন উঠিয়া দাঁড়াইল। চাহিয়া দেখিল, তখন প্রভাত হইয়া গিয়াছে,—তাহার যেন ধ্যান ভঙ্গ হইল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বস্ত্রাদি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করতঃ নগরের রাজপথ ধরিয়া চলিয়া গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

গৌড়াধিপতির রঙ্গমহাল,—চারিধারে ভীমকান্তি উচ্চ প্রাচীরে আবেষ্টিত। মহলে মহলে হাবসী খোজাগণ প্রহরণায় নিযুক্ত। রোসন সে সকল উত্তীর্ণ হইয়া, রঙ্গমহালের মধ্যস্থলে উপনীত হইল।

রঙ্গমহালে সুন্দরীর হাট। তখন প্রভাতারুণ-কিরণ সোণার বরণে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কোথাও কোন সুন্দরী, নৈশোৎসবের প্রভাতী মালা দূরে নিক্ষেপ করিয়া, প্রলম্বিতচরণে চৌকিতে বসিয়া আছেন—পুষ্পবাসিত সুরভি তৈলে বাঁদীগণ সর্ব্বাঙ্গ ম্রক্ষণ করিয়া দিতেছে। কোন সুন্দরী, গোলাপ-বাসিত ঈষদুষ্ণ জলে স্নানরতা। কোন কামিনী স্নান সমাপ্ত করিয়া দাঁড়াইয়াছেন,—আনিতম্ব-বিলম্বিত আষাঢ়ের নবীন কৃষ্ণ মেঘের মত কৃষ্ণ কেশরাশি পশ্চাদ্ভাগে দুলিতেছে, এবং তাহা হইতে বিন্দু বিন্দু জল ঝরিতেছে। কোথাও কোন যুবতী যৌবনের ভারে মন্থর গমনে কোন পরিহাস-রসনিপুণা সখীর সহিত প্রভাত-ফুল্ল কুসুমের মুণ্ডচ্ছেদনে গমন করিতেছেন। কোথাও কোন কামিনী সারানিশি সিরাজী সেবনজনিত রক্ত-আঁখি ঈষন্মিলিত করিয়া কেদারায় বসিয়া সুখ-স্বপ্নের বিশ্লেষণ-নিরতা—কোথাও বা কুঞ্জভঙ্গের রসোদ্‌গার।

রঙ্গমহালে গৌড়েশ্বরের পুরস্ত্রীগণের বাস। তাঁহার বেগমের সংখ্যা অনেক—সম্ভবতঃ পঞ্চাশজনেরও অধিক। সকলগুলি যে কোরাণ পাঠে গৃহীত হইয়াছে, তাহা নহে; রূপ-বহ্নির আকর্ষণে স্বামীর কোল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, অনেককে এই সুন্দর রঙ্গমহালে রাখিয়া তাহাদের যৌবন-মধু পান করা হইতেছে,—তদ্ভিন্ন তাঁহার কয়েকটী

কন্যা, ভগিনী, ভাগিনেয়ী, পুত্রবধূ প্রভৃতিও এই মহালে অবস্থিত। তবে সকলের আবাসভূমির শ্রেণী-বিভাগ ও শৃঙ্খলা আছে। একদিকে বিবাহিত বেগমসাহেবাগণ, অপরদিকে সমানীতা সুন্দরীগণ ;—আর এক পার্শ্বে কন্যা, ভগিনী প্রভৃতি যোষিৎগণের বাস-ভবন! কিন্তু সর্ব্বত্রই সমান সৌন্দর্য্য, সমান শোভা, সমান প্রহরা।

রোসন ভিখারিণীর সাজ পরিয়া একটা বেহালা লইয়া রঙ্গমহালে প্রবেশ করিয়াছে। ভিখারিণীগণকে খোজা প্রহরিগণ পরীক্ষা করিয়া রঙ্গমহালে যাইতে দিত,—বাদশাহের তেমন আদেশ ছিল।

রোসন কিয়দ্দূর যাইয়া বেহালাটি উরস্থপরি লম্বিত করিয়া ঈষদুন্নতমুখে দণ্ডায়মানা হইল। তাহার রুক্ষ কেশরাশি বাঁকিয়া বাঁকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া বাহুর উপরে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। প্রভাতের স্বর্ণোজ্জ্বল সূর্য্য-কর তাহার চুলে, তাহার মুখে পড়িয়া রং ফলাইয়া দিল—প্রভাতের ফুল্ল পদ্ম ভাবিয়া একটা ভ্রমরা তাহার মুখের অদূরে আনন্দে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

একটী সুন্দরী বেগম, স্নান সমাপ্ত করিয়া, গৃহে উঠিতেছিলেন,—অমন রূপসী ভিখারিণীকে দেখিয়া বলিল,—"কি চাস্, ভিখারিণী ?"

যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া রোসন বলিল,—"ভিখারিণী আর কি চাইবে, বেগমসাহেবা ? ভিক্ষা চাহি।"

বেগমসাহেবা ফুল্ল গোলাপী অধরোষ্ঠে হাসির ক্ষীণ লহরী তুলিয়া বলিলেন,—"তোর যে রূপ ভিখারিণী ; বাদসাহের প্রেম্ ভিক্ষা চাহিলেও বুঝি পাইতে পারিস্।"

রোসন বিস্ফারিতনয়নে বেগমসাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"উদাসিনী ভিখারিনী ঈশ্বরের প্রেম ভিন্ন মানুষের প্রেম চাহে না।"

বে। তবে কি ভিক্ষা নিবি ?

রো যা দয়া হয়।

এই সময় সেখানে কৌতূহলচিত্তে আরও তিন চারিটি সুন্দরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—বাঁদী ও আট দশ জন আসিয়া যুটিয়া পড়িল। যাঁহার সহিত কথা হইতেছিল, সেই বেগমসাহেবা বলিলেন,—"তুই কি গান গাহিতে পারিস্ ?"

অপরা বেগম হাসিয়া বলিলেন,—"নইলে কি অত বড় কাঠের বেহালাটা শুধুই বহিয়া বেড়াইতেছে ?"

রোসন বঙ্কিম গ্রীবা সঞ্চালনে সম্মতি জানাইল। তখন সকলের অভিপ্রায় হইল, সে একটা গান গাহে। তারপরে, তাহাকে লইয়া গিয়া একটি সুসজ্জিত কক্ষের রকে বসাইয়া দিয়া গান গাহিতে অনুমতি করা হইল। রোসন সুন্দরী, তাহার বেহালার তার টানিয়া, কাণ মুচড়াইয়া দিল। তারে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া এবং কর্ণমর্দ্দনে ব্যথিত হইয়া, বেহালা বেচারার বেসুরা-বাতিক সারিয়া গিয়া রোসনের গলার সঙ্গে একসুরে মিলিল। আমি বিবেচনা করি, অন্যান্য সুন্দরিগণ যদি তাঁহাদের স্বামী-বেহালার প্রাণের তারে আঘাত করিয়া, কর্ণমর্দ্দনে পূণা হয়েন, তবে বাহিরের বাতিক-বেসুরা সারিয়া যায়। ভরসা করি, ভামিনীর এমন বেসুরা-বেহালা আছে, তিনি উপদেশ গ্রহণে অসম্মতা হইবেন না।

রোসন যখন বুঝিল, তাহার বেহালা সুরে আসিয়াছে, তখন সে গান ধরিল। রোসনের কণ্ঠ-স্বর মণ্ডলে মণ্ডলে ঘুরিয়া, শ্রোতাগণের কর্ণে সুধাধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। রোসন গাহিতেছিল,—

ওগো, শুধা'তে পারিনি তার বারতা,
সে যে মুহূর্ত্তের তরে এসে ফিরে গেছে চলিয়ে।
আমি, উদাস পরাণে ফিরি ভাঙ্গা আশা লইয়ে।

কতেক পূর্ণিমা নিশি,
তারপর গেছে ভাসি,
সে ত আর ফিরে আসি,
শুধু, ক্ষণেকের তরে দেখিল না চাহিয়ে;

পাখীর ললিত তানে,
তারি ছবি জাগে প্রাণে,
মলয় তাহারি গানে,
নীরবে কতেক কথা দেয় কাণে ঢালিয়ে

চাঁদের মধুর হাসি,
তাহারি সুষমা-রাশি,
তাহারি সৌরভ আসি,
সান্ধ্য গগনের তলে ঘুরে যায় ভাসিয়ে,
ওগো এ জীবন আছে শুধু তারি পথ চাহিয়ে,
মরিতে হ'য়েছে সাধ, কি বলে তা শুনিয়ে।

গান বন্ধ হইল, সুন্দরীগণ ভিখারিণীর গানের প্রশংসা করিলেন। এক ভামিনী বলিলেন,—"ভিখারিণী, তোর খসম আছে ?"

ভিখারিণী বলিল,—"না বেগমসাহেবা ; আমার খসম নেই। ভিখারিণী আবার খসম লইয়া কি করিবে ?"

যিনি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন,—"কেন রাত্রে মশা হইলে, খসমে তাই তাড়িয়ে দেবে।"

ভি। মশক-দংশন ভয়ে ভিখারিণী ভীত হয় না। ভিখারিণীর শরীরে অনেক সয়।

আর এক সুন্দরী বলিলেন,—"ওগো, ওরা আমাদের মত এক-জনের অধীন হ'য়ে, শুধু একখানি মুখের প্রতি চেয়ে গোষ্ঠীশুদ্ধ হাঁ ক'রে

ক'রে বসে থাকে না। ওদের মুক্ত ভালবাসা—যখন যেখানে ইচ্ছা, সেইখানে দেয়।"

অপরা বলিলেন,—"ইচ্ছা করে, ভিখারিণী হই ;—ভ্রমর যদি গুমর করে, হৃদয়-মধু না হয় মৌমাছি-বোল্‌তায় বিলিয়ে দেই !"

যিনি প্রথমে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার রক্তাধরে একটু হাসির লহরী খেলাইয়া বলিলেন,—"ভিখারিণী ; তোর যদি খসম নেই—তবে কার জন্যে ও গান গাহিলি ?"

ভি। বেগমসাহেব, যাদের প্রাণে ভাবের লহর ছুটিয়া যায়, তারই গান বান্ধে,—গাহে অপরে। যাহারা গাহে, তাহারা শিখিয়া, অভ্যস্ত করিয়া গাহে,—গায়ক বা গায়িকার প্রাণের জড়ান কথা কি সর্ব্বদাই গানে বাহির হয় ? পাখীতে ঈশ্বরের নাম করে, সে কি তাহার অর্থ বুঝিয়া, উপকার বুঝিয়া ?—না, অভ্যস্ত কথা বলিয়া যায় ? সে তাহার মুখস্থ বুলি বলে,—কিন্তু শ্রোতা তাহাতে পরিতৃপ্তি লাভ করে। আমার গান গাহাও তাই ;—ভিখারিণীর ভিক্ষার উপরে যেমন লোভ, খসমের উপরে তেমন নয়।

বে। তোর ঘর কোথায় ভিখারিণী ?

ভি। ভিখারিণীর কি ঘর আছে, বেগমসাহেব ?

বে। তবে থাকিস্ কোথায় ?

ভি। ভিখারিণীর থাকিবার ভাবনা কি,—গাছতলায়, জঙ্গলের কুটীরে, লোকের বাড়ীর অতিথিশালায়।

বে। ভিখারিণী তুই কখনও মোকদ্দমশার বাগানে গিয়েছিস্ ?

ভি। হাঁ, তা যাই বৈ কি,—ভিখারিণীর গতি সর্ব্বত্র।

বে। শুনিয়াছি, মোকদ্দমশা নাকি বাঘের পৃষ্ঠে চড়িয়া গমনাগমন করে, খড়ম পায় দিয়া নদী পার হয়,—তা কি সত্যি ?

ভি। সত্যি বৈ কি।

বে। ওমা তা কেমন ক'রে পারে?

ভি। যোগ-বলে সব হয়, মা।

বে। তুই কিছু পারিস্?

ভি। না মা, আমি সে সকল পারি না—তবে লোকের ভাগ্য-বিষয়ে গণিয়া কিছু কিছু বলিতে পারি।

ভিখারিণীর মুখ দিয়া ভাগ্যগণনার কথা বাহির হইবামাত্র বৈশাখের ঝড়ের মত চারিদিক হইতে প্রশ্নের উপরে প্রশ্ন উঠিতে লাগিল। যাঁহারা দূরে ছিলেন,—তাঁহারা আরও ঘনাইয়া আসিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন, "তোকে অনেক ভিক্ষা দেব এখন, হাত দেখে বলে দে, আমার কপালে কি আছে? কেহ বলিলেন—"বাদশা আমায় কেমন ভালবাসেন, তা বল্; আমি তোকে একটা জামা দেব এখন।" কেহ বলিলেন, "আমার গর্ভে যদি পুত্র হয়, তবে সে বাদশাহের সিংহাসন পাইবে কি না,—তা যদি বলে দিতে পারিস, তবে তোরে এক ছড়া মুক্তার মালা দিব।" কেহ বলিলেন,—"দেখ্ দিখি ভিখারিণী বাদশা আমার উপরে মধ্যে মধ্যে যে রাগ করেন, তা কিসে সারিতে পারে? কেহ বলিলেন,—"আমার এত বয়স, এখনও সন্তান হ'ল না, তার কারণ কি?" আর একজন বলিলেন,—"আমার স্বামী বাদশার জামাই—তিনি দূরদেশে যুদ্ধে গেছেন,—ক'বে ফিরে আস্‌বেন?"

এবম্বিধ প্রশ্নের উপর প্রশ্ন হইতে লাগিল। সে প্রশ্নরাশির ভীম তরঙ্গাঘাতে ভিখারিণী হাবুডুবু খাইতে লাগিল; কাহারও কথার উত্তর দিতে না পারিয়া নিস্তব্ধে থাকিল। তারপর যখন প্রশ্ন-বেগ একটু মন্দীভূত হইয়া আসিল, তখন ভিখারিণী বলিল,—"গণা-পড়া কি জানেন, গণিতে গেলে অনেক গুপ্ত কথাও বলিয়া ফেলিতে

হয়। কাহার মনের কোণে কি লুকান আছে, তাত বলা যায় না। আপনারা নিজ নিজ গৃহে বসিলে,—আমি সকলেরই কথা গণিয়া বলিয়া দিব। অবশ্য এক দিনে কিছু এত লোকের বিষয় গণিয়া বলা যাইবে না। আবশ্যক হইলে আমি মধ্যে মধ্যে আসিব।”

তখন ইনি বলেন, আমার কথা আগে গণিয়া বলিতে হইবে; উনি বলেন, আমরা তা এখনই না বলিলে নয়, তিনি বলিলেন এখন যদি না হয়, তবে আর আমার গণনায় প্রয়োজন নাই।

তারপরে, ক্রমে ব্যাপার রূপান্তরিত হইয়া পড়িল। আগে গণনা করা লইয়া নিজেদের মধ্যে কথা কাটাকাটি, ঈর্ষা-ঈর্ষি, দ্বেষা-দ্বেষি এবং তদনন্তর কলহে পরিণত হইল। অবশেষে রক্তমুখে হাঁপাইতে হাঁপা-ইতে গণনা-বিষয়ে ধিক্কার দিতে দিতে ক্ষুণ্ণ মনে দ্বেষের বহ্নি প্রাণে মাখাইয়া লইয়া সকলেই স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেলেন। সে স্থান জন শূন্য হইল, কেবল একাকিনী ভিখারিণী বসিয়া রহিল।

যে মনে মনে হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দূরে একটি বৃদ্ধা বাঁদী তাহার কি কার্য্য লইয়া ব্যস্ত ছিল, রোসন তাহার নিকট গিয়া চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিল, “মণিবেগমের মহল্যা কোন দিকে?”

বৃদ্ধা বলিল, “ঐ যে মণিবেগম তোমার সম্মুখে বসিয়া ছিলেন, মা; তুমি কি তাঁহাকে চেন না?”

ভি। না মা, আমি তাঁহাকে চিনি না।

বৃ। আমি তাঁহারই বাঁদী—এস, আমার সঙ্গে এস।

রোসন বাঁদীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ মণিবেগমের মহল্যায় প্রবেশ করিল। বেগমসাহেবা ভিখারিণীর নিকট হইতে উঠিয়া গিয়া তখন কেবল এক-খানা কেদারায় বসিয়া সুগন্ধি দেলখোসের সৌরভ লইতেছিলেন, এমন সময় ভিখারিণী তাঁহার নিকটে গিয়া পুনরায় উপস্থিত হইল। তাহাকে

দেখিয়া, আয়ত-আঁখির কুটীল কটাক্ষ করিয়া বলিলেন,—কি লা, আবার এখানে কেন ?"

ভিখারিণী বলিল,—"আপনার ললাট-লক্ষণ দেখিয়া আমি একটা কথা জানিতে পারিয়াছি।"

কুটীল নয়ন একটু প্রশান্ত করিয়া বেগমসাহেবা বলিলেন, "কি জানতে পেরেছিস্ ?"

ভি। গোপনে বলিতে হইবে।

বে। তবে আয়, ঐ ঘরের মধ্যে চল্।

উভয়ে গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল। ভিখারিণী বলিল, "আমি দূর হইতে যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে ভুলও হইতে পারে। আপনি একবার বামহস্তখানি প্রসারণ করুন।"

বেগমসাহেবা তাঁহার রক্তোৎপল-সন্নিভ হস্ততল প্রসারণ করিলেন। অনেকক্ষণ স্থিরদৃষ্টে দর্শন করিয়া ভিখারিণী বলিল "হাঁ, ঠিক।"

কৌতূহলোদীপ্ত নয়নে ভিখারিণীর মুখের প্রতি চাহিয়া বেগম বলিলেন, "কি ঠিক ভিখারিণী ?"

ভি। আপনার পুত্র বাদসাহ হবেন।

বে। সুখের সংবাদ। আমার পাঁচবৎসরের ছেলে গয়েস উদ্দীনকে দেখিয়া সকলেই সে কথা বলে ; সকলেই বলে, তাহার অঙ্গে রাজচক্রবর্ত্তীর লক্ষণ আছে।

ভি। কিন্তু বেগমসাহেবা ; তার একটা অন্তরায় আছে।

বে। কি অন্তরায় ভিখারিণী ? তুই তাহা কেমন করিয়া জানিলি ভিখারিণী ?

ভি। এই আপনার করতলে গণিয়া দেখিতেছি। রায়-বেগম অন্তরায়।

বে। ওমা সে কি? সে কি করিবে?

ভি। ওঃ! আমি স্পষ্ট গণিয়া দেখিলাম—যখন তাহাকে বাদসাহ হরণ করিয়া আনেন, তখন তিনি তিনপীরশা ফকিরের নিকটে কতকগুলি মন্ত্রৌষধি লইয়া আসিয়াছিলেন, তাবিজও কয়েকখানা ছিল—তাহা তাঁহার একটি রৌপ্য পেটিকায় আবদ্ধ আছে। তাহারই বলে তিনি বাদসাহনামজাদাকে ভুলাইয়া রাখিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি একমাস গর্ব্ভবতী হইয়াছেন,—সেই গর্ব্ভে এক পুত্র সন্তান হইবে। বাদশাহকে ঐ পেটিকার মন্ত্রৌষধি ও তাবিজের বলে বশীভূত করিয়া, তাঁহারই পুত্রকে রাজা করিবেন, আর আপনার পুত্র নির্ব্বাসিত হইবেন।

বেগমসাহেবা ভিখারিণীর দিকে আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন. "এর কি উপায় আছে ভিখারিণী?"

ভিখারিণী একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "উপায় আছে। আপনি যদি কোন প্রকারে ঐ পেটিকাটি হস্তগত করিতে পারেন, তবেই উপায় হইবে। পেটিকার মধ্যে যাদুমন্ত্রময় তাবিজ ও ঔষধ আছে, কদাপি আপনি তাহা খুলিবেন না; আমাকে দিবেন, আমি ঐ মন্ত্রৌষধির বলে এমন বিপরীত ফল ফলাইয়া দিব যে, বাদশাহ সমস্ত বেগমগণকে ছাড়িয়া কেবল আপনারই হইয়া থাকিবেন। ঐ পেটিকার মধ্যে এমন জিনিষ আছে যে, তাহা পাইলে বাদশাহকে গোলাম করা যায়। তিনপীরশা ফকিরের উহা সংগৃহীত।"

বে। তোকে কোথায় পাব ভিখারিণী?

ভি। মুসান্নেসা ধাত্রীর বাড়ীতে ঐ পেটারা পাঠাইয়া দিলে আমি যেখানেই থাকি, পাইব।

বে। ভিখারিণী, তুই যদি এ সকল করিয়া দিতে পারিস্, আমি তোকে খুব পুরস্কার দিব।

ভি। আপনি ঐ পেটরাটার যোগাড় করিয়া দিতে পারিলেই আমি সমস্ত করিয়া দিব।

ভিখারিণী উঠিয়া চলিল। বেগমসাহেবা বলিলেন, "আবার কবে আসবি ভিখারিণী ?"

"আমার আসিবার এখন আর প্রয়োজন নাই। জিনিষটি পাঠাইয়া দিলে, কাজ হাঁসিল করিয়া তখন আসিব।" এই কথা বলিয়া ভিখারিণী বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

যে দিন ভিখারিণী বেশে রোসন বাদশার রঙ্গমহালে প্রবেশ করিয়া আবার ফিরিয়া গিয়াছিল, সেই দিন সন্ধ্যার পরে আমখাস দরবার গৃহে লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। স্বয়ং গৌড়েশ্বর মণি-মুক্তাবিখচিত স্বর্ণ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তাঁহার পার্শ্বে দবীরখাস সনাতন উপবিষ্ট। এই দবীরখাস সনাতনই ভবিষ্যতে সনাতন গোস্বামী হইয়া বৈষ্ণবগণের আদর্শ পুরুষ হইয়াছিলেন। চারি দিকে উজীর, নাজির, মোক্তার ও উকীলগণ উপবিষ্ট। লোহিতাম্বর পরিধেয় সশস্ত্র প্রহরিগণ শ্রেণীবদ্ধরূপে চারিদিকে দণ্ডায়মান। স্তম্ভে স্তম্ভে আলোকমালা প্রজ্জ্বলিত এবং বাদশাহের ব্যজনকারিণী সুন্দরী যুবতী বাদীগণের কনকালঙ্কার-মধুর-ধ্বনির সহিত গোলাপগন্ধে সভাস্থল আমোদিত করিতেছিল। অদূরে স্বর্ণ আলবোলার শীর্ষস্থ রৌপ্য কলিকায় মৃগনাভি ম্রক্ষিত অম্বুরি-তামাক বাদসাহের অনাদরে অভিমানে পুড়িয়া মরিয়া তাহার গন্ধ বিতরণ করিতেছিল, দুই একজন তদীয় প্রেমিক এক এক বার ভীত-চকিত লোলুপ-দৃষ্টিতে তৎপ্রতি চাহিয়া দেখিতেছিল, কিন্তু বাদশাহ-পার্শ্বস্থিত বলিয়া কেহ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

সেদিনকার দরবারে অনেকগুলি মোকর্দ্দমা ছিল। তিন চারিটি মোকর্দ্দমা শেষ হইলে, উদয়েশ্বরের ডাক পড়িল। উদয়েশ্বর উপস্থিত হইয়া যথারীতি অভিবাদনাদি করিয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান হইলেন।

উদয়েশ্বর উকীল-সরকার চৌধুরীমহাশয়ের জামাতা হইয়াছেন, কাজেই তাঁহার সম্ভ্রম এখন অনেক অধিক। বিনা পয়সায় অনেকগুলি উকীল তাঁহার পক্ষ সমর্থনার্থ দণ্ডায়মান হইলেন। বাদশাহের পার্শ্বস্থ

কাজিসাহেব তাঁহার অবিরল শ্মশ্রু-গুম্ফ বিরাজিত গম্ভীর মুখখানি ঈষৎ উত্তোলন করিয়া বলিলেন,—"তোমার নাম কি ?"

উদয়েশ্বর পুনরায় অভিবাদন করিয়া বলিলেন,—"আমার নাম উদয়েশ্বর শর্ম্মা—মুখোপাধ্যায়।"

কা। তোমার বাড়ী কোথায় ?

উ। হাসনহাটি,—আমি হাজরা পরগণার প্রাণকৃষ্ণ রায়ের দৌহিত্র। আমার মাতামহের আর সন্তানাদি না থাকায়, আমিই তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির হকদার। আমাকে দয়া করিয়া, তাঁহার বিষয়ের অধিকার ও বয়নামা নিতে আজ্ঞা হয়।

কা। তুমি যে তাঁহার দৌহিত্র, তাহার কি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছ ?

উ। আমি সমস্ত কাগজ পত্র হজুরে দাখিল করিয়াছি।

কাজিসাহেব পেস্কারের মুখের দিকে চাহিতেই পেস্কারসাহেব কাগজ পত্র বাহির করিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। তিনি সমস্ত কাগজ পত্র উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়া, উদয়েশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,---"কাগজ পত্র কে দাখিল করিতেছে ?"

উ। আমি এবং আমার পক্ষীয় উকীল শ্রীযুক্ত জগন্নাথচৌধুরী মহাশয়।

কা। স্বাক্ষর কর।

উদয়েশ্বর একটা কাগজে স্বাক্ষর করিয়া দাখিল করিলেন। কাজি-সাহেব বলিলেন,---তুমিই যে প্রাণকৃষ্ণ রায়ের দৌহিত্র, তাহার সাক্ষী কে ?"

তখন সাক্ষীর ডাক পড়িল। তিন চারিজন সাক্ষী আসিয়া হলফ্ পড়িয়া সাক্ষী দিল,—তাহারা বিশেষরূপে অবগত আছে, এবং আবাল্য-

কাল হইতে চিনিয়া আসিতেছে যে, উদয়েশ্বর প্রাণকৃষ্ণ রায়ের দৌহিত্র।

এই সময় প্রাণকৃষ্ণ রায়ের ভ্রাতা হরেকৃষ্ণ রায়ের উকীল উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যথাবিধি অভিবাদনাদি করিয়া বলিলেন,—"হুজুর; এই উদয়েশ্বর নামক ব্যক্তি কোন পুরুষেই প্রাণকৃষ্ণ রায়ের দৌহিত্র নহে। এ ব্যক্তি অতি দরিদ্র এবং কোন দূরদেশাগত অপরিচিত। জাল দলিলাদি দাখিল করিয়া এবং কতকগুলি মিথ্যা সাক্ষীর যোগাড় করিয়া বিষয় লইতে ইচ্ছুক হইয়াছে। রায় মহাশয় জীবিত থাকিতে থাকিতেই তাঁহার এক দৌহিত্র নিরুদ্দেশ হয়েন; অনেক অনুসন্ধানেও তাঁহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। অবশেষে শুনা গিয়াছিল, তিনি পদ্মা-নদীতে নৌকাডুবি হইয়া মারা যান; অপর একটি শিশু দৌহিত্র ছিল—আজি কয়বৎসর হইল, ডাকাত পড়িয়া তাঁহাকেও হত্যা করে, এবং রায় মহাশয়ের কন্যা বর্ত্তমান থাকেন, তখনও রায় মহাশয় জীবিত ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার অতুল সম্পত্তির লোভে কতকগুলি লোক জুটিয়া এই অপরিচিত ব্যক্তিকে উপস্থিত করিয়াছে। এ সকলই মিথ্যা। অতএব, ন্যায্য বিচার করিয়া তাঁহার ভ্রাতাকেই বিষয়ের বয়নামা দিতে আজ্ঞা হউক।

বিপক্ষের উকীলের কথা সমাপ্ত হইবা মাত্র, উদয়েশ্বরের একজন উকীল উঠিয়া তাঁহার ঘনবিন্যস্ত শ্মশ্রুরাজিকে একবার ঊর্দ্ধদেশে পরিচালিত করিয়া দিয়া, বলিলেন,—"ধর্ম্মাবতার; বিপক্ষের উকীল-মহাশয়ের কথাতেই আমাদের মক্কেলের আসলত্ব প্রমাণ পাইয়াছে। উনিই বলিলেন, প্রাণকৃষ্ণ রায়ের জ্যেষ্ঠ দৌহিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় নাই,—যাহার সন্ধান তখন পাওয়া যায় নাই, তিনিই এই উদয়েশ্বর শর্ম্মা। যে কারণে তখন সন্ধান পাওয়া যায় নাই—এখন

সেই কারণ দূরীভূত হওয়ায় উনি উপস্থিত হইয়াছেন। যদি উনি দৌহিত্র না হইবেন, তবে এ সকল দলিল-পত্র কোথায় পাইবেন। আর যদি উহার দাখিলি দলিল মিথ্যাই হইবে, তবে আসল দলিল কোথায়? প্রাণকৃষ্ণ রায়মহাশয়ের পুত্র সন্তান না থাকায়, তাঁহার জীবনান্তে তাঁহার ভ্রাতা জমিদারি কন্যা ও দৌহিত্রদিগকে দিবেন না, তাহা তিনি জানিতেন, তাই জমিদারির সনন্দ কন্যার হস্তে রাখিয়া যান। সেই কন্যা এই উদয়েশ্বরের মাতা। ইনি যখন বাড়ী হইতে বহির্গত হয়েন, তখন ভবিষ্যৎ আশায় মাতার বাক্স হইতে ঐ দলিল লইয়া যান। রায়মহাশয়ের কন্যা এখনও জীবিত আছেন, এবং তিনি হরেকৃষ্ণ রায়মহাশয়ের বাড়ীতেই আছেন। আসল দলিল তবে কোথায় গেল?"

কাজিসাহেব হরেকৃষ্ণ রায়ের উকীলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"তোমরা মিথ্যা কথা বলিয়া কেন সময় নষ্ট করিতেছ? তোমাদের দলিল কোথায়?"

উ। আর একমাস সময় দিলে আমরা আসল দলিল দাখিল করিয়া দিব।

কা। ভাল, তোমরা উভয় পক্ষেই যখন বলিতেছে, প্রাণকৃষ্ণ রায়ের কন্যা এখনও জীবিত আছেন। তিনি কি তাঁহার এই পুত্রকে চিনিতে পারিবেন না।

উদয়েশ্বরের উকীল বলিলেন,—"মাতার সন্তান চিনিতে পারিবেন না, সে কি কথা? তিনি হরেকৃষ্ণ রায়মহাশয়ের বাড়ীতেই আছেন।"

কা। "হরেকৃষ্ণ রায়ের উকীল এই এ সম্বন্ধে কি বলিতে চাও।"

উ। আমরা তাঁহাকে দিয়া সাক্ষী দেওয়াইতে পারিব না, বর্ত্তমানে তিনি আমার মক্কেলের বাড়ীতে নাই।

কা। এই মোকদ্দমার আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমার বিচারে তোমরা উভয়পক্ষে ঐ বিষয় ভাগ করিয়া লও। আর হাঙ্গাম-হুজ্জতে প্রয়োজন নাই।

ইহারাই নাম কাজির বিচার। কিন্তু এ বিচারে উভয় পক্ষেই অসম্মত হইলেন। হরেকৃষ্ণ রায়ের উকীল বলিলেন,—আর একমাস সময় দিন, আমরা আসল দলিল দাখিল করিয়া দিব এবং উদয়েশ্বর ও উদয়েশ্বরের দলিল যে জাল, তাহার প্রমান করিব।

কাজিসাহেব বিরক্তিস্বরে বলিলেন,—"এই একটা ছাই মোকদ্দমা লইয়া তোমরা অনর্থক বহু সময় নষ্ট করিতেছ। সম্প্রতি উড়িষ্যায় আমাদের ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া উঠিতেছে,—অবসর মাত্র নাই। বলিলেও তোমরা কিছুতেই শুনিবে না। ভাল, আরও পনর দিন সময় দিলাম, কিন্তু আমি শূলকারকে একটি শূল প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলাম। যে পক্ষের কথা মিথ্যা প্রমাণ হইবে, তাহাকেই অমি শূলে দিব। ষোলদিনের দিন হয় হরেকৃষ্ণ রায় আর না হয় উদয়েশ্বর শর্ম্মা শূলে চড়িয়া প্রাণ হারাইবে।"

কাজির বিচার শেষ হইল। দরবার ভঙ্গের ঘণ্টা বাজিল। কম্পিত হৃদয়ে উদয়েশ্বর ও হরেকৃষ্ণ রায় দরবার গৃহের বাহির হইলেন। তাঁহারা উভয়েই যেন সম্মুখে লৌহদণ্ড-ভীষণ শূলের সংহার মূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন।

হরেকৃষ্ণ রায় তাঁহার বাসায় গমন করিয়া, তদীয় কর্ম্মচারী দয়াময় বসুকে বলিলেন,—"এ কি হইল? যেরূপ ষড়যন্ত্র, তাহাতে কি মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করাইতে পারিবে? যদি না পার, তবে

কি হইবে? বাঁচিয়া থাকিলেত বিষয়! শেষে কি শূল-দণ্ডে জীবন হারাইব? আমার অর্দ্ধাংশ বিষয় লইয়াই আমি সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে পারিতাম। হায়! এ কি হইল?"

অতি বিষন্নমুখে দয়াময় বলিলেন,—"এমন হইবে, কে জানিত! বিষয় লইয়া মোকদ্দমায় যে শূলদণ্ডের বিধান,—ইহা অপূর্ব্ব কাজীর বিচারেই শোভা পায়।"

হ। তুমি হাঘরেপাড়ায় এখনই যাও, সর্দ্দারের নিকট দশহাজারের স্থলে পঞ্চাশ হাজার—এমন কি লক্ষ টাকা স্বীকার করগে। আমার জীবন মরণ এখন সেই দলিলের উপর নির্ভর করিতেছে।

দয়াময় বসু আর কোন কথার উত্থাপন করিলেন না। তিনি তখনই, সেই বেশেই হাঘরেপাড়া অভিমুখে গমন করিলেন।

পূর্ব্বদিবস জগন্নাথ চৌধুরীর কন্যার বিবাহে অনেকগুলি টাকা পাওয়ায় হাঘরেপাড়ায় আজি আনন্দের উচ্ছাস উঠিতেছে। যে টাকা তাহারা পাইয়াছে, তাহার অর্দ্ধেক দিয়া কয়েক কলসী মদ্য আনিয়াছে। তখন মদের মাশুল রাজায় লইতেন না, কাজেই অতিশয় সুলভ ছিল,—কয়েক কলসী বলায়, কোন কোন পাঠক অস্বাভাবিক ভাবিবেন বলিয়া কৈফিয়ৎটা দিয়া রাখিলাম।

হাঘরেপাড়ার স্ত্রী-পুরুষ সকলে একত্র মিলিত হইয়া মদ্যপান, গীত বাদ্য ও নৃত্য করিতেছিল,—এবং সময়ে সময়ে চীৎকার করিয়া গগন বিদীর্ণ করিতেছিল। স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক, রুচিকর, অরুচিকর নানাবিধ ব্যাপার সেখানে চলিতেছিল। দয়াময় বসু তথায় উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের সর্দ্দার কোথায়?"

সর্দ্দার একপার্শ্বে বসিয়া মদ্যপানান্তে এক সুন্দরীর পৃষ্ঠদেশে হস্তমর্ষণ

করিতেছিলেন।' সুন্দরী বলাতে, যৌবন-শ্রীভূষিতা অনিন্দ্যকান্তি বিশিষ্টা একটী রমণী বুঝা যায়, কিন্তু সর্দ্দারের সুন্দরী তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সে সুন্দরীর বয়স ছত্রিশ বৎসরের কম নহে। বর্ণটা নিতান্ত কৃষ্ণজামের মত নহে বটে, তাহা হইতে একটু সাদা,—তবে দেহের সহিত মাংসের বড় একটা সম্পর্ক নাই; যেমন কঙ্কাল ময় প্রতিমূর্ত্তি! দন্তপংক্তি কি জানি কোন্ গুপ্ত গর্ব্বে অস্বাভাবিক সমুন্নত। চক্ষু দুইটি সময় কালে কিঞ্চিৎ সুন্দর ছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে কোটরগত হইয়াছে, এবং তাহার নিম্নে গাঢ় কালিমা রেখা ঢালিয়া পড়িয়াছে। তবে সেই কালিমা-কলঙ্ক, বর্ণসামঞ্জস্যে কাহারও বড় নয়ন-পথে পতিত হইত না। ইনিই হাঘরেপাড়ার ভুলু-সর্দ্দারের প্রেমিকা বা ঘরণী গৃহিণী ভুলুসর্দ্দার যে ইহা হইতে অধিক সুপুরুষ তাহাও নহে। কেবল তাহার দেহটা অতিশয় বলিষ্ঠ এই মাত্র প্রভেদ।

দয়াময় বলিলেন—"একটা কথা শোন সর্দ্দার; তারপর ওসকল হবে এখন।" সর্দ্দার তখন টলিতেছিল। টলিতে টলিতে দয়াময়ের সঙ্গে একটু দূরে নিভৃতস্থানে গমন করিলে, দয়াময় বলিলেন,—"সে কাজের কি হইয়াছে?"

বক্র-আঁখি সর্দ্দার বলিল, "কুচ্ পরোয়া নেই বাবা; রোসন তার উপায় কোরে এসেছে, এয়ার। তবে মাল এখন হাতে পড়েনি।

দ। বিশেষ একটু যত্ন নিও। দশহাজার দিতে চেয়েছিলাম,—যদি এনে দিতে পার, আরও দশহাজার দেব। কিন্তু মোকদ্দমার দিন নাই—সবে মাত্র আর দশ দিন।

স। তাই হবে এবার—এই দশ দিনের মধ্যেই তোমার হাতে

রায়বেগমের পেটরার কাগজগুলো, আর আমার হাতে দশ দশ কুড়ি হাজার রোপেয়া এসে হাজির হবে। এক পেয়ালা মদ খাবে,— এস এয়ার।

দ। আমি মদ খাব না সর্দ্দার,—তুমি দশটা টাকা নাও, এ দিয়ে আরও আমোদ করগে।

স। কি বাবা; ছোটলোকমি কেন? ভুলুসর্দ্দারের হাতে দশ টাকা মদ খেতে দিলে? এ কি বাবা এয়ারকি?

দ। না সর্দ্দার; আরও কিছু দিচ্চি।

এই বলিয়া সর্দ্দারের হস্তে পঁচিশটি মুদ্রা প্রদান করিয়া, দয়াময় বলিলেন,—"তোমার প্রেরিত সে রমণী কতদূর কি করিয়া আসিল, তাহা শুনিতে পাইব কি?"

স। কি শুনবে এয়ার! সব ঠিকঠাক্—বেগমীর কাগজ পাবে।

দ। যে রমণী রঙ্গমহালে গিয়াছিল, সে কোথায়?

স। কেন বাবা চান্কাবে নাকি?

দ। না না; কি কি হ'ল শুনে যেতাম!

স। সে সব হয়ে গিয়েছে এয়ার—সে জন্যে ভাব্‌তে হবে না। তুমি নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমাও গে। তাকে এখন দেখতে পাবে না। সে এ সকল আমোদের ত্রিসীমাতেও থাকে না। এর উয্যুগ্ দেখ্‌লে বোনে-জঙ্গলে ডুব দেয়

দ। তাকে খুব সাবধান ক'রে দিয়াছ তো? কোথায় যেন কথা ব্যক্ত হয় না। বাদশার রঙ্গমহাল!

স। সে বাবা, তোমার মত ছুটো দশটা নায়েব দয়াময় হজম কর্‌তে পারে। তার চোখে কত রঙ্গমহাল লোপাট হয়! আর খিঁচিও না

বাবা—বাড়ী যাও, আমিও আর দু' এক পেয়ালা খেয়ে প্রাণটাকে নাচিয়ে তুলি গে।

আর কথা বলা ভাল নহে বিবেচনা করিয়া, দয়াময় বসু যে রাস্তায় আসিয়াছিলেন, সেই রাস্তায় ফিরিয়া চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলেন,—এই অসভ্য হায়রেসর্দ্দারের ভরসার উপরে আমার প্রভুর জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে! নিজের বিষয় নিজে উদ্ধার করিতে কাজির বিচারে শূলে প্রাণ দিতে হইবে! আমি উঁহাদের পুরাতন ভৃত্য, আমাকে চক্ষুর উপরে তাহাই দেখিতে হইবে। এই বিপদ যদি ঘটে, তবে মাতাঠাকুরাণী-দিগকে কি বলিয়া বুঝাইব! বাবুর ছোট ছেলেটি যে, এক মুহূর্ত্ত তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকে না। এই দুই এক দিনের জন্য সহরে আসেন,—বালক পথের পানে চাহিয়া থাকে! মা দুর্গে! আর কতদিন এই ভীষণ কাজির বিচারের হস্তে বঙ্গবাসীকে রাখিবে! দয়াময়ের চক্ষু পূরিয়া জল আসিল, বৃদ্ধ কোঁচার কাপড়ে চক্ষুর জল মুছিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন।

তিনি যে পথে যাইতেছিলেন, তাহা নদী-তট-প্রান্ত-বাহি। রাত্রি তখন অনেক হইয়া গিয়াছিল,—সর্ব্বত্র প্রায় নীরব। কোথাও কৈতাক্রমে খদ্যোতের ক্ষণবিকশিত ক্ষণবিলুপ্ত জ্যোতিঃ,—নগর পল্লী সুপ্ত, কেবল নদী-কুলে অন্ধকার ঝিল্লীধ্বনি-মুখরিত; ক্বচিৎ অহিধৃত ভেকের আর্ত্তরব শ্রুত হইতেছে; আর কোথাও বা নদী-কিনারের আবদ্ধ তরণী হইতে কেহ সেই নৈশনিস্তব্ধতা স্বরমুখর করিয়া গাহিতেছিল,—

শ্যামা মা তোর কেমন বিচার দস্যুকরে দিলি ডালি,
আমি কালীর সন্তান হয়ে মাগো ভেবে ভেবে হলাম কালি।'

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

অনেকক্ষণ হইল, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। অনেকক্ষণ হইল, গৌড়েশ্বরের রঙ্গমহালে সহস্র সহস্র সুগন্ধি আলো জ্বলিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। অনেকক্ষণ হইল, প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে সুন্দরীগণের সান্ধ্যসঙ্গীতের মধুর আওয়াজ দিগন্তের কোলে সুধাবর্ষণ করিয়াছে।

রঙ্গমহালের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে বিলাসের তরঙ্গ উঠিয়াছে। কোথাও সুন্দরী যুবতী নর্ত্তকীগণের নৃত্য এবং গানের আওয়াজ উঠিতেছে, কোথাও কোন বেগমসাহেবার সিরাজিসেবনাবশিষ্ট হৈমাপাত্র অভিমানে গড়াগড়ি দিয়া হৃদয়ের শব্দ জ্ঞাপন করিতেছে, কোথাও পুষ্পবাস উঠিয়া পড়িয়া কাহাকে তাহার নিজস্বত্ব করিবার চেষ্টা করিতেছে, কোথাও হাসির তরঙ্গে কোন অজানা হৃদয়কে ভাসাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে, কোথাও সঙ্গীতের মধুর রবে প্রাণের আকুল-আকাঙ্খা জাগাইয়া দিতেছে।

ধীরে ধীরে এক সুন্দরী যুবতী, এক দাসী সঙ্গে করিয়া, একটু ঘুরিয়া, পার্শ্বস্থ একটা প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে প্রবিষ্টা হইলেন।

যে কক্ষে সুন্দরী প্রবিষ্টা হইলেন, সেই কক্ষে অপর একটি সুন্দরী বসিয়া অপূর্ব্ব কারুকার্য্যখচিত দুগ্ধফেননিভ শয্যায় একটা স্ফীতোদর মখমলের বালিসের উপরে আপন দেহভার নিন্যস্ত করিয়া, একটা পুরাতন গানের একটু ভগ্নাংশ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতেছিলেন। পার্শ্বে এক দাসী হৈমপাত্রে সিরাজি লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুন্দরী সহসা উঠিয়া বসিয়া চকিত-চঞ্চলভাবে বলিলেন,—"দে দে,

সিরাজি দে! এখন এ হতভাগিনীর প্রাণের নরকাগ্নি নিভাইবার ঐ একমাত্র অবলম্বন। দে, সিরাজি দে।”

দাসী তাঁহার হস্তে সুরাপাত্র প্রদান করিলে, তিনি একচুমুকে সমস্তটুকু গলাধঃকরণ করিয়া বলিলেন, “বাঃ জগতে ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই, ভগবান নাই—আছে সিরাজি। বাঁদি, ফিন্ লে আও।”

এমন সময় আগন্তুকা সুন্দরী তাঁহার সম্মুখস্থ হইয়া রক্তাধরে মৃদু হাসিয়া বলিলেন, “কিগো, আ'জ সিরাজির উপরে এত মেহেরবানি কেন?”

একখানা দর্পণ পার্শ্বে প্রলম্বিত ছিল। সুন্দরীর হাসি সে দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া দর্পণের হৃদয় ঝলসাইয়া দিল। তবে সে অচেতন, কাজেই সহিয়া গেল। কোন পুরুষ হইলে, নিশ্চয়ই মরিত। সে হাসি বুঝি বৈশাখের দামিনী। যে হাসিল, সে মনিবেগম। যে সিরাজি পান করিল, সে রায়বেগম।

মনিবেগমকে দেখিয়া রায়বেগম তাঁহার কুসুমসম বপু কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিয়া বলিলেন,—“এস, এস তুমিও একটু সিরাজি খাবে।”

ম। কেন গো, আজি সিরাজির এত ভক্ত কেন? আগে যে কিছুতেই খাইতে স্বীকৃতা হইতে না?

রায়। ভুল বুঝিতাম;—তখন বুঝিতাম, জগতে ধর্ম্ম আছে, কর্ম্ম আছে, পাপ আছে, পাপের ফল আছে। সে ভুল এখন ভাঙ্গিয়াছে। এখন বুঝিয়াছি, ওগুলো মূর্খের কথা—মানুষ ভুলান কথা! আছে সিরাজি। মানুষের প্রাণের বেদনা দূর করিতে আছে সিরাজি! প্রাণের বেদনা বাড়াইতে আছে সিরাজি! সকল জ্বালা অজ্ঞানের কোলে ঢালিয়া দিয়া ঘুম পাড়াইতে আছে সিরাজি! তাই প্রাণ ভরিয়া

সিরাজি খাই। যতক্ষণ না অজ্ঞান হইয়া পড়ি, ততক্ষণ সিরাজি খাই।

ম। তোমার প্রাণের কষ্ট কি এখনও যায় নাই? এখনও কি তুমি তোমার পূর্ব্বস্মৃতি ভুলিতে পার নাই?

রায়বেগম এবার উঠিয়া বসিলেন। দৃপ্তা সিংহীর ন্যায় গ্রীবা বাঁকাইয়া সুরাসেবনজনিত স্ফীত আঁখি উজ্জ্বল করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—"কিসের স্মৃতি ভুলিব মনিবেগম? স্মৃতি কিসের? দেবতার গৃহিণী ছিলাম, দানবে হরণ করিয়া আনিয়াছে,—ব্রাহ্মণের পত্নী ছিলাম, যবনে স্পর্শ করিয়াছে—সেই স্মৃতি? ভুলিয়াছি বৈ কি,—এখন আমিও দানবী হইয়াছি। যতদিন ভাবিতাম, এর প্রতিফল ধর্ম্ম দিবেন ততদিন স্মৃতি রাখিয়াছিলাম—এখন দেখিতেছি, সে মিথ্যা আশা; তাই স্মৃতি ছিঁড়িতেছি—সিরাজি খাইতেছি। বাঁদি, সিরাজি দে।"

বাঁদী দুইটি স্বর্ণপাত্রে করিয়া সিরাজি আনিয়া দিল। একপাত্র মনিবেগম এবং অপর পাত্র রায়বেগম পান করিলেন। তারপরে মনিবেগম বলিলেন,—"আজ পূর্ণিমার রাত্রি। দিকে দিকে জ্যোৎস্নার পুলকিত লহরী খেলিয়া বেড়াইতেছে, বাতাস অতি শীতল ও সুমৃদু হইয়াছে, বাগানের গাছে গাছে কোকিল ও পাপিয়া ডাকিতেছে,—চল না ভগিনি! আমরা উদ্যানবিহার করিয়া আসি। তোমারও মনটা একটু খারাপ হইয়াছে দেখিতেছি। চল, একদল নর্ত্তকী ডাকাইতেছি; সেখানে গিয়া সিরাজি খাইব—গান শুনিব। তাহা হইলে তোমার প্রাণটা কতক ভাল হইবে।"

রায়বেগম কম্পিতস্বরে বলিলেন,—"চাঁদ উঠিয়াছে। মলয় বহিতেছে। কোকিল ডাকিতেছে। আমি কোথাও যাইব না,—ওরা আমায় বড় জ্বালায়। ঐ পোড়া চাঁদ সেই সোণার চাঁদমুখ মনে করাইয়া দেয়। ঐ

বাতাসের কোমলস্পর্শে সেই সুখস্পর্শ মনে পড়ে। ঐ পাখীর ডাকে সেই স্বর মনে আসে,—আর মনে হয়, তিনি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন,—আমি পিশাচী, এই অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহাকে ভুলিয়া, তাঁহার সেই স্বর্গ সিংহাসনে নরকের পিশাচকে বসাইয়াছি। তখন মনে হয়, আমি কি মরিতে পারিতাম না! আর মনে হয়, যেন সমস্ত পৃথিবী আগুন হইয়া আমাকে পুড়াইতে আসে। সে আগুন,—এ আগুন নহে। আমাদের এ আগুনে তেমন জ্বালা নাই! তেমন ভীষণতা নাই!

মনিবেগম উঠিয়া তদীয় বাঁদীকে লইয়া বাহিরে আসিলেন এবং বাঁদীর কাণের কাছে মুখ লইয়া অতি মৃদু স্বরে বলিলেন, "আজি অতি শুভ অবসর। রায়বেগমের মনের অবস্থা যেরূপ হইয়াছে এবং যেরূপ সিরাজি খাইয়াছে, আমি সহজেই উহাকে লইয়া বাগানে যাইতে পারিব। তুই খোজাকে খুব সতর্ক করে দিয়ে আয়—আমরা বাগানে গিয়ে ঘণ্টাধ্বনি করিলেই সে যেন রায়বেগমের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই পেট্‌রাটা লইয়া চলিয়া যায়।"

বাঁদী চলিয়া গেল। মনিবেগম পুনরায় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, রায়বেগম বালিসের উপরে দেহভার বিন্যস্ত করিয়া উর্দ্ধনয়নে চাহিয়া আছে। তাঁহার চক্ষু দিয়া তখন যেন আগুনের ঝলক বহিয়া যাইতেছিল।

মনিবেগম তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিলেন,—"বুঝিতেছি, এখনও পূর্ব্ব স্মৃতি ভুলিতে পার নাই। কিন্তু ভুলিবার চেষ্টা কর। উঠে এস,—চল, আমরা উদ্যানে যাই।"

রায়বেগম কোন কথা কহিলেন না,—বুঝি, কথা কহিতে পারিলেন না। চুম্বকাকর্ষণে লৌহের ন্যায়, মনিবেগমের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। এই রায়বেগম কে, তাহা পশ্চাৎ বিবৃত হইবে।

রঙ্গমহালের পার্শ্বেই গৌড়েশ্বরের অন্তঃপুরোদ্যান। তিনি হিন্দুর পুরাণ বর্ণিত স্বর্গের নন্দনকাননের কল্পনানুকরণে এই উদ্যানের রচনাকার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। গৌড়েশ্বর হুসেনশা অনেকদিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের বাড়ীতে রাখালের কার্য্য করিয়াছিলেন, অনেক দিন পর্য্যন্ত হিন্দু গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, কাজেই তিনি হিন্দুর পুরাণাদির গল্প অনেক বিদিত ছিলেন।

উদ্যানের পুরোভাগে ক্ষুদ্র বৃহৎ বিবিধ পুষ্পবৃক্ষ,—পারিজাত কাননের অনুকরণে রোপিত। পার্শ্বে এক দীর্ঘিকা, তাহার নাম মন্দাকিনী। মন্দাকিনীর নীল জল কুমুদ-কহ্লারে পরিশোভিত এবং পালিত হংস-কারণ্ডবে পরিশোভিত। মন্দাকিনীর পার্শ্বে রত্নবেদীর অনুকরণে শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরের কৃত্রিম পাহাড়—পাহাড়ের গাত্রে কৃত্রিম ঝরণা। সেই শ্বেতপর্ব্বতের দিকে দিকে বসিবার উপযুক্ত আসন ও সোপানশ্রেণী।

রঙ্গমহালের উন্মুক্ত দ্বার দিয়া মনিবেগম ও রায়বেগম উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি বাঁদী ও নর্ত্তকী গমন করিল

জ্যোৎস্না-বন্যায় সমস্ত উদ্যান ভাসিয়া ভাসিয়া খেলিতেছিল, উপরে নীল আকাশ তারকামণ্ডিত হইয়া নীরবে পৃথিবীর দিকে চাহিয়াছিল,—মন্দাকিনী দীঘি তাহার নীলজলে স-চন্দ্র আকাশের ছবি আপন হৃদয়ে আঁকিয়া লইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া মরিতেছিল।

সুন্দরীগণ রত্নবেদী পাহাড়ের কোলে মর্ম্মর আসনে উপবেশন করিলেন। নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীত আরম্ভ করিল। বাঁদীগণ পুনঃ পুনঃ সিরাজিপূর্ণ পাত্র বেগমসাহেবাদ্বয়ের হস্তে প্রদান করিতে লাগিল।

যুবতী নর্ত্তকীগণ তাহাদের সুরভিবাসপূরিত ফুল্লাধরে বিলাসের হাসির তরঙ্গ তুলিয়া কুটিল নয়নে পুনঃ পুনঃ কটাক্ষ হানিয়া গান গাহিতেছিল। মনিবেগম হাসিয়া বলিলেন,—"তোদের মরণ নাই।

নয়না হান্‌ছিস্ কি আমাদের উপরে ? আগুনে আবার কি আগুন ধরবে লা পোড়ারমুখী ? গা সেই ক্যায়সা মজা' গানটা ভাল করে গা।"

এক নর্ত্তকী হাসিয়া বলিল,—"সাহাজাদি ! ওটা আমাদের অভ্যাস। আমরা আমাদের অভ্যাসে করিয়া যাই, আর ভেড়া অবতার পুরুষগুলা ভাবে, আমাদের জন্যই অমন করে—তাই মরে। আমরা কানা খোঁড়া যুবা বুড়া খোজা মেয়ে কিছু বাছি না। মাপ কোরবেন বেগমসাহেবা,—বাঁদীগণ হুকুম তামিল করিতেছে।"

তাহারা আবার গান ধরিল। আবার নৃত্য আরম্ভ করিল। বেগম-সাহেবার হুকুমে গাহিল,—

ক্যায়সা মজা, ক্যায়সা মজা,
প্রেম-তালুকে নিশান তুলে হয়েছি রাজা !
একখানি মুখ ভাব্‌বো না'ক
দুখের বেদন সইবো না'ক
গরব ভরে চলে যাব বুক ক'রে তাজা !
তুম্ তুম্ তুম্ তা না না না—
পিয়ালা পিয়ালা ঢাল সিরাজি,
পর্‌তে ফাঁসি হ'তে দাসী একদম্ গর্‌রাজি,
মৎ খুলে দাও হৃদয়-বাঁধন ও-ত চাই না,
ঝরে যাক্ ফুলের মধু, কারসাজি সোজা।

মনিবেগম চীৎকার করিয়া উঠিলেন। গান বন্ধ হইয়া গেল,—ঘন ঘন বাগানের ঘণ্টা ধ্বনিত হইল। রায়বেগম একবার অস্ফুটস্বরে চীৎকার করিয়া সেই কৃত্রিম পাহাড়ের উপরে ঢলিয়া পড়িলেন। আসিবার সময় তিনি সখ করিয়া যে দ্বিরদরদগঠিত যষ্টিগাছটি লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা হস্তে বদ্ধ রহিল।

সহসা কেন তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন, কেহ তাহার কারণ বুঝিতে পারিল না। চারিদিক হইতে বাঁদীগণ ছুটাছুটি করিতে লাগিল। কেহ সুগন্ধি গোলাপজলে তাঁহার মস্তক সিক্ত করিতে লাগিল, কেহ কুসুম-নির্ম্মিত ব্যজনী সঞ্চালনে বাতাস করিতে লাগিল, কেহ পায়ে হস্ত বুলাইতে লাগিল,—কিন্তু রায়বেগমের সংজ্ঞা নাই। মনবেগম সমধিক স্নেহ দেখাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া রায়বেগমের মূর্চ্ছিত দেহের উপরে ঢলিয়া পড়িলেন,—আরও কয়েকজন সুন্দরী বেগম, ঐ গোলযোগ শুনিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেই সমবেদনা প্রকাশ করিয়া জড়াজড়ি আরম্ভ করিলেন। ঝটিকা-প্রবাহ উথিত হইলে বিপদ বুঝিয়া যেমন সমস্ত লতাগুলি একত্রে জোট পাকাইয়া বিপদ আরও পাকাইয়া তোলে, বেগমগণ তদ্রূপ মূর্চ্ছিতা রায়বেগমের দেহের উপর পড়িয়া তাঁহাকে আরও বিপন্ন করিতে লাগিলেন

একজন বাঁদী খোজা হাকিমকে ডাকিতে ছুটিল। ওদিকে রঙ্গমহালে রায়বেগমের গৃহ হইতে একটি পেটিকা অন্তর্হিত হইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মানুষ কি, মানুষের হৃদয় কি,—মানুষ জন্মে কেন, মরে কেন, মরে যদি, তবে আবার আসে কেন, আসে যদি, তবে আবার যায় কেন, এ সকল তথ্য,—এ সকল আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অতি গুরুতর। এই গুরুতর তথ্যের আবিষ্কার ও আলোচনা কঠোর হইতে কঠোরতর; কাজেই ইহার আলোচনায় ক্ষান্ত সকলেই—মূক অনেকেই। কিন্তু আর তিনটি তত্ত্ব আছে; আর তিনটি কথা আছে,—তাহা লইয়াই মানুষ ব্যতিব্যস্ত। তাহা লইয়াই মানুষের ছুটাছুটি। তাহা লইয়াই মানুষের মানুষ-চরিত্র। সে, তিনে এক; একে তিন;—বুঝি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের অবতার!

মানুষের হৃদয়-বৃক্ষে এই তিনটি ফুল ফুটিয়া থাকে। কিন্তু যে যাহা পারে, সে তাহার সেই ফুলের বিকাশ বিধান করিয়া সুখ-সৌরভে নিজে বিভোর হয় এবং জগৎ মাতায়। বুঝি একটিকে ফুটাইতে পারিলে, অপরগুলি তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফুটিয়া পড়ে!

মানবের হৃদয়-তরুর সর্ব্বোচ্চ শাখায় যে ফুল প্রস্ফুটিত হইয়া পবিত্র পরিমলে সমগ্র বৃক্ষের শোভা বর্দ্ধিত করিয়া দেয়, তাহা দেবতা বা দেবসদৃশ মহাজনের প্রাপ্য;—তাহা ভক্তি। প্রেম নামে আর এক পবিত্র পুষ্প বৃক্ষের মধ্যভাগে, হৃদয়ের অতি সন্নিকটে, বিবিধ পত্র-পুষ্পরাশির অভ্যন্তরে, সঙ্গোপনে কোন শুভ মুহূর্ত্তে বিকশিত হইয়া উঠে, মানুষ এ কাল পর্য্যন্ত তাহার সন্ধান করিতে পারিল না;—সে বিচিত্র পুষ্পের পূজা পাইবার যোগ্য কে, কে-ই বা অযোগ্য, তাহাও বুঝিল না। আর যে স্বর্গীয় সুকোমল স্নেহ কলিকা শিশির সিঞ্চিত জলরাশি বিস্তারিত করিয়া, শঙ্কাভিনম্র

প্রসন্ন নয়নে এই নিরাশ্রয় পৃথিবীর পানে চির দিন চাহিয়া রহিয়াছে, তাহাই বিশ্বের প্রাণ স্বরূপ। তন্নিঃসৃত শিশির কণিকা পান করিয়াই চরাচর পুষ্ট হইতেছে। যে অসহায় দুর্ব্বল, বাক্‌শক্তিশূন্য সেই অপূর্ব্ব পদার্থে তাহারই অধিকার। স্নেহ, প্রেম, ভক্তি,—সংসারের এই ত্রিবিধ ঐশ্বর্য্য পৃথক্‌ভাবে বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু স্নেহের পরিণাম যে প্রেম,—প্রেমের পরিণাম যে ভক্তি,—তাহা বুঝা বড় শক্ত কথা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর পৃথক পৃথক পূজা করা যায়—কিন্তু মিশিয়া এক হইলে তখন ধারণা করা কঠিন। তিনের সৌরভ সম্মিলিত হইয়া মানুষের হৃদয়ে, যে বিচিত্র নন্দনকানন বসাইতে পারে,—তাহা বুঝিয়া লওয়া কঠিন সমস্যা। তাহা বুঝা যায় না বলিয়াই ত আমাদের চারিপাশে এত গোলযোগ,—এত আর্ত্তনাদ, এত হাহাকার!

একদিন সন্ধ্যার প্রক্কালে উদয়েশ্বর শর্ম্মা, তাহার শ্বশুর চৌধুরী মহাশয়ের অন্দর-সংলগ্ন পুষ্পোদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। উদ্যান-পথের উভয় পার্শ্বে নানাবিধ কুসুমরাশি সন্ধ্যাসমীরণস্পর্শে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল। তাহারই মধ্য দিয়া সেই বিবিধ সৌরভ সম্মিলন উপভোগ করিতে করিতে উদয়েশ্বর ভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহার সমস্ত মুখখানায় চিন্তার ক্লিষ্ট ছায়া গাঢ় অঙ্কিত, এবং অদূরে এক নব বিকশিতা মাধবীর মূলে, প্রস্তর বেদিকার উপরে মালতী অন্য মনে বসিয়াছিল। গোধূলির শান্ত সুবর্ণালোক তাহার কেশে, চক্ষে, কপালে, বাহুতে সর্ব্বত্র নাচিতেছিল। মালতী শূন্য-নিবদ্ধদৃষ্টি, আপন মনে কি ভাবিতেছিল। ভ্রমণ করিতে করিতে চিন্তাস্তিমিত নয়নের বক্র অথচ স্থির দৃষ্টিতে উদয়েশ্বর, শতশত প্রস্ফুটিত পুষ্পগন্ধ সমাকুল লতামণ্ডপে, মাধবীশাখা সংবেষ্টিত প্রস্তরাসনে

উপবিষ্টা মালতীর পানে এক একবার চাহিতেছিলেন; কিন্তু সে চাহনীর বিশেষ কোন অর্থ ছিল কিনা, তাহা ঠিক বলা যায় না।

সহসা মালতী দেখিতে পাইল, অদূরে চম্পকবৃক্ষের এক ক্ষুদ্র শাখায় কপোতদম্পতি উড়িয়া আসিয়া উপবেশন করিল। দুইটিতে কেমন "মুখোমুখি" হইয়া বসিয়া পরস্পর পরস্পরের মুখে দাম্পত্যের প্রিয় সুধা ঢালিয়া দিতে লাগিল। মালতীর চিন্তাস্রোত অন্যমুখী হইল, সে তাহার অপরিসীম সৌন্দর্য্যময় দেহ লইয়া ছুটিয়া গিয়া ভ্রমণশীল উদয়েশ্বরের দক্ষিণ হস্ত চাপিয়া ধরিল। উদয়েশ্বর দেখিল, গোধুলিরাগরঞ্জিত আকাশের ন্যায় মালতীর মুখ কি এক অপূর্ব্ব রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। সে রাগাকর্ষণে যেন উদয়েশ্বরের হৃদয় একবার কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। উদয়েশ্বর বলিল,—"উঠিয়া আসিলে যে?

মালতী স্বামীর হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া চম্পক বৃক্ষস্থ সোহাগ-সুখ-সুপ্ত আনন্দ-দৃপ্ত কপোত-দম্পতিকে দেখাইয়া দিল।

উদয়েশ্বর বলিলেন,—"জগতে যাহারা সব ভুলিয়া, দুটি' প্রাণ মিশাইয়া লইতে পারে, তাহারাই সুখী। মালতী! একমুহূর্ত্তও যদি এমন শুভ অবসর আইসে, তবে সেই মুহূর্ত্তেই স্বর্গসুখ। পক্ষীজীবনে কপোত-কপোতী এখন স্বর্গস্থ।"

মালতী মৃদু হাসিয়া কুন্দ দন্তে অধর টিপিয়া বলিল, "আর আমরা বুঝি প্রেতলোকস্থ?

উ। ঠিক বলিয়াছ মালতী, আমরা প্রেত লোকস্থই বটে। মানবের জীবাত্মা যেমন তাহার স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া, প্রেতলোকে যায় এবং সেখানে গিয়াও তাহার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের সংস্কারগুলি লইয়া আকুল হইয়া থাকে,—আমরা, অন্ততঃ আমি তাহাই।

মা। তুমি কি বলিলে, আমি বুঝিতে পারিলাম না।

উ। তোমাকে বিবাহ করিয়াছি, আমার স্বাধীন জীবনরূপ দেহ পরিত্যাগ করিয়াছি—সর্ব্বপ্রকারে তোমার হওয়া উচিত। কিন্তু এখনও সেই স্বাধীন প্রাণের বা পূর্ব্বজীবনের স্মৃতিগুলি মুছিতে পারি নাই।

ধাঁ করিয়া হাত ছাড়িয়া দিয়া ব্রীড়োন্নত মুখে উদয়েশ্বরের মুখের দিকে অভিমান-দৃপ্ত চাহনিতে চাহিয়া মালতী বলিল,—তুমি কি আগে আর কাকেও ভালবাসিতে ?

উ। যদি বলি বাসিতাম ?

মা। আমি বলিব, তাকে এখনও মনে রাখিয়াছ কেন ? এখনই তাকে ভুলে যাও।

উ। যদি না পারি ?

মা। তবু ভুলিতে হইবে।

উ। না পারিলেও ভুলিতে হইবে কি প্রকারে ?

মা। মানুষে যত্ন করিলে সব পারে,—তুমি পারিবে না কেন ?

উ। যদি বলি, তোমাকে এবং তাহাকে উভয়কেই ভালবাসিব ?

মা। তা হইতে পারে না,—তুমি আমায় ভালবাসিবে, আমি তোমায় ভালবাসিব। এ ছাড়া কাহাকেও ভালবাসিতে নাই।— আমি শ্রীমতী মালতী দেবী আমার স্মৃতির এই ব্যবস্থা।

উ। যারা পাঁচ সাতটা বিবাহ করে, তারা কি সকলকে ভালবাসে না ?

মা। না; দুয়োরাণী সুয়োরাণী হয় কেন ? একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব ?

উ। কি, বল না ?

মা। তুমি সর্ব্বদাই যে অন্যমনস্কভাবে ভাব, সে কি তোমার সেই বাঞ্ছিতের মুখ ?

উ। যদি বলি, হাঁ।

মা। তবে আমায় একটা কথা বলিয়া দাও।

উ। কি ?

মা। আমি মরিয়া সে হইতে পারি নাকি ?

উ। আমি তা ভাবি না মালতী,—যাহার জন্য শূল প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার ভালবাসিবার চিন্তা করিবার অবসর কোথায় ?

মা। বালাই, তোমার শত্রুর জন্য শূল তৈয়ারি হোক্। যাহারা তোমার প্রতিযোগী, তারা কিছুতেই কাগজের যোগাড় করিতে পারিবে না।

উ। তোমার বাবাই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন,—আমি এখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, আমি সে সম্পত্তির কেহ নহি। আমাকে জাল সাজাইয়া তোমার বাপ এই কাণ্ড ঘটাইয়াছেন। শোন মালতি! বর্ত্তমানে জীবন রক্ষার জন্য আমি এই কার্য্যে লিপ্ত আছি, কিন্তু যদি প্রাণে বাঁচিয়া যাই, আর যদি মোকদ্দমায় জয়ী হই—কখনও আমি সে বিষয় লইব না। যাহা আমার নহে, যাহা অপরের, তাহা ছলনা করিয়া—জাল করিয়া লইয়া আমি বড় লোক হইতে চাহি না—তার চেয়ে গাছতলা ভাল!

মালতী বিস্ফারিতনয়নে উদয়েশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া কথা শুনিতেছিল। কথা শুনিয়া সে উদয়েশ্বরের অতি পবিত্র সুনির্ম্মল হৃদয় দেখিতে পাইল,—বুঝিল, উদয়েশ্বর দেবতা। মালতীর হৃদয়ের ভক্তি উচ্ছ্বাস বেগে উদয়েশ্বরের চরণতলে ছুটিয়া গেল। সে বলিল,—"হাঁ, পরের জিনিষ ফাঁকি দিয়া লইয়া বড় লোক হওয়ার চেয়ে

গাছতলা ভাল! ঐ কপোতদম্পতি গাছের শাখায় কেমন সুখে আছে!"

উদয়েশ্বর বক্রস্বরে বলিলেন,—আমার ভাগ্যে তাহাও হইবে না। ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের পরাজয়, সকল কালেই আছে। তোমার পিতা যতই যোগাড় করুন,—কখনই তাহাদের সহিত পারিবেন না,—অধর্ম্ম ধর্ম্মের নিকটে চিরদিনই অপাভূত। আমার ভাগ্যে শূলদণ্ড নিশ্চিত।"

মালতীর চক্ষুকোণে জল আসিতেছিল, সে তাহা লুকাইবার জন্য এক দৌড়ে কামিনীকুঞ্জাভিমুখে ছুটিয়া গেল, এবং তথা হইতে চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিল, একটা পুষ্পগুচ্ছ ভাঙ্গিয়া আনিয়া বলিল—কামিনী ফুটিয়াছে,—একে কে ফুটাইল, বল দেখি?"

উদয়েশ্বর প্রশান্ত দৃষ্টিতে মালতীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"সাঁজের বাতাস।"

"সে যদি একে অনাদর করে, তবে এ এমনি করিয়া ঝরিয়া যায়।" —এই বলিয়া মালতী বৃন্ত হইতে ফুলগুলা দলিয়া দিল। বৃন্তচ্যুত কামিনীর রাশি ঝর ঝর্ করিয়া মাটিতে পাড়িয়া গেল।

উদয়েশ্বর সে কথার অর্থ বুঝিলেন,—প্রীত হইলেন, কিন্তু মুগ্ধ হইলেন না। প্রেম, ভক্তি ও স্নেহ হইতে মানুষ প্রীত হয়, কিন্তু মুগ্ধ হয় না,—মুগ্ধ হয় রূপে। রূপ মায়ার খেলা কি না! কিন্তু মালতীরও রূপ ছিল, সে রূপের আকর্ষণে হয় ত কতজন মুগ্ধ হয়, তবে উদয়েশ্বর হয় নাই। তাহার মানসিক গঠনানুযায়ী সৌন্দর্য্য সে দেখিয়াছে, কাজেই অন্যে তাহার কি করিবে? কেহ প্রস্ফুটিত পদ্মের রূপে মুগ্ধ হয়, কেহ বেলার, কেহ চামেলীর, কেহ রজনীগন্ধার—আবার কেহ বা অপরাজিতার। যাহার যেমন মানসিক গঠন, যাহার যেমন রূপাভিলিপ্সা

সে তেমনই খুঁজিয়া লয়। যে তাহার মনের মত পায় না, সে দারুণ পিপাসা বুকে লইয়া লুব্ধপ্রাণে সকল ফুলের কাছেই ঘুরিয়া বেড়ায়। আগে ভাবে, যাহা চাহি তাহাই পাইব ; পাইলে দেখে, যাহা খুঁজিতেছি, তা নয়—আবার পিছাইয়া পড়ে, আবার খুঁজিয়া মরে !

উদয়েশ্বর মুগ্ধ হইলেন না, কিন্তু মালতী ছাড়িবার নহে সে, তাহার হৃদয়ের সমস্ত ভক্তির বাঁধনটুকু লইয়া উদয়েশ্বরকে বাঁধিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এদিকে সন্ধ্যার কৃষ্ণছায়া আসিয়া সমস্ত উদ্যান সমাচ্ছন্ন করিয়া ঘিরিয়া বসিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

দরবার-গৃহ লোকে লোকারণ্য হইয়াছে—আজি উদয়েশ্বর ও হরেকৃষ্ণ রায়ের মোকর্দ্দমার দিন। দুই পক্ষে মোকর্দ্দামা আরম্ভ হইলে, এক পক্ষে জয় ও অপর পক্ষে পরাজয়, ইহা চিরকালই আছে। কিন্তু কাজিসাহেব হুকুম দিয়াছেন, যে হারিবে, তাহাকে শূলদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে। দুইজনের একজন নিশ্চয়ই হারিবে—নিশ্চয়ই একজনকে শূলে চড়িয়া মর্ত্তালীলা সম্বরণ করিতে হইবে কাহার ভাগ্যে এই জীবন দণ্ড, অতর্কিত বজ্রাঘাতের ন্যায় আপতিত হয়, তাহাই দেখিবার জন্য দরবার-গৃহ দর্শকগণে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সকলেই নীরব—সকলেই চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চল দাঁড়াইয়া মোকর্দ্দামা শুনিতেছিল।

কাজিসাহেব তাঁহার দীর্ঘ শ্মশ্রু আন্দোলন করিয়া হরেকৃষ্ণ রায়ের উকীলের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন,—"এই মোকর্দ্দামায় আর এক মুহূর্ত্ত সময় দিব না। বাজে কথা একটিও শুনিব না। যাহার যে শেষ প্রমাণ আছে, অদ্যই তাহা দর্শাইতে হইবে। যে পক্ষ পরাজিত হইবে, পূর্ব্বাদেশ মতে তাহাকে শূলে চড়াইয়া মারিয়া ফেলা হইবে।"

হরেকৃষ্ণ রায় এবং উদয়েশ্বর শর্ম্মা উভয়েই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কাজিসাহেবের ঘনবিন্যস্ত অবিরল শ্মশ্রুরাশির মধ্য হইতে যখন এই কঠোর বাক্য বিনির্গত হইল, তখন উভয়েরই হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তারপর হরেকৃষ্ণ রায়ের উকীল উঠিয়া যথাবিধি অভিবাদনাদি করিয়া একতাড়া কাগজ কাজিসাহেবের সম্মুখে রক্ষা করিলেন। বলিলেন,—"খোদাবন্দ, আমরা আসল দলিল সমুদয়ই হুজুরে

হাজির করিতেছি, এই দলিলগুলি, দেখিলেই অবগত হইতে পারিবেন, প্রাণকৃষ্ণ রয়ের জাল দৌহিত্র সাজিয়া উদয়েশ্বর শর্ম্মা আদালতে হাজির হইয়াছে, এবং উহার দাখিলি দলিলাদি সমস্তই জাল।”

উদয়েশ্বরের বক্ষঃপঞ্জর ধসিয়া গেল। কাজিসাহেব দলিল গুলি পাঠ করিয়া দেখিলেন। তাহাতে রাজকীয় মোহরাঙ্কিত থাকায় সেই দলিলই আসল বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। তারপরে, হরেকৃষ্ণ রায়ের পক্ষ হইতে বিশেষরূপে প্রমাণ করাইয়া দেওয়া হইল যে, উদয়েশ্বর জাল, উদয়েশ্বরের দলিল জাল,—আর উকীল-সরকার জগন্নাথ চৌধুরী মহাশয় এই জালকার্য্যের প্রধান উদ্যোগী ও সহায়।

কাজিসাহেব মুখ পাণ্ডুবর্ণ করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—“বিষয় হরেকৃষ্ণ রায়ের হইবে না। কারণ, অনেকদিন পর্য্যন্ত এই মোক-র্দ্দামায় আমাদিগকে ভোগান হইতেছে। বিষয় সরকারে জব্দ থাকিবে; হরেকৃষ্ণ রায় অব্যাহতি পাইল। উদয়েশ্বর শর্ম্মা জাল করিয়াছে, মিথ্যা মোকর্দ্দামা করিয়াছে, অতএব তাহার প্রতি শূলদণ্ডের আদেশই অব্যাহত রাখা হইল। আর এই মোকর্দ্দমায় যাহারা মিথ্যা সাক্ষী দিয়াছে, তাহাদিগকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইবে। উকীল-সরকার জগন্নাথ চৌধুরী এই মিথ্যা মোকর্দ্দামা সাজাইয়া, জালের সহায়তা করিয়া যে অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, তাহার দণ্ড অতি গুরুতর। তাঁহাকে কি দণ্ড দেওয়া হইবে, পরে তাহার বিচার করা যাইবে। বর্ত্তমানে তিনি দরবারে নিজপদ হইতে বিচ্যুত হইলেন। তবে ইহাতেই তাঁহার অব্যাহতি হইল না, ইহা নিশ্চয়,—সত্বরেই তাঁহার বিচার হইবে।”

কাজিসাহেবের মুখ হইতে এই কথা বাহির হইবামাত্রই জগন্নাথ

চৌধুরী কাঁপিয়া উঠিলেন। উদয়েশ্বরের মস্তকোপরি আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কয়দিন ধরিয়া মৃত্যুর যে অস্পষ্ট ছবি দর্শন করিয়া আসিতেছিলেন, আজি তাহা স্পষ্টীকৃত হইয়া দেখা দিল। মুখ শুকাইয়া গেল, হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে আগুনের শ্বাস বাহির হইল।

রাজকীয় আদেশে চারিজন সশস্ত্র পদাতিক আসিয়া, উদয়েশ্বরকে ধৃত করিয়া হস্ত ও পদে লৌহশৃঙ্খল পরাইয়া দিল।

কাজীসাহেব বলিলেন,—"জাল জুয়াচুরির মাত্রা বাড়িয়া পড়িয়াছে; অতএব এই আদর্শ দণ্ডে যাহাতে নগর হইতে জাল জুয়াচুরি প্রশমিত হয়, তজ্জন্য আমি আর এক আদেশ প্রদান করিতেছি। এই উদয়েশ্বর শর্ম্মাকে আগামী কল্য প্রত্যূষে একখানা শকটে আরোহণ করাইয়া নগরের প্রত্যেক পথে পথে শৃঙ্খলিত অবস্থায় লইয়া বেড়ান হইবে, এবং সেই গাড়ীর পশ্চাতে পশ্চাতে ঘোষবাদকগণ বাদ্য বাজাইয়া বলিয়া বেড়াইবে,—জাল করিয়া উদয়েশ্বর শূলদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছে। তারপরে, পরশ্বঃ প্রত্যূষে কৃষ্ণা নদীর সদরঘাটের তীরে উহার ফাঁসি হইবে।"

এই কঠোর আজ্ঞা শ্রবণে দর্শকগণ সকলেই বিষণ্ণমুখে বাড়ী ফিরিয়া গেল; প্রহরিগণ বন্দী উদয়েশ্বরকে কারাগারে লইল।

জগন্নাথ চৌধুরী আর দাঁড়াইতে পারিলেন না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহার চক্ষুতে যেন রসাতলগামী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। হায়, তিনি কি করিয়াছেন! টাকার লোভে, ঐশ্বর্য্যের লোভে এ কি ঘটাইয়াছেন! ভদ্রসন্তানের এই কঠোরতম মৃত্যুদণ্ড!—তারপর? তারপর যাহার সুখের জন্য এত জাল, এত মিথ্যা আয়োজন, সেই কন্যা মালতী চিরবিধবা হইল! নিজেরও মহাপাতকের এখনও অবসান হয় নাই, এখনও বিচার বাকি থাকিল। উকীল-সরকারের পদও গেল। অধিকন্তু

কল্য প্রত্যুষে যখন নগরের পথে পথে আমার জামাতাকে গাড়ীতে করিয়া লইয়া বেড়াইবে—হায়! কেমন করিয়া সে দৃশ্য দর্শন করিব!

দরবার-সভা ভঙ্গ হইল। সকলেই বাহির হইয়া চলিয়া গেল। জগন্নাথ চৌধুরী আর যাইতে পারেন না। তাঁহার পদতলের নিম্নে পৃথিবী ঘুরিতেছিল। চক্ষুর সম্মুখে অগ্নি-প্রাকার রচিত হইতেছিল। তিনি আর উঠিতে পারেন না. সকলে বাহিরে গেল, কিন্তু তিনি যান না দেখিয়া, দরবারের জনৈক ভৃত্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনার কি অসুখ করিয়াছে ?"

চৌধুরী মহাশয় শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন,—"হুঁ।"

ভৃত্য বলিল,—"বাহিরে আপনার পাল্কী অপেক্ষা করিতেছে, চলুন আমি আপনাকে রাখিয়া আসিতেছি।

জগন্নাথ চৌধুরী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং উন্মত্তের মত অতি দ্রুত অথচ উদাস গমনে বাহির হইয়া পাল্কীতে আরোহণ করিলেন। বাহকগণ তাঁহার হৃদয়ভাব বুঝিল না, তাহারা নিত্য যেমন তাঁহাকে বহিয়া লইয়া যাইত, আজিও সেইরূপে লইয়া গেল।

মোকর্দ্দামার ফলাফল শীঘ্র শুনিবার আশায় একজন ভৃত্যকে মালতী দরবারে পাঠাইয়া দিয়াছিল, এবং বলিয়া দিয়াছিল—'বিচার-শেষ হইবামাত্র আসিয়া সংবাদ দেয়।"

অনেকক্ষণ হইল, ভৃত্য ফিরিয়া গিয়া মালতীকে এই কঠোরতম সংবাদ প্রদান করিয়াছে।

মালতী সংবাদ শুনিয়া বিদ্ধবাণ হরিণীর ন্যায়-ছট্‌ফট্ করিতেছিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া আগুনের শিখা বহির্গত হইতেছিল। দাবানলের মধ্যে পড়িয়া কুরঙ্গিনী যেমন দিশেহারা হইয়া পড়ে, মালতীও সেই প্রকার দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছে। সে কখনও মাটিতে পড়িয়া লুটিয়া

লুটিয়া কাঁদিতেছে, কখনও উঠিয়া পথপানে চাহিয়া দেখিতেছে, তাহার পিতা তাহার স্বামীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতেছেন কি না! হয়ত অশিক্ষিত ভৃত্য কাজির আজ্ঞা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই। কখনও ছুটিয়া ছাতে যাইতেছে, কখনও আবার সেই ভৃত্যকে ডাকিয়া একবার শ্রুত কথা দশবার শুধাইতেছে।

এই সময় অতি বিষন্নমুখে উদ্‌ভ্রান্ত চাহনিতে চাহিতে চাহিতে বজ্রদগ্ধ তরুর ন্যায় জগন্নাথ চৌধুরী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মালতী দেখিল, তাহার উদয় সে সঙ্গে নাই। আছাড় খাইয়া মাটীতে পড়িয়া যাইতেছিল, কিন্তু অনেক কষ্টে সামলাইয়া লইয়া রক্তমুখী মালতী শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা; মোকর্দ্দমার কি হইল?"

জগন্নাথ চৌধুরী সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন, দুই হস্তে মস্তক চাপিয়া ধরিয়া এক কঠোর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—মোকর্দ্দমায় সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

মালতীর চোখে জল নাই, মুখে লালিত্য নাই,—যেন উন্মাদিনী সে উন্মাদ-আঁখির উদাস চাহনীতে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল —"সর্ব্বনাশ হইয়াছে! আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে! বাবা, বাবা, জানিয়া শুনিয়া তুমিই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ! যদি তাঁহার দ্বারায় এরূপ জাল করাইবে, তবে আমার বিবাহ তাঁহার সহিত দিলে কেন? আর—আর"—

জগন্নাথ চৌধুরী উদ্‌ভ্রান্তস্বরে বলিলেন,—"আর—আর কি মালতী? বল মা, কি কথা বলিতেছিলি? সব শুনিয়া লই।"

মালতী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—"আর বলিয়া কি

করিব, বাবা!—হায় হায়, প্রলোভনে কেন এমন করিয়া মজাইলে? সে তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছিল, বাবা? সে ত কখনও তোমার দ্বারে আসিয়া বিষয় প্রার্থনা করে নাই,—তুমি তাহাকে ডাকিয়া কেন মজাইলে? সে হৃদয়ে পাপের লেশমাত্র নাই। তিনি জানিতে পাইলে, কখনই এই প্রতারণাময় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। বাবা! যখন তাঁহাকে বাঁধিয়া লইয়া যায়, তখন কি তিনি কাঁদিয়াছিলেন?"

জ। চক্ষু দিয়া জল পড়ে নাই,—কিন্তু মুখ দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল।

মা। বাবা; কাজিসাহেবকে আমাদের সর্ব্বস্ব ঘুস দিয়াও কি সেই নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণকে খালাস করিতে পারা যায় না?

জ। ইহার পূর্ব্বে—অর্থাৎ মোকর্দ্দমা যখন বিপথে যাইবার উপক্রম হইল, বুঝিয়াছিলাম—তখন সে চেষ্টা করিয়াছিলাম, ফল হয় নাই।

মা। তবে কি আর কোন উপায় নাই?

জ। না।

মা। বাবা, বাবা,—হিন্দুর মেয়ে সহমরণে যায়। আমিও সহ-মরণে যাব।

জ। আমি তার আগে যাব।

মা। কি বল বাবা; কেমন করিয়া প্রাণ বাঁধিব? বিনা কারণে, —বিনা দোষে—আমাদেরই জন্য সেই সরল—পবিত্র—অত্যুন্নত-চরিত্র ব্রাহ্মণ শূলে প্রাণ দিবে!

জগন্নাথ চৌধুরী সেখান হইতে উঠিয়া উপরের একটা কক্ষে গমন করিলেন। মালতীর চক্ষুতে এতক্ষণে জল আসিল। সে সেই

প্রস্তরময় প্রাঙ্গণের তলে পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিল। দাসীরা আসিয়া তাহাকে উঠাইবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

সহসা উপরের কক্ষ হইতে ধড়াস্ করিয়া পিস্তলের আওয়াজ হইল। মালতী সে শব্দ শুনিতে পাইল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া উন্মাদিনীবেশে সেই কক্ষাভিমুখে ছুটিয়া গেল। তিন চারিজন দাসীও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িল।

মালতী সে কক্ষে গিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। সেখানে একখানা কাষ্ঠাসনের উপরে উপবেশন পূর্ব্বক আপন ললাট লক্ষ্য করিয়া জগন্নাথ চৌধুরী পিস্তল ছুড়িয়াছেন। পিস্তলের অগ্নিময় গুলি তাঁহার ললাট ভগ্ন করিয়া দিয়াছে।

মালতী পঁহুছিতে পঁহুছিতে তিনি ঢলিয়া পড়িলেন। মালতী আছাড় খাইয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। দাসীগণও চীৎকার-কোলাহলে সে কক্ষ মুখরিত করিয়া তুলিল। বাহিরে কর্ম্মচারিগণ সে চীৎকারে বাড়ীর মধ্যে আসিয়া পড়িল,—সকলেই দেখিল, জগন্নাথ চৌধুরী আর নাই, আত্মকৃত মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত জন্য পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করিয়াছেন।

কর্ম্মচারিগণ ধরাধরি করিয়া তাঁহার শবদেহ বাহির করিয়া ফেলিল। দাসীগণ মালতীর মূর্চ্ছিত দেহে জলসিঞ্চন ও ব্যজনী ব্যজন করিতে লাগিল।

কতক্ষণ পরে, তাহার জ্ঞান হইল। সে উঠিয়া বসিল,—যেন সকল কথা সে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল; ক্রমে ক্রমে যেন তাহার স্মৃতির পথে আবার সমস্ত আসিয়া উদিত হইল। সে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিল,—"এক দিনে, একমুহূর্ত্তে আমার সকলের শেষ হইল! স্বামী গেলেন,—

পিতা গেলেন, তবে আমি থাকিব কেন? যেখানে আমার সকলে গেল, আমিও সেই পথে যাইব।”

অদূরে তাহাদের কর্ম্মচারী শীতল রায় দাঁড়াইয়া ছিল। সে মনে মনে বলিল,—“তোমায় যাইতে দিব না! অনেক দিন তোমার রূপের আগুন বুকে করিয়া বহিতেছি, এইবার আমার ষোলআনা সুবিধা উদয় হইল। তোমার পিতা গেল; স্বামীও যাইবে—তোমাকে লইয়া, তোমাদের বিষয় লইয়া, আমি দিন কতক সুখের সীমা দেখিব।” সে মনে মনে এক সুখ-রাজ্যের কল্পনা করিতেছিল, এবং বাহিরে হা-হুতাশ করিয়া সমবেদনা জানাইয়া দিতেছিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

রোসনকে মুক্তি দিবার জন্য হাঘরে পাড়ার ভুলুসর্দ্দার সন্ধ্যার পরে তাহার বাড়ীওয়ালীকে ডাকাইল।

বাড়ীওয়ালী সর্দ্দারের নিকট আসিয়া ডাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, ভুলুসর্দ্দার বলিল,—"রোসনকে আর তুমি রাখিতে পারিবে না, উহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে ও যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইবে।"

বাড়ীওয়ালী বিস্ময়সূচক স্বরে বলিল,—"আমাকে এ কথা কেন বলিতেছ? আমি আড়াইকুড়ি টাকা দিয়া ওকে কিনিয়া লইয়াছি। আজি পর্য্যন্ত উহার দ্বারায় একটি পয়সাও রোজগার করিতে পারি নাই। ছুঁড়ি বড় নজরধরা—অনেকে অনেক টাকা দিতে চায়, কিন্তু হারামজাদি জানকবুল,—যাই হোক্, সবুরে মেওয়া ফলে। এক সময় না এক সময় ওর মন ফিরাতে পারিবই।"

হাঘরেরা কোন স্থান হইতে কোন বালিকা বা যুবতীকে হরণ করিয়া লইয়া আসিলে, তাহা বিক্রয় করিত। সেই সকল দস্যুর নিকটে ঐ পাড়ার কোন বর্ষীয়সী, ব্যবসায় চালাইবার জন্য তাহা-দিগকে ক্রয় করিয়া লইত, এবং তাহার উপরে উহাদের ক্রীত স্বত্ব জন্মিত।

ভুলুসর্দ্দার বলিল,—"রোসন আমার খুব একটা বড় কাজ হাঁসিল ক'রে দিয়েছে। সেই কাজের বখসিস স্বরূপ উহাকে খালাস দিবার জন্য স্বীকার করিয়াছি। উহাকে খালাস দিতেই হইবে।"

বা। আমি যখন উহাকে কিনিয়া লইয়াছি, তখন উহার উপরে আমার দখল ও স্বত্ব আছে।

ভু। তাহা না জানিলে আমি তোমাকে ডাকিতাম না। কিন্তু উহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। আমি তোমাকে তার জন্যে কিছু টাকা দিব।

বা। তুমি আমাদের সর্দ্দার,—তোমার কথা ঠেলিতে পারি না। কিন্তু ওর রোজগারে আমার আজীবন কাল চলতো।

ভু। ও যে রোজগর করে দেবে—সে আশা করো না। এত দিনে ওকে ত কিছুতেই বাগে আন্‌তে পারনি: ভুলিয়ে দেখেছ, মেরে দেখেছ—না খেতে দিয়ে দেখেছ,—কিছুতেই কিছু হয় নি।

বা। আজ না হয়েছে, কাল হবে। সবাই কি আর একদিনে ধর্ম্ম বেচে সর্দ্দার!

ভু। তা হোক্, তুমি কতটাকা পেলে ওকে ছেড়ে দেবে, বল? আড়াই-কুড়ি টাকায় কিনেছ,—পাঁচকুড়ি নাও।

বা। ও বাপরে! অমন জিনিষটা,—আমি চিরকাল ওর রোজগার খেয়ে বেঁচে যেতাম। ওকে নাকি পাঁচ কুড়িতে ছাড়িতে পারি!

অবশেষে পাঁচশত টাকায় বাড়ীওয়ালী স্বীকৃত হইল। তখন ভুলুসর্দ্দার নগদ পাঁচশত টাকা গণিয়া বাড়ীওয়ালীর হাতে দিয়া বলিল,—"রোসন মুক্ত?"

বা। হাঁ, রোসন মুক্ত।

ভু। তাহার যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইতে পারে?

বা। হাঁ, তা পারে।

ভু। সে এখন কোথায় আছে?

বা। আমার বাড়ীতেই আছে।

ভু। তাহাকে একবার আমার এখানে পাঠিয়ে দাও গে। আর তুমি যে তাকে ছেড়ে দিলে, সে কথাও বলে দাও গে।

বাড়ীওয়ালী আঁচল পুরিয়া টাকা লইয়া চলিয়া গেল, এবং বাড়ী পঁহুছিয়া রোসনকে বলিল,—"রোসন, সর্দ্দারের অনুরোধে তোকে ছেড়ে দিলাম, তুই যেখানে ইচ্ছে চলে যা। সর্দ্দার তোকে একবার ডেকেছে।"

রোসনের বুক হইতে যেন একখানা পাথর নামিয়া গেল। রোসন উঠিয়া দাঁড়াইল,—বাড়ীওয়ালীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"তবে যাই মা; অনেক জ্বালাইয়াছি, অনেক উপদ্রব করিয়াছি, তোমার কথা না শুনিয়া হয়ত তোমার মনে ব্যথা দিয়াছি, সব বিস্মৃত হইও। তবে যাই?

রোসনকে বিদায় দিতে বাড়ীওয়ালীর নির্ম্মম প্রাণেও একটু করুণার সঞ্চার হইতেছিল। রোসন তাহাকে রোজগার করিয়া না দিলেও দাসীর মত খাটিয়া সেবা শুশ্রূষায় প্রীত করিত। আজি সেই ক্রীতদাসী বিদায় হইল।

রোসনের কোন জিনিষই ছিল না, দুই খানি বস্ত্র ছিল,—বাড়ীওয়ালী দয়া করিয়া বলিল,—"তোমার কাপড় লইয়া যাও।"

রোসন বলিল,—"কাপড়ে আর প্রয়োজন নাই। ভিখারিণীর পরিধেয় সর্ব্বত্র মিলিবে।"

বাড়ীওয়ালী বলিল,—"রাত্রে কোথায় যাইবে?"

রোসন বলিল,—"ভিখারিণীর থাকিবার স্থান সর্ব্বত্রই আছে। যখন তোমার অনুমতি পাইলাম, তখন আজিই চলিয়া যাইব। জ্যোৎস্না রাত্রি,—নগরের কোন ভদ্রগৃহস্থের বাড়ী গিয়া রাত্রি কাটাইব।"

রোসন বিদায় হইল। যে বাড়ীতে রোসন থাকিত, তাহার পূর্ব্বাংশে ভুলুসর্দ্দারের বাড়ী; রোসন সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল।

ভুলুসর্দ্দার তাহাকে দেখিয়াই বলিল,—"কেমন, আমার কথা আমি রাখিয়াছি কি না?"

রো। হাঁ, তুমি চিরজীবী হও,—তোমার প্রসাদে আমি যে নরক হইতে মুক্তি পাইলাম, ইহা চিরদিন মনে থাকিবে।

ভু। রোসন ; আমার প্রসাদে তুমি মুক্তি পাইলে, তা নয়—তোমার প্রসাদেই আমি কুড়িহাজার টাকা গণিয়া পাইলাম।

রো। সর্দ্দার ; আমি মুক্তি পাইলাম বটে ;—কিন্তু একজনের সর্ব্বনাশ করিয়া মুক্ত হইলাম।

ভু। কিসে ?

রো। আমি যদি মনিবেগমকে পরামর্শ না দিয়া আসিতাম তবে রায়বেগমকে সে মদের সঙ্গে অহিফেনের আরোক খাওয়াইত না। রায়বেগম মর মর হইয়া আছে। আর—

ভু। আর কি রোসন ?

রো। আর আমারই জন্যে উদয়েশ্বর নামক লোকটী শূলে প্রাণ হারাইবে।

উদয়েশ্বরের নাম মাত্র রোসন শুনিয়াছে, কিন্তু উদয়েশ্বরকে সে চক্ষে দেখে নাই।

ভুলুসর্দ্দার বলিল,—"রোসন ; তুমি যদি ঐ কাগজ না বাহির করিতে, তবে হরেকৃষ্ণ রায় শূলে মরিত। সে সত্য কাজে মরিত, জাল করিয়া মরিতেছে। কার মরা ভাল ?"

রোসন সে কথার কোন উত্তর করিল না। বলিল,—মুসান্নেসা ধাত্রীকে যে হাজার টাকা দিবার কথা ছিল, তাহা দেওয়া হইয়াছে কি ?

ভু। সে টাকা দয়ারামই দিয়াছে।

রো। মুসান্নেসা বড় কাজ করিয়াছিল,—সে আমায় না বাঁচাইলে আমার মাথা যাইত। মনিবেগম যখন জানিতে পারে যে, কাগজগুলি

বাহির করিয়া লইয়াছি, ক্রুদ্ধা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া নাকি মুসান্নেসাকে বলিয়াছিল, ভিখারিণীকে যেখানে পাও, ধরাইতে হইবে। কাগজগুলা আমায় না দেখাইয়া লইল কেন? তাতে ধাত্রী উত্তর করে—ঐগুলা ছিটামন্ত্র লেখা কাগজ। ভিখারিণী তাহা পুড়াইয়া ফেলিয়াছে! যাহা হউক, সর্দ্দার! একটা অনুরোধ আছে রাখবে কি?

ভু। কি বল, রোসন; আমি তোকে কন্যার মত দেখি।

রো। তবে আমার কথা রেখ সর্দ্দার;—তোমরা যে পথে থাকে যে পথে চল—ইহা পাপের পথ। এ পথ পরিত্যাগ কর,—অনেক টাকা পাইয়াছ—ইহা লইয়া শান্তির সংসার পাতাও। ধর্ম্ম কর্ম্ম কর,—ও পাপ ব্যবসা ছাড়।

ভুলুসর্দ্দার কি চিন্তা করিল। জগতে শত উপদেশে, শত দৃষ্টান্তেও যে কার্য্য সমাধা হয় না, কোন্ এক শুভ অবসরের শুভ মুহূর্ত্তের কোন্ শুভ লগ্নে কেমন এক একটী কথা পড়ে, তাহা মানুষের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায়। ভুলুসর্দ্দার বালিকার নিকট যে ইষ্টমন্ত্র লাভ করিল, তাহাতে তাহার অন্তরাত্মা পুলকিত হইল,—সে বলিল,—"রোসন; তোর কথা শুনিলাম, আজি হইতে আমি দস্যুসর্দ্দার নহি—আমি ধর্ম্মের সংসার পাতাইতে চেষ্টা করিব।"

রোসন বিদায় হইল। উপরে নীল নির্ম্মুক্ত আকাশ, নিম্নে ফুল্ল জ্যোৎস্নাময়ী পৃথিবী—রাজপথ পথিক-পরিত্যক্ত হইয়া মূর্চ্ছিতবৎ পড়িয়া আছে, রোসন নগরাভিমুখে চলিয়াছে।

যাইতে যাইতে সে ভাবিতে লাগিল,—আমি কোথায় যাইব? কাহার কাছে যাইব? জগতে আমার কে আছে? কি আছে? কাহার জন্য আমার এত ছুটাছুটি?

সেই মধু যামিনীতে যাঁহার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, সেই সুন্দর মুখ, সেই প্রসন্ন দৃষ্টি, সেই অযাচিত করুণা-হৃদয়—আর একবার দেখিতে পাইলে বুঝি জীবনের সাধ মিটিত। কে তিনি? কোথায় থাকেন? তাঁহার নাম কি? কোথায় গেলে দেখিতে পাইব? যদি দেখিতে পাই, তাঁহাকে কি বলিব? আমি হাঘরেপাড়ায় প্রতিপালিতা—হাঘরেপাড়ায় বর্দ্ধিতা—তিনি আমার সহিত আলাপ করিবেন কেন? কিন্তু তিনি জহুরী—এক মুহূর্ত্তে হৃদয় চিনিয়াছিলেন। রোসনের মনে হইল, যদি হৃদয় চিনিয়া কৃপা করেন। সে—আরও ত্বরিত গতিতে নগরাভিমুখে চলিয়া গেল।

তারপরে সে, এক গৃহস্থের বাড়ী উপস্থিত হইয়া স্থান প্রার্থনা করিল। সেখানে পরিচয় জিজ্ঞাসিত হইয়া মিথ্যা পরিচয় দিয়াছিল—তাহারা কাছার যাইতেছিল, পথে নৌকাডুবিতে তাহার স্বামী ও লোকজন সব কে কোথায় গিয়াছে বা মরিয়া গিয়াছে—সে হতভাগিনী বাঁচিয়া ভিক্ষা করিতে করিতে এই নগরে আসিয়া পঁহুছিয়াছে।

বিপন্না রমণীর আশ্রয় দানে গৃহস্থ কৃপণতা করিলেন না। বিশেষ যত্নের সহিত তাহাকে আহারাদি করাইয়া বাটীর মধ্যে রক্ষা করিলেন।

পরদিবস প্রভাতকালে রোসন বিদায় চাহিলে, গৃহিণী বলিলেন,—মা তুই সোমত্তমেয়ে! একা কোথায় যাবি? আর পথঘাটই কি চিনিস্? এক কাজ কর, আমাদের এখানে না হয়, দিনকতক থাক্—কর্ত্তা তোদের লোকজনকে একটু তত্ত্বতল্লাস করে দেখুন, আর না হয় তোর দেশের কথা ওদের কাছে বল্—উনি তোকে দেশে পাঠিয়ে দেবেন।"

রোসন ভাবিল, এখন যাইবই বা কোথায়! যাইবার স্থান কোথাও নাই—তবে একবার সেই ভিক্ষাদাতার অনুসন্ধান করিতে হইবে। এরূপ আবদ্ধ ভাবে থাকিলে তাহা হইবে না। ভাল, কি করিব

না করিব—কোথায় যাইব না যাইব, যতক্ষণ অন্ততঃ মনে মনেও তাহা স্থির করিতে না পারিতেছি—ততক্ষণ এই স্থানেই থাকি। রোসন গৃহিণীর কথায় কোন উত্তর দিল না, এবং চলিয়াও গেল না।

এই সময় এক দাসী আসিয়া বলিল,—"কর্ত্তামা! ছাতে চলুন। সকলেই ছাতে উঠিয়াছেন। শূলের আসামীকে লইয়া গাড়ী বাহির হইয়াছে, এই পথে আসিতেছে। যদি দেখেন, চলুন।"

গৃহিণী বিষণ্ণমুখে বলিলেন,—"আহা! যাহাকে শূলে দিবে, তাহাকে দেখিয়া আর কি করিব?

রোসন বলিল,—"চলুন না দেখিয়া আসি।"

তখন রোসনকে সঙ্গে লইয়া গৃহিণী ছাতে উঠিয়া গেলেন।

দূর হইতে একখানা গাড়ী ধীরে ধীরে আসিতেছিল। গাড়ীর চারি ধারে লোকের বিশাল জনতা। সঙ্গীনচড়ান বন্দুক স্কন্ধে করিয়া বাদশাহের ফৌজ সকল ভিড় ঠেলিয়া আগে পথ করিতে করিতে আসিতেছিল,—তৎপরে ঘোষবাদকগণ ঢোল বাজাইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে বলিতে আসিতেছিল,—"জাল জুয়াচুরি করিলে সকলেরই এইরূপ শূলদণ্ড হইবে। এই ব্যক্তি জাল করিয়াছিল,—কা'ল সকালে ইহাকে শূলে দিয়া মারা হইবে।"

তৎপরে একখানি গরুর গাড়ী হুচট খাইতে খাইতে আসিতেছিল। গাড়ীর উপরে লাল কুর্ত্তি পরণে শৃঙ্খলাবদ্ধ উদয়েশ্বর। উদয়েশ্বর নিথর নিশ্চল, শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় বসিয়াছিল, গাড়ীর পশ্চাতে অগণ্য দর্শক এবং বাদশাহের ফৌজ।

গৃহিণীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রোসন সে মূর্ত্তি দেখিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। তাহার মুখে কালি ঢালিয়া পড়িল—হৃদয়ের স্পন্দন বুঝি থামিয়া গেল। যে মূর্ত্তি সে মুহূর্ত্ত দেখিয়া হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়াছে,

এ যে সেই! চিনিতে তাহার বিন্দুমাত্র ভুলও হয় নাই,—সে যাহাকে খুঁজিতেছে, এ যে সেই! সে কি করিয়াছে,—কাহাকে শূলে দিয়াছে। সে-ই ত কাগজ বাহির করিয়া আনিয়া উদয়েশ্বরকে শূলে দিল! উদয়েশ্বর তাহারই প্রাণেশ্বর! হা জগদীশ্বর—জগতের কি সকলই আপনার! কাঁপিতে কাঁপিতে রোসন মূৰ্চ্ছিতা হইয়া গৃহিণীর পায়ের তলায় পড়িয়া গেল। এবং অগণ্য দর্শকে পরিবৃত হইয়া বন্দীর গাড়ী রাজপথ বাহিয়া চলিয়া গেল।

গৃহিণী দাসীকে ডাকিয়া জল আনিতে বলিলেন, এবং সকলে মিলিয়া যথোচিত যত্নে রোসনের মূৰ্চ্ছা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

রোসন মূৰ্চ্ছিত হইয়াছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার মূৰ্চ্ছা ভাঙ্গিল। সে, কাঁপিতে কাঁপিতে রাজপথের দিকে চাহিয়া দেখিল,—সে পথ জনশূন্য। ক্ষীণকণ্ঠে ভগ্নস্বরে বলিল,—"মা আমি কোথায়?"

গৃহিণী বলিলেন,—"এই যে মা, তুমি আমাদের বাড়ী, তোমার কি বড় ভয় হইয়াছে?"

রোসন বসিয়া আত্মসংযম করিল, বলিল,—"মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত শৃঙ্খলা-বদ্ধ মানুষের মুখ দেখিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম, মা!"

গৃহিণী অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিলেন,—"আহা! স্বামীকে মৃত্যুর কোলে ঢালিয়া দিয়া অনাথিনী হইয়া আসিয়াছ, আর একজনের মৃত্যুছায়া দেখিয়া যে অজ্ঞান হইবে, তার আর কথা!"

রোসনের চক্ষুতে জল ছিল না। সে চক্ষু রক্তে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাহার দৈহিক কম্প বিদূরিত হয় নাই,—সে সকলের সহিত—কাঁপিতে কাঁপিতে নীচের গেল। কিন্তু তাহার বিস্ফারিত নয়ন আর প্রসন্ন হইল না,—উদ্বেলিত হৃদয় আর প্রশান্ত হইল না। সে স্থির করিল, মরিব। যাহার জন্য হৃদয়ে আশা পুষিয়াছিলাম, তাহাকে স্বহস্তে বধ করিলাম—

সেই বধকার্য্য সমাধা হইবার পূর্ব্বে মরিব। মৃত্যু ভিন্ন এ জ্বালা জুড়াইবার আর স্থান নাই।

রোসন মৃত্যুর পথ খুঁজিতে লাগিল। সে পথে যাইবার সহস্র উপায় আছে। রোসন একখানি ছুরিকা কুড়াইয়া পাইল।

যখন গৃহিণী এবং বাড়ীর অন্যান্য পুরস্ত্রীগণ স্নানাহার লইয়া ব্যস্ত হইলেন, সেই সময় রোসন ছুরিকা লইয়া গৃহস্থের অন্তঃপুরোদ্যানে গমন করিল।

উদ্যানে আম্র, কাঁঠাল, কুল, কামরাঙ্গা প্রভৃতি বহুবিধ বৃক্ষশ্রেণী। সেই প্রশান্ত উদ্যানের মধ্যে গিয়া রোসন কাঁদিল, বলিল,—"প্রভু, না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি, এ অপরাধের মার্জ্জনা নাই,—প্রায়শ্চিত্ত নাই, বুঝি পর বলিয়া কাহারও অনিষ্ট করিতে গেলে, আপন বুকে এইরূপে ছুরিকাঘাত লাগে।"

রোসন আপন হৃদয়ে সেই তীক্ষ্ণধার ছুরিকা আমূল বিদ্ধ করিয়া দিয়া ভূমিতে বক্ষ পাতিয়া দিল। দুই একবার যন্ত্রণায় নড়িল চড়িল, তারপর চিরদিনের মত চক্ষু মুদিত করিল।

আহারাদির সময় হইলে রোসনের অনুসন্ধান হইল, কিন্তু কেহ তাহাকে খুঁজিয়া পাইল না। সকলে ভাবিল, সে হয়ত পাগল।

বৈকালে যখন বাড়ীর কর্ত্রী উদ্যানসমীপে গমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন, রোসনের মৃতদেহ ভূমিচুম্বন করিয়া পড়িয়া আছে।

রোসন কেন মরিল, তাহার কারণ কেহ জানিতে পারিল না। কিন্তু তাহার বুকের চিহ্ন ও পার্শ্বপতিত ছুরিকা দেখিয়া যাহাতে মৃত্যু হইয়াছে, তাহা সকলে বুঝিতে পারিল

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার আঁধার জগতে ঘনাইয়া আসিতেছিল, এবং মৃদুমন্দ মারুতান্দোলিতা বীচিবিক্ষোভ-সন্দর্ভোদ্ভাসিতা নদী, তাহার বাঞ্ছিতের অনুগমনে সচেষ্টা ছিল। নদীকূলের অদূরে মোকদ্দম শার বাগানোপান্ত-চত্বরে এক কপোত-পালিকা।

প্রায়াগতা সন্ধ্যার রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া একদল পারাবত চক্রাকারে নদীর উপরে উড়িতেছিল। সকিনার আহ্বানে তাহারা নিকটে নামিয়া আসিল। একটি কপোত সকিনার স্কন্ধের উপরে বসিয়া চঞ্চু দিয়া বারম্বার তাহার রক্তোৎপল-ওষ্ঠ স্পর্শ করিতেছিল। সকিনা হাসিতে হাসিতে তাহার ঠোঁট সরাইয়া দিতেছিল।

পশ্চাৎ হইতে হাসির সহিত মধুর স্বরে কথা হইল,—"খুব, যা হোক্। বনের পাখী চুমোর লোভে পাগল!"

পশ্চাৎ ফিরিয়া সকিনা চাহিয়া দেখিল,—জাহানারা।

সকিনা হাসিল। বলিল,—"বনের পাখী নির্ব্বোধ, তাহাকে পাগল সবাই করিতে পারে। রাঙ্গা ঠোঁটে ইহার হয়ত তেলাকুচার ভ্রম হইয়াছে! কিন্তু মানুষ পাগল করাই মানুষের কাজ!"

জা। জড়-মুগ্ধ মানুষে আর পশু-পক্ষীতে বড় প্রভেদ নাই।

স। কেন?

জা। বনের পাখী পাকা তেলাকুচা ভাবিয়া রাঙ্গা ঠোঁটে পাগল হয়, মানুষও সুখ ভাবিয়া দুঃখে মজে—সার ভাবিয়া অসারে প্রাণ ঢালে।

স। তুমি কি অসার?

জা। কেবল আমি কেন,—যে মানুষ, মানুষ দেখিয়া মজে, সেই অসারে মজে।

সা। কথাটা বুঝিতে পারিলাম না।

জা। তবে এস—তোমার সাধের পায়রা ছাড়িয়া দাও; চল তোমার গৃহ-দাবায় বসিয়া এই তত্ত্বের একটু আলোচনা করিগে।

সফিনা কপোতকে কপোতপালিকার দিকে উড়াইয়া দিল। সেই কপোতটি গিয়া যদি কপোত-পালিকায় উপবেশন করিল, তবে অন্যান্য কপোতগুলিও তাহাতে গিয়া বসিয়া অস্ফুট ভগ্নস্বরে নানাবিধ বুলি বলিয়া শ্রোতার মনোহরণ করিতে লাগিল। সফিনা এবং জাহানারা এক ক্ষুদ্র কুটীরের দাবায় বসিল।

জাহানারা বলিল,—"এই রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ প্রভৃতির জগতে তুমি, আমি, এ ও সে, সকলেরই বাহ্য উপাদান এক, তবে একে অন্যের জন্যে মজে কেন, মরে কেন, জান সফিনা?"

সফিনা মৃদু হাসিয়া বলিল,—"সফিনা যদি অত পণ্ডিত হবে, তবে একজনের বাঁদী হইয়া পড়িত না। তুমি জান, তুমিই বল।"

জা। জীবমাত্রেই প্রকৃতির রূপে আত্মহারা। প্রতি পদার্থ প্রতি পদার্থে মিশিতে ব্যাকুল।

স। তাই বুঝি, দরিদ্র ব্রাহ্মণ জাহানারার জন্য আকুল?

জা। তাই বটে!

স। তবে সে সফিনার জন্যেও ত উন্মাদ হইতে পারিত? এক জনে আর একখানি মুখের জন্য মরিতে প্রস্তুত হয় কেন?

জা। তার কারণও উহাই। আমার হাতের গড়ন যেমন, আর একজনের মনের হাতখানির গড়নও তেমনি—সে আমার হাতের মত হাত চায়,—তাই সে আমার হাত দেখিয়া মজে আর মরে। সে মনে

মনে আমার সর্ব্বাঙ্গের মত সর্ব্বাঙ্গ গড়াইয়া বসিয়া আছে.—সে আমায় দেখিয়া মজিবে না ত কি তোমায় দেখিয়া মজিবে, পোড়ারমুখী ?

স। এতে অনেক তর্ক আছে।

জা। কি ?

স। সে অনেক কথা।

জা। একটাই না হয় বল ?

স। একজন তোমার মত রূপ মনে মনে গড়াইয়াছে. কিন্তু সে তোমায় পাইল না. সে কি ভালবাসিতে পারিবে না ?

জা। আমায় গড়াইয়াছে. আমায় না পাইলে তাহার সবখানি ভালবাসা হয় না। প্রাণ যাহা চায়. তাহা পায় না। হয়ত আমার মত বা তাহার মনের মত চোখ দেখিয়া একবার সেখানে ঝোঁক পড়ে,—হয়ত মিলনও হয়, কিন্তু সব না পাইয়া তাহার প্রাণের পিপাসা মিটে না,—সে আরও খুঁজিতে থাকে। আবার হয়ত আমার মত বা তাহার মনের মত মুখখানা দেখে. জ্বলিত কণ্ঠে ছুটিয়া যায় ; সব পায় না, প্রাণের পিপাসাও মিটে না। নয়ত কিছুই পায় না—সংসার করে, এক হইয়া কাজ করে—কিন্তু প্রাণের আকাঙ্ক্ষা প্রাণেই থাকে। ফুলের সুবাসে, চাঁদের কিরণে, মলয়ার নিঃশ্বাসে, গানের রাগিণীতে প্রাণের ছবি জাগিয়া পড়ে—আর জ্বলিত-কণ্ঠে ঘুরিয়া মরে।

স। আমার মনের মত কথা হইল না !

জা। কেন ?

স। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েইত এক মানুষ ?

জা। মানুষ, সন্দেহ নাই।

স। উভয়েরইত ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া একই প্রকার ? আত্মাত এক রকম ?

জা। আত্মা এক ভিন্ন কি আর দ্বিতীয় আছে ?

স। তুমি রূপের পিপাসা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছ, তাহা পুরুষের পক্ষে খুব খাটে বটে, কিন্তু নারীর পক্ষে খাটে না

জা। এ সিদ্ধান্ত কিসে করিলে ?

স। মেয়ে মানুষকে একটা দেখাইয়া দিলে, সে সমস্ত হৃদয়খানি তাহারই পাদপদ্মে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হয়, অন্যকে ভাবে না।

জা। মিছে কথা। তাহা হইলে স্ত্রীলোক ব্যভিচারিণী হইত না।

স। তা বটে, কিন্তু পুরুষ যেমন নিত্য নূতনে ছুটে, স্ত্রীলোক তেমন নয়।

জা। তারও কারণ আছে।

স। কি ?

জা। যাহারা রূপেন্দ্রিয়কে চারিদিকে যত চালায়, তাহারাই তত কষ্ট পায়। স্ত্রীলোক সমাজের শাসনেই হউক, আর ধর্ম্মের খাতিরেই হউক, আপন স্বামী ভিন্ন অন্যের দিকে বড় চাহে না,—অন্য কল্পনা বড় করে না,—তাই তাহারা অধিক পুড়ে না।

স। তা হইলে তোমার মতে অনেক দেখা, অনেক ভাবা দোষ ?

জা। আমার মতে কি না চোকখাগী ? চোখের মাথা না খাইলে বড় জ্বলিতে হয়। প্রেমের সুখ পাইতে হইলে, প্রাণকে কুড়াইয়া লইতে হয়,—একটিকে আজন্ম ধরিয়া ভাবিতে হয়; এই ভাবনাই সংস্কার হইয়া মরণের পথে সঙ্গে যায়, তার পরে, জন্মান্তরে সেই একরূপেই হৃদয় গঠিত হয়—তাহাকে পাইলে প্রাণ পুলকিত হয়।

স। তা তোমার অত বড় দার্শনিক তত্ত্বের চেয়ে আমার একটা ধর্ম্মশাস্ত্র শোন।

জা। (হাসিয়া) কি বল ?

স। যে যারে চায়, যার জন্য যে পাগল হয়, তাকে অনুগ্রহ না করা মহাপাপ। ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ।

জা। উদয়েশ্বরের কথা বলিতেছ ?

স। হাঁ।

জা। তার সম্বন্ধে কি বলিতে চাহ ?

স। তুমি তাহাকে বিবাহ কর।

জা। তাহা হইলে কি হইবে ?

স। সে সুখী হইবে।

জা। আমার তাহাতে কি হইবে ?

স। একজনকে সুখী করিয়া তুমিও সুখী হইবে।

জা। তবে আমার রূপ দেখিয়া যে মজিবে, তাহাকেই সুখী করিতে হইবে ?

স। দূর, তা কেন ?

জা। তবে কি ?

স। এ তোমাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছে।

জা। তাহার সুখের জন্য সে বিবাহ করিতে চাহিতেছে। আমার তাহাতে সুখ নাই।

স। কেন, তুমি কি তাহাকে ভাল বাসিতে পারিবে না ?

জা। না।

স। তবে বলি না। কিন্তু আমার বোধ হয়, যে অত অনুগত, তাহাকে সহজেই ভালবাসা যায়।

জা। একটা মরদ ধরিয়া আনিয়া, ঐরূপ তোমার অনুগত হইতে বলিয়া দেখিব, কি কর ?

স। আমার যে একটা আছে।

জা। আমারই কি নাই ?

স। তোমার আবার কোথায় আছে লা ?

জা। কেন. মনে ?

স। সে কবে মিলিবে ?

জা। যখন দিন আসিবে

স। সে কি কল্পনা ?

জা কতকটা কল্পনা,—কতকটা জল্পনা।

স। সে কেমন মানুষ ?

জা। উদয়েশ্বরের মত দেহ—প্রাণটা ঠিক অমন নয় ?

স। তোমার হেঁয়ালি বোঝা দায়।

জা। আসল কথা বলিব ?

স। তোমার অনুগ্রহ।

জা। বাহ্য প্রকৃতি যেরূপ আমি ভালবাসি. তাই বুঝি উদয়েশ্বর। জন্ম-জন্মান্তর উদয়েশ্বর আমাকে কাঁদাইয়াছে,—এবার আমি তাহাকে কাঁদাইব।

স। ইহাও হেঁয়ালি।

জা। আরও বলি ; পীর মোকদুম শা, আমাকে নিষেধ করিয়াছেন।

স। কি নিষেধ করিয়াছেন ?

জা। উদয়েশ্বরকে বিবাহ করিতে।

স। কেন ?

জা। উদয়েশ্বর প্রাণহীন।

স। প্রাণহীন. তবে বাঁচে কেমন করিয়া ?

জা। প্রাণ আছে সকলেরই, কিন্তু প্রাণের পূর্ণতা, প্রণের সংযমে। যাঁহার প্রাণসংযম হয় নাই, তাহাকে প্রাণহীন বলা যাইতে

পারে। যাহার প্রাণ নাই, তাহার ধ্যান নাই;—ধ্যানইত প্রেম। প্রেমহীন জনের সহিত প্রাণের মিলন হবে কেন ?

স। তুমি বোঝ, আর মোকদ্দুম শা বোঝেন,—অত শত আমরা বুঝি না। আমার বোধ হয়, ও সকল গড়ান কথা।

জা। গড়ান নয়,—উদয়েশ্বরের পিছনে অনেকগুলি আত্মা লাগিয়া আছে।

স। তা তোমরা দেখলে কেমন করিয়া ?

জা। মেকদ্দুম শা দেখিয়াছেন।

স। পীর-পয়গম্বরের কথা আলাদা। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না।

জা। তিনি দেখাইবেন।

স। কবে ?

জা। এরই মধ্যে একদিন। সব কথা তোমাকে শুনাইব।

স। তা শুনিও,—কিন্তু উদয়েশ্বর আর এ পৃথিবীতে থাকিবে না। কা'ল সকালে তাকে শূলে চড়িয়ে মারা হবে।

জা। তবে তাকে বিবাহ করে, আমি কি বেউলো রাঁড়ী হব ?

স। তুমি ইচ্ছা করলে তাকে বাঁচাতে পারতে।

জা। আমিত গৌড়ের বাদশা নই।

স। বাদশা নও, কিন্তু যে সকল অদ্ভুত বিদ্যা তুমি জান, তাতে দিনকে রাত করতে পার, রাতকে দিন করতে পার;—কোন্ ভাবে কি করে যে তাকে উদ্ধার করতে, তা আমিও জানতে পারতাম না।

জা। অনেক কষ্ট পেতে হয়।

স। আহা, আমি যদি সে বিদ্যা জানিতাম, অনেক কষ্ট পাইয়াও তাকে উদ্ধার করিতাম।

জা। তার উপরে যেন তোমার ভারি প্রেম হয়েছে?

স। প্রেম কি আর সকলেরই হয়? মায়া হয়েছে।

জা। কেন হয়?

স। সে বড় ভাল মানুষ। তার মুখখানি যেন বড় ভাল।

জা। স্বীকৃত হইলাম।

স। কি স্বীকার করিলে?

জা। উদয়েশ্বরকে উদ্ধার করিব।

স। নিশ্চয়?

জা। নিশ্চয়। কিন্তু তোমাকেও কতকগুলি কাজ করিতে হইবে।

স। আমাকে জলে ডুবিতে বলিলেও আমি ডুবিব। কিন্তু তার শূলে দিবার দিন কা'ল সকালে,—এই রাত্রির মধ্যেই উদ্ধার করিতে হইবে।

জা। হাঁ, তাহাই হইবে। তুমি তোমার ঘরের কাজ সারিয়া লও। আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।

স। কোথায়?

জা। আমি যেখানে যাইব।

স। তাহাই—তুমি তোমার ঘরে যাও, আমি একটু পরেই তোমার ওখানে যাইব।

জাহানারা চলিয়া গেল।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

ক্রমে সন্ধ্যা অতীত হইল। তারকা-স্তবক সুনীল গগন-মণ্ডলে নীরবে ফুটিতে লাগিল। অন্ধকার, ঘন সন্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজির মধ্যে নিবিড় হইয়া উঠিল।

সে দিন কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী, দ্বিতীয় প্রহরের পরে ক্রমে চন্দ্রমার স্নিগ্ধ জ্যোতি নৈশ অন্ধকার দূর করিল। বৃক্ষসমূহের নিবিড় পত্রাবলীর মধ্য দিয়া সেই কিরণ প্রসারিত হইল। স্নিগ্ধ কিরণ জালে প্রকৃতি স্নিগ্ধতায় নিমগ্ন হইলেন, জীবগণ সুষুপ্তাবস্থায় স্নিগ্ধতার সংস্পর্শে প্রতি মুহূর্ত্তে শান্তি লাভ করিতে লাগিল।

ফুল্ল-জ্যোৎস্নার রজতধারা সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া জাহানারা ও সফিনা কৃষ্ণানদীর তীরে গিয়া উপবেশন করিল। তাহারা যেখানে বসিল, সেখানে আঘাটা,—ইতস্ততঃ নর-কঙ্কাল, নর-কপাল, শব-কন্থা, চিতা-ঙ্গার বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে,—অদূরে সদ্য প্রজ্জ্বলিত চিতার আগুন তখনও ধীকি ধীকি জ্বলিতে ছিল।

সফিনা বলিল,—"আমাকে কি করিতে হইবে?

জা। আমার উত্তরসাধিকা হইতে হইবে

স। বল, তোমার শক্তি রক্ষা করিতে হইবে?

জা। হাঁ।

স। তুমি কোন্ সংযম আরম্ভ করিবে?

জা। আমি ভাবিতেছি, শরীর ও আকাশের সম্বন্ধের উপর চিত্ত-সংযম করি। *

---

* যোগশাস্ত্রের মতে, শরীর ও আকাশে সম্বন্ধের উপর চিত্ত সংযম করিলে

স। আমি বলিতেছিলাম, চিত্তের প্রচার-স্থান গুলিকে সংযম কর, তাহা হইলে তুমি অর্থাৎ তোমার জীবাত্মা কারাগারের কোন রক্ষী বা কারাধ্যক্ষের জীবিত দেহে প্রবেশ করিয়া, সহজেই উদয়েশ্বরের উদ্ধার সাধন করিতে পারিবে।

জা। ঐ সাধনার কথা শাহ সাহেবের নিকট শুনিয়াছি, কিন্তু শিখিতে পারি নাই।

স। উহা কি বড় কঠিন।

জা। কঠিন অকঠিন সবই সমান,—খাটিতে পারিলে সকল তত্ত্বেই সিদ্ধি লাভ করা যাইতে পারে। যখন বন্ধের কারণ শিথিল হইয়া যায়, ও চিত্তের প্রচার-স্থান গুলিকে অর্থাৎ শরীরস্থ নাড়ীসমূহকে অবগত হন, তখন তিনি অপরের শরীরে প্রবেশ করিতে পারেন।

স। ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

জা। যোগী অন্য এক দেহে অবস্থান করিয়া তদ্দেহে ক্রিয়াশীল থাকিলেও কোন এক মৃতদেহে প্রবেশ করিয়া উহাকে সঞ্চালন করিতে

যোগী তুলার ন্যায় লঘু হইয়া যান, সুতরাং আকাশের মধ্য দিয়া গমন করিতে পারেন। ইহার বৈজ্ঞানিক যুক্তি এইরূপ হইতে পারে যে, আকাশই এই শরীরের উপাদান; আকাশই এক প্রকার বিকৃত হইয়া এই শরীর-রূপ ধারণ করিয়াছে। যদি যোগী শরীরের উপাদান ঐ আকাশের সংযম প্রয়োগ করেন, তবে তিনি আকাশের ন্যায় লঘুতা প্রাপ্ত হন ও যেখানে ইচ্ছা, বায়ুর মধ্য দিয়া যাইতে পারেন।

যখন মন বাহ্য বস্তুর বাহ্যভাগকে পরিত্যাগ করিয়া উহার আন্তরিক ভাবগুলির সহিত নিজেকে একীভূত করিবার উপযুক্ত অবস্থায় উপনীত হয়, যখন দীর্ঘ অভ্যাসের দ্বারা মন কেবল একমাত্র সেইটিই ধারণা করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই অবস্থায় উপনীত হইবার শক্তি লাভ করে, তখন তাহাকেই শক্তি বলে।

পারেন। অথবা তিনি কোন জীবিত শরীরে প্রবেশ করিয়া সেই দেহস্থ মন ও ইন্দ্রিয়গণকে নিরুদ্ধ করিতে পারেন ও সময়ের জন্য সেই শরীরের মধ্য দিয়া কার্য্য করিতে পারেন। প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক লাভ করিলেই উহা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে। তিনি অপরের শরীরে প্রবেশ করিতে পারেন; কারণ, তাঁহার আত্মা যে কেবল সর্ব্বব্যাপী তাহা নহে; তাঁহার মনও সর্ব্বব্যাপী,—উহা সেই সর্ব্বব্যাপী মনের একাংশ মাত্র। এক্ষণে কিন্তু উহা কেবল এই শরীরের স্নায়ুমণ্ডলীর ভিতর দিয়াই কার্য্য করিতে পারে, কিন্তু যোগী যখন এই স্নায়বীয় প্রবাহগুলি হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারেন, তখন তিনি অন্যান্য শরীরের দ্বারাও কার্য্য করিতে পারেন।—বুঝিয়াছ?

স। বুঝিয়াছি। আমার পালক পিতা মোকদ্দমশাহ জলের উপর দিয়া গমনাগমন করিয়া থাকেন, তুমি উহা করিতে শিখিয়াছ কি?

জা। না। উহা উদান-নামক স্নায়ু-প্রবাহ জয়ের ফল। অর্থাৎ যে স্নায়বীয় শক্তি-প্রবাহ ফুসফুস ও শরীরের উপরিস্থ সমুদয় অংশকে নিয়মিত করে, যিনি তাহাকে জয় করিতে পারেন, তিনি অতিশয় লঘু হইয়া যান। তিনি আর জলমগ্ন হন না, কণ্টকের উপর ও তরবারিফলকের উপর অনায়াসে ভ্রমণ করিতে পারেন, অগ্নির মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিতে পারেন ও তাঁহার আরও নানাপ্রকার শক্তি লাভ হইয়া থাকে।

স। যাক্, ও সকল কথায় এখন আমাদের আর কাজ কি? যখন শিখিব, তখন দেখা যাইবে। এখন কার্য্যারম্ভ কর।

জা। রাত্রি কত?

স। অষ্টমী তিথি, প্রায় চারি দণ্ড রাত্রি জ্যোৎস্না উঠিয়াছে; বোধ হয়, কুড়ি দণ্ড হইতে পারে।

জা। আমি কারাগার মধ্যে যাইব, তুমি আমার দেহ রক্ষা করিও।

স। প্রস্তুত হইলাম।

জাহানারা কূর্ম্মাসন করিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ স্থিরভাবে থাকিল। সফিনা দেখিল, একটা জ্যোতিঃ উঠিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে চলিয়া গেল। পাশ্চাত্য কথায় এই জ্যোতির কম্পনকে ইথরের ভাইব্রেসশন বলা যাইতে পারে।

গৌড়েশ্বরের কঠোর কারাগারের ভীম প্রাচীরের দেউড়ীতে দেউড়ীতে সশস্ত্র প্রহরিগণ প্রহরণায় নিযুক্ত। সেই কারা-প্রাসাদের একটা প্রকোষ্ঠে বন্দী উদয়েশ্বর বসিয়া আপন অদৃষ্ট ভাবিতেছিল। জানুদ্বয়-ঘনিষ্ঠসংলগ্নমুখে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল। মস্তকের লম্বিত কেশ-রাশি নিম্নদিকে ঝুলিয়া ঝুলিয়া পড়িতেছিল। চক্ষু দিয়া জলরাশি গড়াইয়া গড়াইয়া গণ্ডস্থল ভাসাইয়া দিতেছিল। গৃহের মধ্যে একটা আলো জ্বলিতেছিল। প্রভাত হইলেই যে, ভীষণ শূলদণ্ডে মৃত্যুর কোলে শয়ন করিবে, তাহার কি চিন্তা, কিসের ভাবনা, কেন অনিদ্রা, তাহা কি আর বলিতে হইবে?

উদয়েশ্বর যে গৃহে বসিয়া বসিয়া মৃত্যুর বিভীষিকা দেখিয়া মর্ম্মদাহে বিনিদ্র রজনী কাটাইতেছিল, সেই গৃহে কারাধ্যক্ষ প্রবেশ করিলেন। কারাধ্যক্ষের প্রবেশের কারণ, রাত্রি থাকিতে থাকিতেই উদয়েশ্বরকে জাগাইতে হইবে, এবং অতি প্রত্যুষে শূলদণ্ডের জন্য প্রহরিগণে বেষ্টিত করিয়া বধ্য-ভূমিতে পাঠাইয়া দিতে হইবে।

কারাধ্যক্ষ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া উদয়েশ্বরকে ডাকিলেন। গৃহ-দেওয়ালে আলো জ্বলিতেছিল,—কারাধ্যক্ষের আহ্বানে উদয়েশ্বর

উত্তর দিল না, হয়ত কথা তাহার কাণেই পঁহুছে নাই। এরূপ মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত অনেকের এমন অবস্থা কারাধ্যক্ষ দর্শন করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহার নিকটে নূতন বলিয়া কিছুই বোধ হইল না। তিনি আবার তাহাকে ডাকিতে যাইতেছিলেন,—সহসা গৃহস্থিত ক্ষীণশিখ আলোকটা অস্বাভাবিকরূপে উজ্জল হইয়া সমস্ত গৃহখানাকে অতি অস্বাভাবিক রূপে আলোকিত করিল। কারাধ্যক্ষ বিস্মিত হৃদয়ে আলোকাধারের দিকে চাহিলেন—মুহূর্ত্ত মধ্যে আলোকটি নিবিয়া গেল গাঢ় হইতে প্রগাঢ়তর অন্ধকারে সমস্ত গৃহ ডুবিয়া পড়িল। কারাধ্যক্ষের বোধ হইল, যেন সমস্ত গৃহখানা কোন্ অজ্ঞানাদেশের অন্ধকাররাশি বুকে করিয়া মরণ-মুহূর্ত্তের আয়োজন করিয়া বসিয়াছে। আর একবার ভাল করিয়া দেখিবার জন্য চেষ্টা করিলে, কারাধ্যক্ষ দেখিলেন—গৃহের ছাদ হইতে একটি একটি করিয়া মানুষ নামিয়া নামিয়া সেই অন্ধকারসমূদ্রে ভাসিয়া ভাসিয়া কিলি-মিলি করিতেছে। তাহাদের গঠন অস্বাভাবিক, ভাব অস্বাভাবিক, হাসি অস্বাভাবিক—কারাধ্যক্ষ ভয়ে, বিস্ময়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। একটা মূর্ত্তি কারাধ্যক্ষের প্রায় নিকটে ঘনাইয়া আসিয়া তাহার দীর্ঘ হস্ত প্রসারণ করিল। আর সহ্য হয় না, হৃদয় বাঁধিতে পারে না,—কারাধ্যক্ষ ভয়ে, বিভীষিকায় স্তম্ভিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন।

উদয়েশ্বর এ সকলের কোন সংবাদই রাখে না। গৃহে আলো ছিল, অন্ধকার হইয়াছে,—জন-শূন্য ছিল, কারাধ্যক্ষ আসিয়াছে—বিভীষিকায় ভীত হইয়াছে, সে তাহার কিছুই জানে না। সে আপন মনে আপনার অবস্থা ভাবিয়া মুগ্ধ হইতেছিল।

সহসা তাহার কাণের কাছে, কে বলিল,—"শীঘ্র উঠিয়া আইস,

কারাধ্যক্ষের পাশ দিয়া বাহির হও,—আমি জাহানারা। তোমার কোন ভয় নাই,—শীঘ্র বাহির হও।"

উদয়েশ্বর চমকিয়া উঠিল! চকিত নয়নের চঞ্চল দৃষ্টিতে চাহিল,—সমস্ত গৃহখানা বৈদ্যুতিক আলোকে মুহূর্ত্তের জন্য উদ্ভাসিত হইল। উদয়েশ্বর দেখিল, দরোজার নিকটে বিমুখ হইয়া কারাধ্যক্ষ দাঁড়াইয়া আছে। আবার ঘোর অন্ধকারের জমাট—আবার সেই প্রেত মূর্ত্তি-কুলের অন্ধকার সমুদ্রে সন্তরণ।

উদয়েশ্বর ভাবিল, জাহানারাদের এ সকল কাণ্ড আয়ত্ত আছে—মোকদ্দমশার গুণের ধর্ম্ম জগৎপ্রসিদ্ধ। বাহির হইবার চেষ্টা করি,—যদি এ সকল জাহানারার কর্ম্ম হয়, বাহির হইতে পারিব, না হয় পুনরায় ধরিয়া আনিবে! যাহার জন্য শূল প্রোথিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছে, রাত্রির এই কয় মুহূর্ত্ত পরে যাহার আবক্ষ শূলদ্বারা ভিন্ন হইবে, তাহার আবার কিসের ভয়?

উদয়েশ্বর ত্বরিত গতিতে উঠিয়া পড়িল এবং কারাধ্যক্ষের পাশ গলাইয়া বাহির হইয়া গেল। তারপর দেউড়ীতে গিয়া দেখিল, একজন প্রহরী ঝিমাইতেছে, তাহার পার্শ্ব দিয়া ত্বরিত গতিতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

বাহিরে গিয়া দেখিল, ফুল্ল জ্যোৎস্নার ফুল্ল কিরণে সর্ব্বত্র উদ্ভাসিত। সে তখন রাজপথ বাহিয়া মোকদ্দমশার বাগান অভিমুখে চলিয়া গেল।

যথাসময়ে উদয়েশ্বর মোকদ্দমশার বাগানোপান্তচারিণী কৃষ্ণা-নদীর তীরের পথে গিয়া উপস্থিত হইল, এবং বাগানাভিমুখে যাইতে যাইতে দেখিল, শ্মশানের কাছে দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি,—সে চমকিয়া উঠিল। প্রেতিনী-মূর্ত্তি ভাবিয়া দ্রুতপদে চলিয়াই যাইতেছিল, কিন্তু মূর্ত্তিদ্বয় তাহার নিকটস্থ

হইল। চকিত চঞ্চল নয়নে উদয়েশ্বর সেদিকে চাহিল, তাহার প্রাণের তারে মধুর ঝঙ্কার উঠিল,—সে দেখিল, জাহানারা ও রসফিনা।

জাহানারা বলিল,—"তুমি আসিয়াছ ?"

অৰ্দ্ধভগ্নস্বরে উদয়েশ্বর বলিল,—"আসিয়াছি, কিন্তু আশাওত তোমার হাত। ছলনা পরিত্যাগ কর,—আমার উপায় বল ?"

জা। এ রাজ্যে থাকিলে তোমার জীবন থাকিবে না। এখনই পলায়ন কর।

উ। জাহানারাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাওয়াও যা, শূলে চড়িয়া দেহ ছাড়াও তা।

জা। প্রেম প্রাণের অধীন,—প্রাণ থাকিলে প্রেম।

উ। সে কথা শুনিতে চাহি না। প্রাণের চেয়ে প্রেম বড়।

জা। অত প্রেমের ব্যাখানে কাজ নাই,—পলায়ন করিয়া পৈত্রিক প্রাণ রক্ষা কর, তারপরে ও—চেষ্টা করিলেই হইবে।

উ। তুমি যদি সে আশা দাও, তবে প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করি।

জা। আশাত অনেক দিন হইতেই দিতেছি,—তবে আশা পূর্ণ হওয়া মানুষের ইচ্ছার অতীত। এক্ষণে কোথায় যাইবে ?

উ। কোথায় যাইব ? গৌড়েশ্বরের অধিকার নয় কোথায় ?

জা। এ সহর পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যেখানে ইচ্ছা।

উ। তুমি যদি বল, তাহাই যাইব। কিন্তু জাহানারা! আমায় ভুলিও না। সত্য কথা বলিতেছি,—আমি জন্মজন্মান্তর হইতে যাহা খুঁজিতেছি, আমার প্রাণ যাহা চায়, তুমি তাই। আমি যখন তোমাকে পাইয়াছি, তখন আর কিছুই চাহি না। তুমি যদি আমায় ভালবাসিয়া সুখ না পাও, সুখের সন্ধান করিও—যাহাতে সুখী হও, তাহাই করিও। আমি দীর্ঘ বর্ষ, দীর্ঘ মাস, দীর্ঘ

দিন ধরিয়া তোমার বিরহে বিলীন, এবং তোমাতেই বাস করিব। তুমি যদি আর কাহাকেও ভালবাস, আর যদি ফিরিয়া না চাও—তবে তুমি যাও, প্রাণের সঙ্গে প্রার্থনা করি, তাহাই প্রাপ্ত হইও, আমি দুঃখ পাই, পাইব।

জাহানারা বলিল,—"তবে যাও। ভোর না হইতে অনেক দূর গিয়া পড়।"

উদয়েশ্বর সতৃষ্ণ-নয়নে জাহানারার মুখের দিকে কয়েকবার চাহিয়া ছল ছল নেত্রে যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে ফিরিয়া গেল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রভাত-সূর্য্য গগনতলে তাঁহার প্রথম রশ্মি-কিরীট না খুলিতে খুলিতেই বধ্যভূমিতে শূলদণ্ড প্রোথিত হইল; সিপাহীগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সঙ্গীন খাড়া করিয়া দলে দলে তাহার চতুর্দ্দিক রক্ষার জন্য নিযুক্ত হইল,—কয়েকজন অশ্বারোহী সৈনিক সুসজ্জিত ও সশস্ত্র হইয়া মণ্ডলাকারে বধ্যভূমির চতুর্দ্দিকে অশ্বচালনা করত পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল, এবং স্বয়ং ফৌজদার সাহেব আসিয়া শূলদণ্ডের সম্মুখে এক কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিলেন। তৎপরে একদল সিপাহী বন্দী উদয়েশ্বরকে আনিবার জন্য কারাগারে গমন করিল। উদয়েশ্বরের শূলদণ্ড দেখিবার জন্য অনেক দর্শকও আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল।

কিন্তু যাহার জন্য এত উদ্যোগ আয়োজন হইতেছিল—যাহার ক্ষুদ্র প্রাণ সংহার করিবার জন্য এত ধুম-ধাম—সে পলায়ন করিয়াছে; যে সিপাহীরা তাহাকে আনিতে গিয়াছিল, তাহারা আসিয়া সে কথা ফৌজদার সাহেবের নিকটে নিবেদন করিল।

প্রহরিরক্ষিত ভীম প্রাচীর-বেষ্টিত সুদৃঢ় কারাগৃহ হইতে সামান্য একজন বন্দীর পলায়ন, ইহা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও আশ্চর্য্যের বিষয়-জ্ঞান করিয়া, হেতু নির্দ্দেশার্থ ফৌজদার সাহেব তাঁহার নাভি-বিলম্বিত অবিরল শ্মশ্রুরাজি বামহস্ত দ্বারা কয়েকবার ঊর্দ্ধে পরিচালন ও বিলোড়ন করিয়া দেখিয়াও যখন কোনরূপ মীমাংসার সূত্র আবিষ্কার করিতে পারিলেন না, তখন তিনি অগত্যা অতিশয় ক্ষুব্ধ মনে উঠিয়া

কাজিসাহেবের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং ঘটনার কথা বিবৃত করিয়া বসিলেন।

নৈশ-বিলাস-বিনিদ্র সুরারাগ-রঞ্জিত আবেশ-বিহ্বল আঁখি-পাতা একটু টানিয়া হেলায়মান দেহখানি তাকিয়ার উপর হইতে একটু উন্নত করিয়া, ওষ্ঠাধর-সম্পুট সংরক্ষিত আলবোলার হৈম নল রদ-নিপীড়িত করিয়া, অর্দ্ধভগ্ন-স্বরে কহিলেন,—"আশ্চর্য্য কথা বলিতেছেন, ফৌজদার সাহেব! কারাগৃহের অবস্থা আর পূর্ব্বের ন্যায় নাই। বাদশা যেরূপভাবে উহা নূতন করিয়া গড়াইয়াছেন, কাহারও সাধ্য নাই যে, পলায়ন করে।

ফৌজদারসাহেব বলিলেন,—"কথাটা আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু কাজটা সত্য সত্যই ঘটিয়াছে।"

কা। এমন সত্য ঘটিতে দেওয়া হইবে না। না হয়, চাবুক লাগান।

ফৌজদারসাহেব বুঝিলেন, কাজিসাহেব এখনও সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিস্থ হইতে পারেন নাই। বলিলেন,—"যে পলাইয়াছে—তাহাকে না পাইলে, চাবুক লাগাই কাকে?"

কাজিসাহেব দংশিত নলটি ফেলিয়া দিয়া বলিলেন,—"সে সকল বিচার আমি তক্তে বসিয়া করিব। এখন শূলে দেওয়া হইয়াছে কি না, তাহাই শুনিতে চাহি।"

ফৌ। যাহাকে শূলে দেওয়া হইবে, সে পলায়ন করিয়াছে,—সুতরাং শূল শুধুই পোঁতা রহিল।

কাজিসাহেব দন্তে ওষ্ঠ কর্ত্তন করিয়া বলিলেন,—"ছ্যা, ছ্যা, হুকুম তামিল কর নাই। সেই-ই না হয় পলাইয়াছে,—এত বড় সহরটায় কি আর লোক নাই? শূলটা কি বৃথায় যাইবে? হুকুমটা কি বাতাসে মিশিবে?"

ফৌজদার বুঝিলেন, ইহার সহিত কথা বলা এখন বৃথা। তিনি সেখান হইতে উঠিয়া একেবারে বাদশা-দরবারে গিয়া হাজির হইলেন।

বাদশা সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া চমকিয়া উঠিলেন। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন দেশে প্রজাশক্তি অব্যাহত। যদিও রাজা ও রাজকর্ম্মচারিগণের যথেচ্ছাচারিতা অত্যন্ত প্রবল ছিল, কিন্তু প্রজাগণও জোট পাকাইয়া দল বাঁধিয়া প্রায়ই বিদ্রোহী হইয়া রাজশক্তিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিত। তৎপরে রাজ্য লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতাও যথেষ্ট ছিল,—কাজেই সে সময়ে রাজন্যবৃন্দের চিত্তে শান্তি অতি অল্প সময়ই বিরাজ করিতে পাইত। সর্ব্বদাই সতর্ক হইয়া রাজ্য শাসন করিতে হইত। তখন কোন রাজাই একাদিক্রমে অধিক দিন রাজ্য করিতে সক্ষম হইতেন না। অনেক অনেক রক্তপাত ও অনেক কষ্টে সিংহাসন লাভ করিয়া, হয়ত আবার ছয় মাসের মধ্যে পথের ভিখারী হইয়া বসিতেন,—নয়ত বা বিপক্ষের অসিতে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া সিংহাসন-লোলুপ হৃদয়ের শান্তি বিধান করিতেন। কাজেই খুব সতর্ক হইয়া রাজন্যবৃন্দকে থাকিতে হইত;—প্রতি কার্য্যেরই পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করিতে হইত,—সমস্ত বিষয়ই ভাবিয়া দেখিতে হইত। যাহাতে একটু অসম্ভব থাকিত, তাহাই অবিশ্বাসের কালিমাছায়া লইয়া তাঁহাদের হৃদয় আবৃত করিয়া ফেলিত।

বাদশাহের মনে হইল, প্রহরিবেষ্টিত সুদৃঢ় কারাগার হইতে যে উদয়েশ্বর পলায়ন করিতে পারিয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই ষড়যন্ত্রের ফল। উকীল সরকার জগন্নাথ চৌধুরীর জামাতার শূলদণ্ড হইবে—হয়ত ইহাতে অনেক ওমরাহ চটিয়া গিয়া থাকিবে,—হয়ত তাহারা অনেক ক্ষমতাপন্ন প্রজাকেও উত্তেজিত করিয়া দলে লইয়া থাকিবে—তারপর

সকলে পরামর্শ করিয়া কারাধ্যক্ষকে ভয় দেখাইয়া, না হয় উৎ-কোচ প্রদানের দ্বারা বশীভূত করিয়া, উদয়েশ্বরকে মুক্ত করিয়া লইয়াছে।

এই ভাবনা—চিন্তা তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে গাঢ়তররূপে অঙ্কিত হইল। তিনি ফৌজদারসাহেবকে বলিলেন,—"অপরাধী যখন পলায়ন করিয়াছে, তখন বর্ত্তমানে করিবার আর কি আছে! কিন্তু কারাধ্যক্ষের যে, ইহাতে কারসাজী আছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাহাকে এই দণ্ডেই পদচ্যুত করিয়া কারাগারে বন্দী করা হউক। আর যদি অপরাধের বিষয় সে স্বীকার করে, তবে সেজন্যও চেষ্টা করা হউক,—এ বিষয়ে সেই প্রধানতঃ দোষী। তারপরে, যে যে প্রহরী গত রাত্রে কারাগারের ফটকে পাহারা দিয়াছে,—তাহা-দিগকেও যেন পদচ্যুত করিয়া বন্দী করা হয়, এবং কেহ কোন বিষয় যদি বলে, শুনিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তারপরে গোয়েন্দা নিযুক্ত করিয়া জানিতে হইবে, কোন্ কোন্ ব্যক্তি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া এই ভীষণতর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে।"

ফৌজদারসাহেব যথাবিধি সেলাম করিয়া চলিয়া গেলেন, এবং প্রথমতঃ বধ্যভূমিতে গমন করিয়া, বধোদ্যোগের নিবৃত্তি করিয়া দিলেন। শূলদণ্ড তখন প্রোথিতই থাকিল, কিন্তু সিপাহীগণ, সৈন্যগণ, জল্লাদগণ সকলেই আপন আপন স্থানে চলিয়া গেল। দর্শকগণও শূলদণ্ডে নর হত্যা দেখিতে না পাইয়া ক্ষুণ্ণ মনে আপন আপন গৃহে চলিয়া গেল। আর পথে যাইতে যাইতে উদয়েশ্বরের পলায়নের অনেকগুলি উপা-খ্যান রচাইয়া গেল। কেহ কেহ সেই সব রচিত উপাখ্যানে আবার অলঙ্কার বসাইয়া আরও বাহবা লইল। অনেকে সেই সালঙ্কত উপাখ্যানমালা আত্মীয়-স্বজনের নিকটে বলিয়া বাহবা লইল। তবে

উপাখ্যান যে, সকলেরই এক উপাদান লইয়া বিরচিত, তাহা নহে; কেহ রচাইল,—ঘোর ষড়যন্ত্র করিয়া দেশের ওমরাহগণ উদয়েশ্বরকে কারাগার হইতে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে,—তাহাদের ইচ্ছা, বাদশার তক্তা উদয়েশ্বরকে দিবে। কেহ রচাইল, উদয়েশ্বর মা কালীর চেলা—কালীর দূত আসিয়া তাকে শূন্যে শূন্যে তুলিয়া লইয়া গিয়াছে। কেহ রচাইল, কারাধ্যক্ষের কন্যার সঙ্গে নেকাপুষিতে স্বীকৃত হওয়ায় কারাধ্যক্ষ তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। মুসলমানেরা বলিল, সে পবিত্র এস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে বেহেস্তো হইতে জীন আসিযা তাহাকে বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে। তবে উপাখ্যানের মূল বিষয় এক,—যেরূপেই হউক, উদয়েশ্বর যে পলায়ন করিয়াছে—ইহা নিশ্চয়; ইহা সকল রচয়িতারই রচিত উপাখ্যানের মূল উপদান।

বাদশাহের আদেশ পাইয়া ফৌজদারসাহেব রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বধ্যভূমির কার্য্য বন্ধ করিতে আদেশ দিয়া কারাগারে প্রবেশ করিলেন।

আসামী পলায়ন করায়, কারাধ্যক্ষ কম্পিত কলেবরে সময়াতিবাহিত করিতেছিলেন। ফৌজদারসাহেব তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—"শেখজি, উদয়েশ্বরকে ছাড়িয়া দিয়া কত টাকা পাইয়াছ?

কারাধ্যক্ষ তাড়াতাড়ি একখানি কাষ্ঠাসন টানিয়া দিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক বলিলেন,—"হুজুর, খোদার কসম, আমি কিছুই জানি না। তবে যাহা জানি, তাঁহা বলিলে বিশ্বাস করিবেন না,—অধিকন্তু আমাকেহ পাগল বলিবেন।"

ফৌজদার সাহেব বলিলেন,—"বিশ্বাস করা না করা, সে শ্রোতার ইচ্ছাধীন। সত্য ঘটনা প্রকাশ করিলে, মানুষ বিশ্বাস না করিয়া পারে না। আর মিথ্যা কথা বলিলে, তাহাও বুঝিতে পারা যায়।"

কারাধ্যক্ষ বলিল,—"রাত্রি তখন অনেকখানি হইয়াছিল, আমি শয়ন করিতে যাইবার পূর্ব্বে যেমন প্রত্যহ বন্দিগণের তত্ত্ব-তল্লাস লইয়া থাকি, গতকল্যও তাহাই গিয়াছিলাম। যখন বন্দী উদয়েশ্বরের কক্ষে গেলাম, তখন দেখি, সে জানুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল। ঘরে একটা আলোও জ্বলিতেছিল, আমি ঘরের মধ্যে গেলে, আলোটা হঠাৎ এত অধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল যে, তেমন আলো হওয়া সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। আবার তখনই দপ্ করিয়া নিবিয়া গেল। সমস্ত ঘরে তখন এত অন্ধকার হইল যে, সেরূপ অন্ধকার তার আগে আমি কখনই দেখি নাই। তার পর সেই আলোর মধ্যে অগণ্য মানুষ ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল,—একটা মানুষ, তাহার সুদীর্ঘ হাত বাড়াইয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিতে আসিল—আমি ভয়ে অভিভূত হইয়া সে দিকে আর চাহিতে না পারিয়া পশ্চাৎ ফিরিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে সব নিরস্ত হইল—পূর্ব্বে যেমন গৃহমধ্যে আলো-জ্বলিতেছিল, তেমনই জ্বলিতে লাগিল। কিন্তু উদয়েশ্বর নাই। আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম।"

ফৌজদারসাহেব বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া রুক্ষস্বরে বলিলেন,—"তুমি কি আরব্য উপন্যাস বলিতেছ? না, কাল রাত্রে মাত্রাটা একটু অধিক চড়াইয়াছিলে?"

কা। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে কথা আপনি বিশ্বাস করিবেন না।

ফৌ। এ কথা কোন ভদ্রলোকই বিশ্বাস করিবে না,—তবে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদের কাছে বলিলে, বাহবা লইতে পারিবে বটে। তারপর তুমি আর কোন অনুসন্ধান করিয়াছিলে?

কা। আমি তখনই বাহিরে ফটকের নিকটে গিয়া পাহারাওয়ালা-

দিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—কিন্তু সকলেই বলিল,—জনপ্রাণীও ফটক পার হয় নাই।

ফৌ। তারাত আর পাগল হয় নাই যে. আরব্য উপন্যাসের খোয়াব দেখিবে।

কা। আমার কথা কেহ বিশ্বাস করিবে না. কিন্তু ইহা নিশ্চিত সত্য। আমি মিথ্যা কথা বলি নাই,—ইহা নিশ্চয় জানিবেন।

ফৌজদারসাহেবের সঙ্গে চরিজন ফৌজ আসিয়াছিল,—আদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাহারা কারাধ্যক্ষকে বন্দী করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিল। বন্দসাহের আদেশে ঘটনার রাত্রে যাহার ফটকের প্রহরী ছিল, তাহাদিগকে বন্দী করিয়া ফৌজদার সাহেব কারাগার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু কারাধ্যক্ষ যাহা বলিল. তদতিরিক্ত আর কোনও কথা কাহারও নিকটে শ্রুত হইতে পারিলেন না।

এদিকে মালতী, উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে প্রভাত হইবার অনেক পূর্ব্বেই শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া স্বামীর সংবাদ লইবার জন্য লোক প্রেরণ করিয়াছিল। বিনিদ্র রজনী চিন্তায় অতিবাহিত করিয়া যখন সে প্রভাতে বাহির হইয়াছিল, তখন তাহাকে দেখিলে সকলেরই প্রতীতি হইত যে, চিন্তায় তাহার শরীরের সমস্ত রক্ত হিম হইয়া গিয়াছিল। চক্ষুর জল শুকাইয়া গিয়াছিল,—অধরে ধূলা উড়িতেছিল।

যে লোক সংবাদ আনিতে গিয়াছিল, সে অন্যান্য দর্শকগণের সহিত ফিরিয়া আসিয়া মালতীকে বলিল,—"উদয়েশ্বরের ফাঁসি হইল না। তাঁহাকে কাল রাত্রে জেল হইতে জীনে লইয়া গিয়াছে।"

মালতী হৃদয়ের রুদ্ধশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—"রাজকর্ম্মচারীরা এখন কি করিতেছেন ?"

যে সংবাদ আনিতে গিয়াছিল, সে বলিল,—"তাঁহারা ফিরিয়া গেলেন, আর কি করিবেন?"

তাহাকে বিদায় দিয়া মালতী ভাবিল, ইহাও কি সম্ভব যে, তাঁহাকে জীনে লইয়া গিয়াছে? সম্পূর্ণ অসম্ভব,—হয়ত কোন সুযোগে তিনি জেল হইতে পলায়ন করিয়া থাকিবেন। কিন্তু শুনিয়াছি, বাদশাহের ভীমদুর্গ হইতে একটি পিপীলিকাও বাহির হইবার উপায় নাই,—তবে তিনি কি করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিতে সক্ষম হইবেন!

সে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কর্ম্মচারী শীতলরায়কে ডাকাইল। শীতলরায়ও শুনিয়াছিল যে, উদয়েশ্বর পলায়ন করায় তাহার দণ্ড স্থগিত থাকিল। শীতলরায় যে আশা করিতেছিল, তাহার মনে হইল, সে আশা বুঝি শূন্যে লয় প্রাপ্ত হয়, সে বড় আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিল, মালতীর পিতার মৃত্যু হইল; স্বামীরও শূলদণ্ডে মৃত্যু হইবে। তাহার পরে, জগন্নাথ চৌধুরীর অসীম অর্থ, আর মালতীর অপ্সরা-রূপ শীতলরায় নির্ব্বিবাদে উপভোগ করিতে পারিবে। কিন্তু উদয়েশ্বর যদি পলায়ন করিয়া থাকে,—সে যদি জীবিত থাকে তবে শীতলরায়ের আশার বাসায় আগুন লাগিবে। হয়ত বা কোন দিন নিশীথ রাত্রে আসিয়া মালতী ও জগন্নাথ চৌধুরীর সঞ্চিতার্থ গুলি লইয়া কোন দেশে চলিয়া যাইবে। শীতলরায় ইহার প্রতিকার-কল্পে অনেক চিন্তা করিতেছিল।

মালতী যখন শীতলরায়কে ডাকাইয়া পাঠাইল, তখন সে তাহার চিন্তালোড়িত মস্তিষ্কে একটা যুক্তি লইল, এবং মালতীর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল।

মালতী শুষ্ককণ্ঠে বলিল,—"সংবাদ শুনিয়াছ কি?

মৌখিক আত্মীয়তার ভাব প্রকাশ করিয়া শীতলরায় বলিল,—

"সংবাদ শুনি নাই? অতি প্রত্যুষেই বাড়ী হইতে আমার নিজের চাকরটাকে সংবাদ আনিতে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম।"

মা। সে আসিয়া কি সংবাদ দিল?

শী। উদয়েশ্বর অনেক যোগাড়-যন্ত্র করিয়া গত রাত্রে কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছেন।

মা। কিন্তু বাদশাহের মুল্লুক নয় কোথায়,—কোথায় গিয়া তিনি প্রাণ রাখিতে পারিবেন?

শী। খুব দূর দেশে গেলেই চলিবে,—গৌড়ের বাদশার রাজত্বের বাহিরে ভারতের অনেক যায়গা পড়িয়া আছে।

মা। অনেকে বলিতেছে, কারাগার হইতে তাঁহাকে নাকি জীনে লইয়া গিয়াছে।

শী। সে কথা কি তুমি বিশ্বাস কর,—উহা একটা কথাই নহে। ও সকল অশিক্ষিত লোকের রচা কথা।

মা। আমিও তাই ভাবিতেছিলাম

শী। তবে একটা কথা আছে।

মা। কি কথা?

শী। কথা এই যে, উদয়েশ্বরকে ধরিবার জন্যে বাদশাহ আদেশ দিয়াছেন। ফৌজদারসাহেব চারিদিকে অশ্বারোহী সৈনিক পাঠাইতেছে। তিনি সম্ভবতঃ হাঁটিয়াই গিয়াছেন,—কতদূর আর যাইতে পারিবেন;—হয়ত পথেই তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিবে।

মালতী শিহরিয়া উঠিল। বলিল,—"এবার ধরিতে পারিলে তাঁহার আর রক্ষা নাই। তাহা রোধ করিবার কোন উপায় নাই কি?"

শী। উপায় আছে,—কিন্তু সহজ নহে।

মা। এ সকল কাজের উপায় যে সহজ নহে, তা আমি বুঝি। কিন্তু আমার প্রাণ দিলেও যদি সে উপায় করা যায়, আমি তাহাতে প্রস্তুত আছি।

শী। ফৌজদারসাহেব বড় ঘুসখোর।

মা। তাঁহাকে ঘুস্ দিলে কি হইবে?

শী। সৈন্য পাঠানর ভার তাঁহারই উপর। তিনি ঘুস্ পাইলে সৈন্য না পাঠাইয়া বাদশাহসমীপে বলিবেন, সৈন্য পাঠাইয়াছি, এবং কিছু দিন পরে বলিবেন, সৈন্যগণ ফিরিয়া আসিয়াছে,—কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান মিলিল না।

মা॥ তাহা হইলে বোধহয় তিনি নির্ব্বিঘ্নে নিরাপদ স্থানে পঁহুছিতে পারিবেন?

শী। নিশ্চয়ই পারিবেন।

মা। তবেই তুমি সেই চেষ্টা কর।

শী। আমি ত বলিয়াছি, ব্যাপার সহজ নহে

মা। কঠিন কিসে?

শী। ফৌজদারসাহেবকে এই কাজে প্রবৃত্ত করাইতে অল্প অর্থের কাজ নয়।

মা। আমার বাবা অনেক টাকা রাখিয়া গিয়াছেন,—তাহার সমস্ত যদি এই কাজে ব্যয়িত হয়, আপত্তি নাই।

শী। তবে আমি যাইতেছি, কিন্তু কত টাকা পর্য্যন্ত স্বীকার করিব?

মা তোমার স্বীকার অস্বীকারেতে কাজ হইবে না,—ফৌজদারসাহেব যাহাতে স্বীকৃত হন, তাহাই করিতে হইবে। ফল কথা, আমার সর্ব্বস্ব লইয়াও যদি ফৌজদারসাহেব তাঁহাকে ধরিবার জন্য

াক না পাঠাইয়া নিরাপদে পঁহুছিতে দেন, আমি তাহাতেও াধ্য আছি।

শী। তবে কি আমি এখনই যাইব?

মা। হাঁ এখনই যাও,—কেন না, সৈন্যগণ বাহির হইয়া পড়িলে, াার তখন কোন উপায়ই হইবে না।

শীতলরায় চলিয়া গেল। পথে যাইতে যাইতে ভাবিল, মালতী, ুমি স্বল্পবুদ্ধি স্ত্রীজাতি—তোমাকে ফাঁকি দিয়া তোমার সর্ব্বনাশ করিতে আমার কতক্ষণ লাগিবে? আমি যে সূত্র ধরিয়াছি, এই ূত্র লইয়াই তোমার সমস্ত অর্থ গ্রাস করিব—তোমাকে পথের ভিখারিণী করিব—অন্নের কাঙ্গালিনী করিয়া ছাড়িয়া দিব। তারপরে াামার বাড়ীতে লইয়া অন্ন বস্ত্র দিয়া তৎপরিবর্ত্তে তোমার রূপ উপভোগ করিব। আর উদয়েশ্বরের যদি সন্ধান পাই, তবে তাহাকে শূলের াগায় উঠাইয়া দিয়া তবে ছাড়িব।

এদিকে মালতী ভাবিল, ভগবান্, ফৌজদারসাহেবকে সুমতি াাও। সে যেন আমার যথাসর্ব্বস্বের বিনিময়েও উদয়েশ্বরের অনু-ন্ধানে সৈন্য না পাঠায়। তিনি যেন নিরাপদে তাঁহার গন্তব্য স্থানে পঁহুছিতে পারেন।

তাহার পর ভাবিল,—তিনি চলিয়া গেলেন, হয়ত জন্মের মতই এ নগর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। বাদশাহের ভয়ে আর এ দেশে হয়ত তাঁহার আসা হইবে না—তবে কি আর সে চরণ কখনও দেখিতে পাইব না? সেই যে, সে দিন বিষণ্ণ মুখে, ছল ছল নেত্রে বিদায় হইয়াছেন,—আরত আসিলেন না। আর কি সে মুখ দেখিতে পাইব না? জীবনের সুখ—মরণের সুখ—জন্ম-জন্মান্তরের সুখ কি আমার চিরদিনের মত অন্তর্হিত হইল? আবার ভাবিল,

তিনি জীবিত থাকুন,—সুখে থাকুন, নাইতে যেন তাঁহার মাথার কেশও না ছিঁড়ে,—তাঁহার সুখেই আমার সুখ। তিনি সুখে থাকুন,—আমি তাঁহাকে ধ্যান করিয়াই সুখী হইব।

দাসী আসিয়া স্নানার্থে ডাক দিল,—মালতী বলিল,—"শীতল-রায়কে একটা কাজে পাঠাইয়াছে, সে ফিরিয়া না আসিলে, আমি স্নানাহার করিব না।

দাসী ফিরিয়া গেল। মালতী সেই হর্ম্ম্যতলে শুইয়া পড়িল। তাহার দুই চক্ষু দিয়া, জলধারা নির্গত হইতে লাগিল,—সে উদয়েশ্বরের চোক মুখ কথা ও ভাব-ভঙ্গি ভাবিয়া ভাবিয়া আকুল হইতে লাগিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

শীতলরায় ফৌজদারসাহেবের বাড়ীর সীমান্তেও পদার্পণ করিলেন না। তিনি প্রফুল্ল চিত্তে নিজালয় গমন করিলেন,—এবং স্নানাহার করিয়া মানসপটে ভবিষ্যৎ সুখের অনেক সুচিত্র চিত্রিত করিয়া আনন্দে কাটিতে লাগিলেন। তৎপরে যখন মধ্যাহ্ন—আকাশে দিনদেব আরূঢ় হইয়া করবর্ষণে ধরা-বক্ষ উত্তপ্ত করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন শীতলরায় বাটী হইতে বহির্গত হইয়া, ধীরে ধীরে মালতীর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল।

মালতী তখনও স্নান করে নাই,—তখনও গৃহের মেঝে পরিত্যাগ করিয়া বাহির হয় নাই,—তখনও তাহার নয়নাসার গণ্ডস্থলে শোভা পাইতেছিল, তখনও তাহার হৃদয়-মধ্যে শঙ্কোদ্বেগ কাঁপিয়া কাঁপিয়া চলিতেছিল। শীতলরায় পঁহুছিবা মাত্র, দাসী মালতীর নিকটে সে সংবাদ জানাইয়া দিল।

মালতী ছুটিয়া বাহির হইয়া শীতলরায়ের নিকট আসিল। সে মূর্ত্তি —সে মলিন-বিষণ্ণ অপরূপ রূপ দেখিয়া শীতলরায় আরও মরিল। তাহার প্রাণের বাসনার আগুন ভীমতেজে জ্বলিয়া উঠিল। শীতলরায় মালতীকে বহু দিন ধরিয়া দেখিয়া আসিয়াছি,—কিন্তু এমন অপরূপ ভাব সে বুঝি কখনও দেখে নাই।

মালতীর পরিহিত বাস সুকুমার বপুতে অসংশ্লিষ্ট এবং শ্লথ। কেশ-পাশ আলু-থালু—সমীরান্দোলিত। চক্ষুপাতা স্থির—আকুঞ্চিত। উদাস নয়ন কাহারও কুশল সংবাদ প্রার্থী। পক্ক বিম্বাধর শঙ্কাভিনম্র ও মৃদু কম্পিত। শীতলরায় প্রাণ ভরিয়া মুদিত বিষণ্ণ সান্ধ্য-কমলবৎ

মালতীর রূপ দেখিতে লাগিল,—আর মনে মনে ভাবিতে লাগিল, শীতলরায়ের জীবন এত দিনে সার্থক! শীতলরায়ের ভাগ্য-দেবতা মালতীর এই অপরূপ রূপ, আর তাহার বিপুল অর্থরাশি প্রদানের জন্য উন্মুখ! সুন্দরী রমণী, আর বিপুল ধনরাশি, একত্রে লাভ কাহার ভাগ্যে ঘটে? যাহার ভাগ্যে ঘটে,—জগতে সে নিশ্চয়ই ভাগ্যবান্, সন্দেহ নাই। কিন্তু আর কত বিলম্ব! এমন সুশীতল জলরাশি সম্মুখে —পিপাসী, তাহার শুষ্ক কণ্ঠ লইয়া কতক্ষণ তীরে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে?

মালতী আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি যে কাজে গিয়াছিলে, তাহার কি হইল?"

মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে সতৃষ্ণ নয়নে মালতীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া শীতলরায় বলিল, "কাজ হয়, কিন্তু টাকা অসম্ভব।"

মা। সম্ভব অসম্ভব আমি জানি। সংখ্যা কত বল?

শী। কুড়ি হাজার।

মা। কুড়ি হাজার!

শী। হাঁ, কুড়ি হাজার। তার এক পয়সা কমে হয় না।

মা। অপেক্ষা কর, দেখিয়া আসি।

শীতলরায় দাঁড়াইয়া থাকিল, মালতী উপরের কক্ষে উঠিয়া গেল। তাহার পিতৃ-পরিত্যক্ত ধনরাশির মোটামুটি সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া নিম্নতলে ফিরিয়া আসিল।

শীতলরায় জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হইল?"

মা। যাহা আছে, সর্ব্বশুদ্ধ কুড়ি হাজার হইতে পারে।

শী। তারপর?

মা। তারপর আর কি?

শী। তোমার চলিবে কি প্রকারে ?

মা। আমার চলাচলি কি,—দিনান্তে একমুঠা চাউল, তাহা যে কোন প্রকারেই হইয়া যাইবে।

শী। একা কি তোমার ? তোমার দাসদাসী—অতিথি-অভ্যাগত ইহাদের উপায় ?

মা। আমার দাসদাসীতে প্রয়োজন কি ? যাহার স্বামী ব্যাধ-তাড়িত হরিণের ন্যায় বন হইতে বনান্তরালে পলায়ন করিয়া ফিরিতেছে, সে দাসদাসী লইয়া হর্ম্ম্যতলে সুখের বাসরে নিদ্রা যাইবে ? আমার দাসদাসীতে প্রয়োজন কি ? ভিখারিণী, অতিথি-অভ্যাগতের সেবা কি করিয়া করিবে ? যাক্, সে কথা। ফৌজদারের সঙ্গে তোমার কি কথা হইল, বল ?

শী। তাঁহাকে বলিলাম, উদয়েশ্বরকে ধরিতে লোক না যায়, তাহার জন্যে আপনি কি চান ? প্রথমতঃ ফৌজদারসাহেব আমার কথায় চটিয়া উঠেন,—তারপরে অনেক কান্না-কাটি করায়, একটু নরম হইয়া পঞ্চাশ হাজার টাকা চান। নিতান্ত অসঙ্গত বুঝিয়া আমি অনেক কাকুতি মিনতি করি,—তাহাতে শেষ কুড়ি হাজার স্থির হইয়াছে। উহার এক পয়সা কম হইলেও হইবে না। কিন্তু আমার বিবেচনায় সর্ব্বস্ব দিয়া, তুমি কি পথে দাঁড়াইবে ?

মালতীর আবেশে-তরল নেত্র জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল,—"তবে কি আমার স্বামীকে, ধরিয়া আনিয়া শূলে চড়াইবে, আর আমি টাকার রাশি বুকি করিয়া দাস-দাসী পরিবৃত হইয়া সুখ-শয্যায় শায়িত থাকিব ? এখনই লোক ডাক,—এখনই টাকা লইয়া ফৌজদার সাহেবের নিকট চলিয়া যাও। যাহাতে আমার স্বামীর পশ্চাতে অনুসন্ধাকারী ধাবিত না হয়, তাহার উপায় কর।"

মৃদুস্বরে শীতলরায় বলিল,—"আপনার পিতার অনেক নেমক খাইয়াছি। আপনি যে অর্থাভাবে কষ্ট পাইবেন,—ইহা ভাবিতেও আমার দুঃখ হইতেছে।"

মা। কিসের কষ্ট? কেন কষ্ট? লোকের নিকটে এখনও কর্জ্জ দেওয়া টাকা যাহা পাওনা আছে,—তাহা আদায় হইলে, সাত আট হাজার হইতে পারিবে। এক হতভাগিনী বাঙ্গালীর মেয়ের এত টাকায় সারা জীবন সুখে স্বচ্ছন্দেই চলিতে পারিবে। এত দাস-দাসীতে আমার প্রয়োজন নাই। একটি দাসী থাকিলেই যথেষ্ট হইবে। আর কাজ না থাকিলে কর্ম্মচারীর প্রয়োজন কি?

শী। লোকে যাহা ধারে, তাহা কি সমস্ত আদায় হইবে?

মা। পাওনা টাকার সিকিও আদায় হইতে পারিবে,—আমার তদ্দারাই চলিয়া যাইবে। আর বৃথা তর্ক করিয়া সময় নষ্ট করিও না। ফৌজদারসাহেব তোমাকে কতক্ষণ সময় দিয়াছেন?

শী। সময়? কিছু সময় দেন নাই,—তিনি বলিয়াছেন, মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপ্ত করিয়াই অনুসন্ধানকারী কর্ম্মচারিগণ বাহির হইবে। এই সময়ের মধ্যে যদি টাকা লইয়া আসিতে পার, তবেই তাহাদের গমন বন্ধ থাকিবে, নতুবা চলিয়া গেলে, তখন আর কি করিতে পারিব?

মা। তবে তুমি কেন সময় নষ্ট করিতেছ? তুমি কি হিন্দু নও? তুমি কি জান না, হিন্দু নারীর পতিই সর্ব্বস্ব,, পতিই গুরু, পতিই ইষ্ট দেবতা। পতির জন্য হিন্দুর মেয়ের দেহ জীবন ধর্ম্ম কর্ম্ম সব। পতি বিপন্ন,—আর আমি ভবিষ্য সুখের জন্য টাকা রাখিয়া দিব? তুমি লোক ডাক,—টাকা লইয়া এখনই যাও।

"তবে তাই" এই কথা বলিয়া শীতলরায়, বহির্ব্বাটীতে গমন

করিল, এবং কয়েকজন কুলী ডাকিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। মালতী ততক্ষণ সিন্ধুক হইতে কুড়ি হাজার টাকার স্বর্ণ-রৌপ্য-বিনির্ম্মিত মুদ্রা বাহির করিয়া দিল। শীতলরায় তথায় উপস্থিত হইলে, মালতী টাকার সংখ্যা ঠিক করিয়া লইতে বলিল। শীতল রায় বলিল,—"এত টাকার সংখ্যা এত অল্প সময়ের মধ্যে গণিয়া স্থির করা কঠিন। ওজনের দ্বারা মোটামুটি স্থির করিয়া লওয়া হোক্। তার পরে কিছু বৃদ্ধি হয়, লইয়া আসিবে।"

মালতী তাহাতে সম্মত হইল। টাকাগুলি ওজন করা হইল। বিংশতি হাজারের ওজনে সিন্ধুকে সঞ্চিত সমস্ত অর্থই নিঃশেষিত হইয়া গেল। মালতী তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিল না। তাহার স্বামী নিরাপদ হইবেন, এই আশাতেই তাহার হৃদয় সুখী হইয়াছিল।

শীতলরায় কুলীর কাঁধে টাকার তোড়া চাপাইয়া দিল। মালতী বলিল,—"তুমি ফিরিয়া না আসিলে, আমি স্নান করিব না।"

শীতলরায় বলিল,—"সে কি! আমার ফিরিয়া আসিতে বেলা অবসান হইবে। তুমি স্নানাহার করিয়া একটু ঠাণ্ডা হও।"

ব্রীড়াবনত মুখে মালতী বলিল,—স্নানাহারে ঠাণ্ডা হইব! যাহার স্বামীকে শূলে দিবার জন্য অনুসন্ধানকারী রাজকর্ম্মচারী পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছে,—সে স্নানাহার করিয়া ঠাণ্ডা হইবে! তুমি যাও—ফৌজদারসাহেব টাকা লইয়া অভয় দিলে—তাহা শুনিয়া তবে আমি স্নানাহার করিব।"

শীতলরায় আর কোন কথা বলিল না। মুদ্রাপূর্ণ থলিয়াস্কন্ধ কুলীদিগকে সঙ্গে লইয়া মালতীর বাটীর বাহির হইল—এবং স্বচ্ছন্দ ও নির্ভয়চিত্তে টাকাগুলি লইয়া, নিজ বাড়ীতে গমন করিল, এবং যথা-সম্ভব নিরাপদ স্থানে রক্ষা করিয়া কুলীদিগকে বিদায় করিয়া দিল।

তারপরে, সহর্ষচিত্তে নিজবাটীর সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র উদ্যানে গমন করিয়া শীতলরায় একটি বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া, তৎকাণ্ডে দেহভার সমর্পণ পূর্ব্বক আনন্দের তীব্র উচ্ছ্বাস উপভোগ করিতে করিতে আপন মনে বলিতে লাগিল,—"আর কোথায় যায়, মালতী এখন আমার কবলস্থ। তাহার সার যাহা, তাহা আমার সিন্ধুকজাত হইল,—এখন তাহার রূপ। সে রূপ, শীতলেরই উপভোগ্য। যে মতলব খাটাইয়াছি,—যে যুক্তি আঁটিয়াছি, মালতীর আর অব্যাহতির উপায় নাই। সে এখন আমারই। ছুঁড়ীটার কি স্বামি-ভক্তি—উদরেশ্বরকে প্রাণ ভরিয়াই ভালবাসে। তা বাসুক, যে চক্র-জাল বিস্তার করিয়াছি—মালতীর সাধ্য নাই যে, সে চক্রজাল বিচ্ছিন্ন করিতে পারে! ছুঁড়ীটার কি রূপ! যেন সাক্ষাৎ সরস্বতীপ্রতিমা। আর কথাগুলা যেন পরিপূর্ণ বাঁশীর আওয়াজ! যে দিন এই বাগানে বসিয়া, তাতে আমাতে পাশাপাশি হইয়া প্রেমালাপ করিতে পারিব,—সেই দিনই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।"

শীতলরায় উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর, ধীরে ধীরে মালতীর বাড়ী অভিমুখে চলিয়া গেল।

সংসার্য্য-কৌটিল্য-অনাভিজ্ঞা অপাপবিদ্ধা মালতী চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে সেই গৃহের মাঝে পড়িয়া শীতলরায়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল,—কখন শীতলরায় আসিয়া সংবাদ দিবে, তাহার স্বামীকে ধরিবার জন্য যে লোক যাইতেছিল,—ফৌজদারসাহেব টাকা লইয়া তাহাদিগের গমন বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এই সংবাদ পাইলে, সে কতকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারে,—তখন স্নান করিয়া পোড়া উদরে একমুঠা দিতেও পারে।

তাহার আশা পূর্ণ হইল। পয়োমুখ বিষকুম্ভের ন্যায় শীতলরায়

আসিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। মালতী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল, এবং ব্যগ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"ফৌজদারসাহেব টাকা লইয়াছেন ?"

শী। অত টাকার লোভ সম্বরণ করা কি সহজ! হাঁ, ফৌজদার সাহেব টাকা হইরাছেন।

মা। টাকা লইয়া কি বলিলেন ?

শী। আমারই সম্মুখে যে সকল লোক উদয়েশ্বরকে ধরিবার জন্য সাজিয়াছিল, তাহাদিগকে ডাকিয়া গমনে নিষেধ করিয়া দিলেন।

মা। তবে বোধ হয়, আর কোন ভয় নাই ?

শী। নিশ্চয়ই কোন ভয় নাই। যাহাদের ঘুস লওয়া অভ্যাস, তাহারা কাজে ফাঁকি দেয় না, এক জনকে ফাঁকি দিলে আর দশজনে তাহাকে বিশ্বাস করিয়া ঘুস দিবে কেন ?

মা। ভগবান তাঁহাকে রক্ষা করুন।

শী। আর কোন ভয় নাই,—তুমি স্নান করগে। তোমার মুখখানা শুকাইয়া গিয়াছে।

মালতী একবার উদাস-বিহ্বল, আবেশ-তরল নেত্রে শীতলরায়ের মুখের দিকে চাহিয়া, গৃহ হইতে বাহির হইয়া স্নানাহার জন্য গমন করিল।

সে মধুর প্রাণস্পর্শী দৃষ্টিতে কাম-কামনার হৃদয় আরও আকাঙ্ক্ষার আগুনে জ্বলিয়া গেল। কিন্তু শীতলরায় মানুষ হইলে বুঝিত, সে নয়নে কত দীনতা, কত উদাস-করুণ প্রার্থনা,—কত যন্ত্রণার মহাশ্মশানের অভিনয়। কিন্তু সে তাহা বুঝিল না, অথবা বুঝিতে পারিল না। এক যুবতী-দেহে, প্রণয়ী প্রেমের তরঙ্গ দেখে, জ্ঞানী বন্ধনের রজ্জু দেখেন, শৃগাল মুখপ্রিয় ভক্ষ্য বস্তু দর্শন করে।

শীতলরায়ের হৃদয়ের কামনার আগুন ক্রমেই দুর্ব্বিসহ ভাবে জ্বলিয়া উঠিল। এ আগুন একটু জ্বালাইয়া দিলে, তখন সে বড় শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে। তারপরে সে আগুন সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া আপন প্রতাপ বিস্তার করতঃ আর সমস্ত বৃত্তিকে খাক্‌ করে, দহন তখন অসহ্য হয়,—মানুষ পুড়িয়া পশু হয়।

শীতলরায়েরও সেই দশা হইল। সে মালতীর রূপ-চিন্তাতেই অনুক্ষণ নিমগ্ন থাকিত,—মালতীকে পাইবার জন্য তাহার হৃদয়-বৃত্তি একমুখী হইয়া দাঁড়াইল। সে সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া, মালতীকে চিন্তা করিতে লাগিল। এইরূপে প্রায় একমাস কাটিয়া গেল।

এই এক মাসের মধ্যে মালতীর সংসারের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। মালতী দাস-দাসীগণকে বিদায় দিয়া একটিমাত্র দাসীকে রাখিয়াছে। শীতলরায়কে এখনও জবাব দেয় নাই,—ইচ্ছা, কর্জ্জ দেওয়া টাকার আদায়ের একটা উপায় করিয়া লইয়া, তাহাকেও বিদায় দিবে। আগে রাঁধুনীতে রন্ধন করিত—মালতী তাহাকেও বিদায় দিয়া নিজে রাঁধিয়া খাইতেছে। মালতী কেশবিন্যাস করা পরিত্যাগ করিয়াছে। বর্ষিয়সী দাসী চুল বাঁধিয়া দিতে আসিলে বলিত,—"যাহার স্বামী পলায়ন করিয়া ফিরিতেছে, সে কি বিলাসের জন্য কেশপাশ বন্ধন করে? ভাল কাপড় পড়িতে বলিলে উত্তর করিত,—"স্বামী যাহার চীরবসন পরিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপাত্র হস্তে করিয়া, ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—সে সুন্দর বস্ত্রে দেহশোভা বাড়াইবে? চন্দ্র অস্তমিত হইলে যামিনী কখন হাসিতে পারে?—না, কুসুম-কুন্তলা বল্লরী, বৃক্ষের পতনে সুস্থ থাকে?

মালতীর অবস্থা ও মালতীর দৃঢ়তা দর্শনে শীতলরায় বুঝিতে পারিল মালতী সহজে ভুলিবার পাত্রী নহে—সহজে সে স্বামীকে ভুলিয়া অন্যে

উপগতা হইবার নহে। তাহাকে চক্রজালে পাতিত করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে হইবে।

একদিন সন্ধ্যার সময় মালতী প্রাঙ্গণস্থ তুলসী-মঞ্চের পার্শ্বে বসিয়া স্বামি-মূর্ত্তির ধ্যান করিতেছিল,—নিস্তব্ধ বাড়ীখানার উপর দিয়া সন্ধ্যার সমীর উদাসপ্রাণে হো হো করিয়া বুঝি তাহার বাঞ্ছিতের অনুসন্ধানে দিক্ হইতে দিগন্তরে ছুটিয়া চলিতেছিল; আকাশের গায়ে তারকাকুল উঠিয়া পড়িয়া হিমাংশুর অপেক্ষা করিতেছিল।

ধীর পদবিক্ষেপে এই সময় শীতলরায় তথায় উপস্থিত হইল। যৌবনে যোগিণীর ন্যায় মালতীর মধুর মূর্ত্তি দেখিয়া শীতলরায়ের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিল। আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলিল,—"এক সর্ব্বনাশের কথা শোন।"

বিবরপ্রবিষ্টা, অর্দ্ধসুপ্তা, জরাগ্রস্তা ভুজঙ্গিনীর শীর্ষদেশে যষ্টির ক্ষুদ্র আঘাত করিলে, সে যেমন বিষাদোত্তেজিত ভাবে ফুঁপাইয়া উঠে, মালতীও সেই ভাবে বিরক্তি ও তীব্র স্বরে বলিল,—"কি সর্ব্বনাশ? সময় নাই, অসময় নাই—কেন তুমি আমার নিকটে আগমন কর? কেন আমার ধ্যান ভাঙ্গিয়া দাও? আত্মীয়-স্বজনবিহীনা অভাগিনীর অধ্যাত্ম-কার্য্যই সম্বল,—কেন তাহাতে তুমি গোলযোগ কর। কি সর্ব্বনাশ? কাহার সর্ব্বনাশ?

শীতলরায় মনে মনে বলিল,—"আর কদিন? তোমার দর্প ঘুচাইব—দাসীর ন্যায় করিব,—তবে ছাড়িব। এত যে সহি, কেবল ঐ সান্ধ্য গোলাপের মত আধফুটন্ত রূপরাশির জন্য।" প্রকাশ্যে বলিল,—"আমি অনেক নুন-নেমক খাইয়াছি; চক্ষুর উপরে এ সর্ব্বনাশ দেখিব কি করিয়া?—কাজেই সময় অসময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারি নাই,—কাজেই ষড়যন্ত্র শুনিয়াই ছুটিয়া আসিয়াছি।"

মালতী বুঝিল, সর্ব্বনাশ তাহারই। কিন্তু সর্ব্বনাশ যে কি, সে তাহা বুঝিতে পারিল না। পদদলিত করিয়া ফণিনীর মস্তক হইতে মণি কাড়িয়া লইয়াছে,—আর তাহার কি সর্ব্বনাশ করিবে? প্রাণ? সে ত তার চেয়ে অনেক কম!

মালতী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি বোধ হয়, আমারই কোন অনিষ্টের সংবাদ পাইয়া থাকিবে? সে সংবাদ কি?"

শী। সে সংবাদ অত্যন্ত মন্দ। মুখে আনিতে আমার কষ্ট বোধ হইতেছে।

মা। যাহা অন্যে ষড়যন্ত্র করিতেছে, তোমার তাহা মুখে আনিতে কষ্ট হইবে কেন? বরং উপায় থাকিলে, সাবধান হওয়া যাইবে।

শী। হাঁ, তাত বটে! সেই জন্যই আমার এত ছুটাছুটি—এত আকুল-চেষ্টা।

মা। ব্যাপারটা কি, বল না?

শী। বাদশার ছেলে সংবাদ পাইয়াছে, তুমি অত্যন্ত রূপবতী। সে তোমাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে সৈন্য নিয়োগ করিয়াছে।

মালতীর মুখ শুকাইয়া গেল। বলিল,—"আমি আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবহীন। স্বামী পলায়িত—পিতা পরলোকগত। জগতে আমার কেহ নাই,—এক্ষণে আমি কি করিব, তুমি আমাকে উপদেশ দাও? এ অত্যাচারের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মৃত্যুই আশ্রয়,—কেমন?"

শী। আমি এখনও জীবিত আছি,—আমি তোমার পিতার অন্নে মানুষ হইয়াছি। আমার দেহে একবিন্দু রক্ত থাকিতে তোমার অনিষ্ট হইতে দিব না।

মা। কি করিবে বাদশাহের আজ্ঞার বিরুদ্ধে কথা কহে, এমন

কেহ নাই। কেন অভাগিনীর জন্য বাদশাহের ক্রোধবহ্নিতে আত্ম-বিসর্জ্জন করিবে?

শী। একটা পরামর্শ স্থির করিয়াছি।

মা। কি?

শী। তুমি আমার বাড়ীতে চল। প্রচার করিয়া দেই, জগন্নাথ চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা তাঁহার স্বামীর উদ্দেশে চলিয়া গিয়াছেন।

মা। আমার বাড়ীঘর দুয়ার?

শী। আমার নামে দানপত্র লিখিয়া দাও। লিখিয়া দাও,—আমি স্বামীর সঙ্গে এ দেশ হইতে চলিয়া গেলাম, আমার বাড়ীঘর-দুয়ার—আমার কর্জ্জ দেওয়া টাকাকড়ি, সমস্ত আমার পিতৃ-কর্ম্মচারী বিশ্বাস-ভাজন শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র রায় মহাশয়কে দান করিয়া গেলাম। আমিই ওসকলের তত্ত্বাবধান ও আদায়-পত্র করিব। তুমি আমার বাড়ীতে থাকিবে, তারপরে এ বাড়ীটা আমি বেচিয়া দিব, তুমি অন্য নামে নূতন একটা বাড়ী কিনিয়া তথায় বাস করিও।

মালতী নীরবে নিস্তব্ধে কি চিন্তা করিল। অত্যাচার-যুগে অসহায়া রমণী, হৃদয় বাঁধিতে পারিল না। একবার মরণের কথা মনে হইয়াছিল, কিন্তু আবার যদি স্বামীর সাক্ষাৎ হয়, এই আশাতে মরণে বিভীষিকা দর্শন করিল। সে শীতলরায়ের কথায় স্বীকৃতা হইল।

শীতলরায় মনে মনে হাসিয়া, সেই রাত্রেই লেখাপড়া সম্পন্ন করিয়া মালতীকে তাহার বাড়ীতে লইয়া গেল। কুরঙ্গী মিষ্ট বাঁশীর স্বরে মোহিত হইয়া ব্যাধের-জালে বিজড়িত হইল।
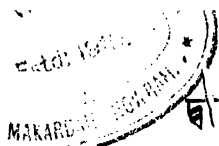
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

উদয়েশ্বর জাহানারার নিকটে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল পাছে রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ তাহাকে দেখিতে পায়, পাছে তাহাকে দেখিতে পাইয়া আবার ধৃত করিয়া লইয়া যায়, এই ভয়ে সেই সময় হইতেই উদয়েশ্বর অতি দ্রুতপদে চলিয়া যাইতেছিল। সে কোথায় যাইবে,—কোথায় তাহার আশ্রয়স্থান, তাহার স্থিরতা নাই।

ক্রমে রজনী প্রভাত হইয়া আসিল,—পক্ষীরা জাগিয়া পড়িল। উদয়েশ্বর লোকসাক্ষাতের ভয়ে জঙ্গলপথ আশ্রয় করিল। যতদূর তাহার শক্তিসামর্থ্য,—ততদূর দ্রুতগতিতে সে চলিয়া যাইতে লাগিল। কতদূর গিয়া মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল। ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত উদয়েশ্বর ক্ষুন্নিবারণের কোন উপায় দেখিল না। জঙ্গলের মধ্যে একটা বৃক্ষে কতকগুলি নোনা পাকিয়াছিল,—উদয়েশ্বর গাছে উঠিয়া তাহাই পাড়িয়া ভক্ষণ করিল,—তারপরে নদীতীরে বসিয়া কিঞ্চিৎ জলপান করিয়া আবার চলিতে লাগিল। এইরূপে উদয়েশ্বর প্রায় মাসৈককালে ধরিয়া ক্রমাগত চলিয়া চলিয়া, এক পাহাড়ের সানুদেশে উপস্থিত হইল।

পথশ্রান্ত, ত্রাসক্লান্ত উদয়েশ্বর কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার সন্ধান করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। যে স্থানে উদয়েশ্বর তখন উপস্থিত হইয়াছিল,—সে নিবিড় জঙ্গল-বেষ্টিত পর্ব্বতের সানুদেশ। কোথাও লোকালয় নাই—কেবলই ঘনবিন্যস্ত অবিরল বৃক্ষ-বল্লরীর শ্রেণী। ফলফুলে ভূষিত নব নব বৃক্ষ-বল্লরী, আর বৃক্ষ-বল্লরীর পত্রকুঞ্জাভ্যন্তরে নানাবিধ পক্ষীর

মধুর স্বর-লহরী দিগন্তের কোলে ঝঙ্কারিত হইতেছিল। প্রস্ফুট বন-কুসুমের মধুর গন্ধে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত ও সুরভিত হইতেছিল।

উদয়েশ্বর ব্যথিত বিদীর্ণ বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া একবার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহারই হৃদয়ের মত অন্ধকারে সারা বনভূমি সমাচ্ছন্ন। সে কোথায় যায়—কি করে, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিল না। যেখানে লোকালয়—সেখানে তাহার যাইবার উপায় নাই। গৌড়েশ্বরের রাজত্বের বাহিরে আসিয়াছে কি না,—কেহ তাহার সন্ধান পাইলে ধরিয়া দিবে কি না,—এখনও পশ্চাতে পশ্চাতে রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ আগমন করিতেছে কি না,—সে সন্দেহ তাহার দূরীভূত হয় নাই।

পর্ব্বত-সানুদেশে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অবশেষে সেই পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া যাইবার সংকল্প করিল। মনে ভাবিল, এ জঙ্গলে রাত্রিকালে অবস্থান করিলে, হিংস্র জন্তুতে ভক্ষণ করিতেও পারে। পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া, কোন গুহার মধ্যে আশ্রয় লইলে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হইবার সম্ভাবনা।

উদয়েশ্বর পর্ব্বতে উঠিতে লাগিল,—আঁকা-বাঁকা পার্ব্বতীয় পথ দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। কখন অতি শ্রান্তি বশতঃ জানুদ্বয় শিথিল হইয়া আসিতেছিল,—নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া কখন কখন বসিয়া পড়িতেছিল, আবার একটু বিশ্রাম করিয়াই উঠিয়া যাইতেছিল।

সৌন্দর্য্য-সেবক উদয়েশ্বর পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া দেখিল যে, অতি অপূর্ব্ব শোভাময় স্থান। তখন বেলা অবসান হইয়া আসিতেছে,—পর্ব্বতের মস্তকের উপর দিয়া সূর্য্যদেব পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িতেছেন। তাঁহার তরল স্বর্ণ-কিরণ পাষাণ-অঙ্গে পড়িয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। বনবিহঙ্গিণী তাহার সাধা গলায় প্রেমের পঞ্চম

গাহিতেছিল, পার্ব্বতীয় কুসুম-বাসবহুল বৃক্ষে বৃক্ষে ধীরসমীর ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। কোথাও কোন পাষাণ-রেখার কোল হইতে ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী ঝিরি ঝিরি করিয়া বহিয়া চলিয়া যাইতেছিল। কোথাও বৃক্ষ-বীথিকার পার্শ্ব দিয়া হরিণী তরাসে চলিয়া যাইতেছিল।

উদয়েশ্বর দেখিয়া স্তম্ভিত ও বিমুগ্ধ হইল, কোথাও এক উচ্চ পাষাণ বেদিকার উপরে বসিয়া, চারু চরণ-যুগল নিম্নে ঝুলাইয়া দিয়া এক অপরূপ সুন্দরী কামিনী কোন শিল্পকার্য্য করিতেছে,—কিন্তু ভাস্কর-খোদিত প্রতিমার ন্যায় নিথর নিশ্চল,—কোথাও পাষাণাঙ্গ ভেদ করিয়া ঝর ঝর শব্দে ধীরে ধীরে জলধারা পতিত হইতেছে, সেখানে তিন চারিটি অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতী রমণী গোলাপবিনিন্দিত বর্ণময় দেহ মার্জ্জনা করিতেছে। কোথাও কোন সুন্দরী কামিনী পুষ্পাভরণে ভূষিত হইয়া সুখ-সমীরণ সেবন করিতেছে।

সহসা উদয়েশ্বর দেখিতে পাইল, তাহারই অনতিদূরে কুসুম-কুঞ্জ-বীথিকার তলে, শষ্প-শয্যার উপরে বসিয়া এক তন্বী রমণী কতকটা বীণের ন্যায় এক মধুর যন্ত্রবাদনে নিযুক্ত ছিল। তাহার সম্মুখে এক যুবতী যৌবনভারাবনত পূর্ণতায় আলস্যময় দেহভার শষ্প-শয্যার উপরে রক্ষা করিয়া, অনিন্দ্য-আনন ঈষদুত্তোলনপূর্ব্বক বীণাধ্বনি শ্রবণ করিতেছে। কোন কোন যুবতী সেই সুতান-সুন্দর সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ-নেত্রে চাহিয়া রহিয়াছে। কেহ কেহ বা সুন্দর দেহ ঈষদুন্নত করিয়া বসিয়া তাললয়ে মুগ্ধ হইতেছিল, কাহারও সম্মুখে পুষ্পগুচ্ছ, কাহারও হস্তে সুদৃশ্য তৃণগুচ্ছ,—সকলেই নিস্তব্ধ, সকলেই নীরব! মৃদু সমীরণ সুন্দরী-গণের সুপুষ্ট দেহাবৃত বসন লইয়া ধীরে দুলাইয়া দিতেছিল,—ললিত কুন্তল লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল।

উদয়েশ্বর নিস্তব্ধ নয়নে সেই সৌন্দর্য্য-প্রতিমাগণকে চারিদিকে

দেখিয়া বিমুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া গেল। সে ভাবিল, আমি কি পরীর রাজ্যে আসিয়া পড়িলাম? এমন পুষ্টাঙ্গী গৌরবর্ণা রমণীকুল কখনও দেখি নাই—অধিকন্তু আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একজনও পুরুষ এখানে দৃষ্টিপথের পথিক হইতেছে না। এ পাহাড়ে কি কেবলই সুন্দরীর বাস। একি পরীর রাজ্য!

সঙ্গীতরস-নিপুণা সুন্দরীগণের মধ্যস্থা এক সুন্দরীর সুদীর্ঘ কৃষ্ণতার নয়নের দৃষ্টি যুবকের মুখের উপর পতিত হইল। যুবতী বিস্মিত হইয়া তাহার সঙ্গিনীগণকে দেখাইল।

উদয়েশ্বর দেখিল, রমণীগণ গীত বন্ধ করিয়া সকলেই তাহার দিকে চাহিল। তাহাদের চাহনীর ভাবে উদয়েশ্বর স্পষ্টই বুঝিতে পারিল, সকলই তাহাকে বিস্মিত-চাহনিতে চাহিয়া দেখিতেছে।

উদয়েশ্বর একটু সরিয়া পিছাইতেছিল, রমণীগণ তাহা দেখিতে পাইল, একবার এ উহার মুখের দিকে চাহিল;—তারপরে যে তাহার মধ্যে বর্ষীয়সী, সে হাতছানি করিয়া উদয়েশ্বরকে নিকটে ডাকিল।

স্ত্রীলোকের সমাজে ভয় কি ভাবিয়া উদয়েশ্বর ধীরে ধীরে তাহাদের নিকটস্থ হইল।

তাহারা সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইল,—উদয়েশ্বর দেখিল এক এক জন রূপে, হাবে-ভাবে-সাক্ষাৎ রতি।

যে বয়োজ্যেষ্ঠা, সে উদয়েশ্বরকে কি জিজ্ঞাসা করিল। কণ্ঠস্বর অতি মৃদু—অতি মধুর। কিন্তু তাহারা যে ভাষায় কথা বলিল, উদয়েশ্বর তাহা বুঝিতে পারিল না। উদয়েশ্বর বলিল,—"আমি তোমাদের কথা বুঝিতে পারিলাম না।"

তাহারা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতাকি করিতে লাগিল। উদয়েশ্বর বুঝিল, তাহারাও বাঙ্গালা ভাষা বুঝিতে পারিল না। তখন

উদয়েশ্বর প্রথমে হিন্দি, তৎপরে পার্শিতে কথা বলিল, তাহারা তাহাও বুঝিতে পারিল না। তখন অনন্যোপায় হইয়া উদয়েশ্বর নিরস্ত হইল। রমণীগণও তাহার কথা বুঝিতে না পারিয়া, বা তাহাদের কথা বুঝাইতে না পারিয়া দুঃখিত হইল।

তার পরে, তাহারা উদয়েশ্বরকে ইঙ্গিতদ্বারা সঙ্গে যাইবার জন্য আহ্বান করিল। আশ্রয়হীন উদয়েশ্বর তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করা শ্রেয়োজ্ঞান করিল না,—হংসী সদৃশ গমনে রমণীকুল চলিতে লাগিল—, হংসীযুথ-পশ্চাদ্ধাবিত মরালরাজের ন্যায় উদয়েশ্বর তাহাদের বিকীর্ণ সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে করিতে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

আঁকা-বাঁকা, উঁচু-নীচু, চড়া, অসমতল নানাবিধ পথ দিয়া তাহারা চলিয়া গিয়া, পর্ব্বতশিখরের একটা সমতল স্থানে উপস্থিত হইল। সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু পর্ণ-কুটীর শ্রেণীবদ্ধরূপে সংস্থাপিত।

উদয়েশ্বর দেখিল, সেখানে রমণীবৃন্দের ন্যায় আরও অনেক সুন্দরী রমণী ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। আর ভীমকান্তি কঠোর দৃষ্টি অনেক পুরুষ নানাবিধ কার্য্যে পরিলিপ্ত রহিয়াছে। কেহ কেহ বা তীর-ধনু লইয়া নিরীহ পক্ষীকুলের প্রাণ সংহার করিতেছে, কেহ বা বর্ষাগ্রে হরিণশিশুকে বিদ্ধ করিয়া আনিয়া আটখানা হইতেছে। উদয়েশ্বরকে রমণীগণের পশ্চাতে দেখিয়া, কেহ কেহ কঠোর দৃষ্টিতে চাহিল। রমণী-গণ তাহাদের ভাষায় কি বলিল, মৃদু-কুটিল হাসির দ্বারা প্রত্যুত্তর দান করিল। রমণীগণ উদয়েশ্বরকে একটা ক্ষুদ্র কুটীর দেখাইয়া দিল,—কাহারও কথা কেহ বুঝিতে পারে না। ইঙ্গিত অনুসারেই উদয়েশ্বর সে গৃহদাবায় গিয়া উপবেশন করিল,—তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে পাহাড়ের শিখর ডুবিয়া আসিতেছিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার ঘনান্ধকারে সমস্ত পর্ব্বতশৃঙ্গ ডুবিয়া পড়িল—দূরে দূরে এক একবার হিংস্র জন্তুর ঘোর শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। সমীরণ ক্বচিৎ এক একবার পার্ব্বতীয় প্রস্ফুট কুসুমের গন্ধ বহিয়া আনিয়া উদয়েশ্বরের অবস্থান-কুটিরে পঁহুছিয়া দিতেছিল। উদয়েশ্বর অন্ধকারাচ্ছন্ন জনশূন্য সেই কুটির-দাবায় বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল—এ কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি! বহুদিন হইল বাহির হইয়াছি,—দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়া বহুদিন পথে চলিয়াছি,—কিন্তু এ কোথায় আসিলাম? বিশেষ কোন বিপদে পড়িব না ত! স্ত্রীলোকগুলিকে অতি সুন্দরী এবং সরলহৃদয়া বলিয়াই বোধ হইয়াছিল, কিন্তু পুরুষেরা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত,—যেন যমদূত! দেখিলেই অন্তরাত্মা শুকাইয়া যায়,—মনে হয়, এখনই উহাদের আমেদপ্রিয় কঠোর হৃদয়ের কৌতূহল নিবারণার্থ হয়ত উদরে একটা বর্ষা-খোঁচা মারিয়া সকল জ্বালার অবসান করিয়া দিবে। নিশ্চয়ই ইহারা কোন অসভ্যজাতি। কিন্তু রমণীদের পরিচ্ছদ ও সঙ্গীত-প্রিয়তা দেখিলে, সে বিশ্বাস ও হয় না।

উদয়েশ্বর কিছুই স্থির করিতে পারিল না। যাহার আত্মীয় নাই, স্বজন নাই, ঘর নাই, দুয়ার নাই,—যে রাজাদেশে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত, যে কারাগৃহ হইতে পলায়িত, যে পরিচিত ব্যক্তির আশ্রমে এবং পরিচিত স্থানে মুহূর্ত্ত দাঁড়াইতে অশক্ত, তাহার পক্ষে মৃত্যু ততটা ভয়ঙ্কর নহে। বিয়োগ-ব্যথা মৃত্যুর যন্ত্রণা,—কিন্তু জীবনেই যাহার বিয়োগের চরমাবস্থা, তাহার জীবন-মরণে প্রভেদ কি? যাহার মরণে ভয় নাই, তাহার হৃদয়ে সাহসও আছে। কাজেই উদয়েশ্বরও সাহসী।

সাহসী না হইলে অন্ধকাররাশিপূত সম্পূর্ণ অপরিচিত পর্ব্বতশৃঙ্গে, সেই ভীষণ মানবের ক্ষুদ্র আবাসে নিস্তব্ধে বসিয়া থাকা সাধ্যায়ত্ত হইত না।

সে দিন কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া,—রাত্রি ছয়দণ্ড উত্তীর্ণ হইতেই পাহাড়-শৃঙ্গের সানুদেশ হইতে কৌমুদীরাশি বিকীর্ণ করিয়া চন্দ্রদেব উদিত হইলেন,—কৌমুদীরশ্মির প্রথম কিরণটুকু উদয়েশ্বরের মুখের উপর দিয়া সমস্ত দাবায় ছড়াইয়া পড়িল,—দেখিতে দেখিতে অন্ধকাররাশি অপনোদিত হইল। পার্ব্বতীয় বৃক্ষ-কুঞ্জ হইতে আলোকপুলকে পক্ষিকুল মধুর-রবে ডাকিয়া উঠিল,—ভীষণতার কোলে মধুতার বিকাশ হইল। উদয়েশ্বর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, নিজের উত্তরীয় বিছাইয়া সেই দাবার উপরে শয়নের উদ্যোগ করিতেছিল—এমন সময় শুনিতে পাইল,—সে, যে গৃহে একাকী বসিয়া আছে সেই গৃহের দক্ষিণ দিক্ হইতে কতকগুলি মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যাইতে লাগিল,—তাহার আর শয়ন করা হইল না, উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পর্যান্ত সে এক স্থানেই রহিল,—অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল, যাহারা কথা কহিতেছিল, তাহাদের কথা ক্রমেই অধিক লোকের বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিল। তারপরে আরও কিয়ৎ-ক্ষণ অতীত হইলে, উদয়েশ্বর স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিল, যাহারা কথা কহিতেছিল, তাহারা চারিদিকে চলিয়া গেল। তখন উদয়েশ্বর কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া পূর্ব্বপাতিত উত্তরীয়ের উপরে শয়ন করিল।

উদয়েশ্বর সবেমাত্র শয়ন করিয়াছে, এমন সময় পুনরপি মনুষ্য-পদশব্দ শুনিতে পাইল,—তাহার বোধ হইল, দুইজন মনুষ্য তাহারই গৃহাভিমুখে আসিতেছে,—সে আবার উঠিয়া বসিল।

একজন দীর্ঘকার পুরুষ ও একটি সুন্দরী যুবতী রমণী দাবায় উঠিয়া দাঁড়াইল। যুবতীর হস্তে একটা আলো—আলো দেখিয়া উদয়েশ্বর

আশ্চর্য্যান্বিত হইল, সে একখানি কাঁচা কাষ্ঠখণ্ড। সেই কাঁচা কাষ্ঠখণ্ডের অগ্রভাগ ঠিক মোমবাতির ন্যায় জ্বলিতেছে।

তাহাদের আগমন মাত্র উদয়েশ্বর উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং অতিশয় বিনম্রভাবে অভিবাদন করিল।

উদয়েশ্বর এখানে আসিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে যেরূপ পুরুষগণকে দর্শন করিয়াছিল, আগন্তুক তাহাদের হইতে একটু নম্রমূর্ত্তি, কিন্তু সমধিক সুপুষ্টদেহী। যে রমণীগণ তাহাকে পথ দেখাইয়া আনিয়াছিল, যুবতী তাহারই মধ্যের একজন।

আগন্তুক কথা কহিল। কথা হিন্দিমিশ্রিত নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালা,—উদয়েশ্বর বুঝিল, আগন্তুক ইহা শিক্ষা করিয়া রাখিয়াছে, বস্তুতঃ ইহা তাহার মাতৃভাষা নহে। যাহা হউক, সে যেন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বাঁচিল।

আগন্তুক বলিল, "তোমার চেহারা দেখিয়া বোধ হইতেছে, তুমি বাঙ্গালী,—আমার অনুমান ভুল হয় নাই ত ?"

উ। না মহাশয়; আপনার অনুমান ভুল হয় নাই, আপনি ঠিক অনুমান করিয়াছেন, আমি বাঙ্গালী। আমি অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া এই অতিদূরতর এবং সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি।

আগন্তুক ও যুবতী একটু দূরে দূরে উপবেশন করিল। জ্বলিত কাষ্ঠখণ্ড হেলাইয়া পাষাণভিত্তিতে রাখিয়া দিল। উদয়েশ্বরও তাহাদের অনতিদূরে বসিয়া পড়িল। আগন্তুক বলিল,—"তুমি বোধ হয়, এখানকার কাহারও কথা বুঝিতে পার নাই ?"

উ। না, মহাশয়; আমি কাহারও কথা বুঝিতে পারি নাই। কোথায় আসিয়াছি, তাহাও বুঝিতে পারি নাই। যদি আমাকে দয়া

করেন, তবে এই স্থানের ও আপনাদের পরিচয় দিলে বড় বাধিত ও অনুগৃহীত হইবে।

আ। সমস্তই বলিতেছি,—কিন্তু আগে তোমার পরিচয় দাও। ভরসা করি, আত্ম-পরিচয় গোপন করিবে না, এবং কোন প্রকার মিথ্যা কথা বলিও না। আমাদের দ্বারা তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না, ইহা নিশ্চয় জানিও।

উ। আমি দেশ হইতে—প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া আসিয়াছি, সেই জন্য জানিতে চাহি, ইহা কাহার অধিকৃত স্থান ?

আ। ওহো বুঝিয়াছি, তুমি বোধহয় তোমাদের দেশের রাজার আজ্ঞায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলে; তারপর, কোন প্রকারে পলায়ন করিয়াছ,—তা ভয় নাই। বাঙ্গলা দেশ হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছ। এস্থানে বাঙ্গালীর গমনাগমনই নাই—ইহা কাহারও অধিকৃত দেশ নহে। কিছুদিন হইতে হইল, আমরা কতকগুলি লোক এখানে আসিয়া বসতি করিতেছি।

উদয়েশ্বর বুঝিল, গৌড়েশ্বরের ভয় আর এখানে নাই। সে তখন তাহার বাসস্থান ও দণ্ডাজ্ঞা এবং পলায়নের কথা সমস্তই আগন্তুকের নিকট নিবেদন করিল।

আগন্তুক বলিল,—"তোমাকে বুদ্ধিমান ও কর্ম্মী বলিয়াই জ্ঞান হইতেছে। তুমি যদি প্রতিজ্ঞা কর, আমাদের এখানে যাহা দেখিবে, তাহা কুত্রাপি প্রকাশ করিবে না; এবং আমরা যাহা করিব, তাহা যদি কর—তবে অতি সুখে এবং নির্ভয়ে আমাদের সঙ্গে বাস করিতে পারিবে।"

উ। আমার আর দেশে যাইবার যখন উপায় নাই—বাঙ্গালী সমাজে মিশিবার পথ নাই, তখন আমি আপনাদের এই স্থানে বাস করিতে পারিলেই সুখী হইব। আপনাদের এখানে যাহা দেখিব বা

শুনিব, তাহা কোথায় প্রকাশ করিতে যাইব ? কোথায় বা অন্য লোকের সাক্ষাৎ পাইব ? আপনাদের এখানকার লোকের ভাষাও আমি বুঝিতে পারি না, আমার ভাষাও কেহ বুঝে না; কেবল আপনি বুঝেন দেখিতেছি—আপনার মত কি আরও দুই চারিজন বাঙ্গলা ভাষা বলিতে ও বুঝিতে পারেন ?

আ। না। এখানে যতগুলি লোকের বসতি আছে. তাহার মধ্যে আমিই কেবল বাঙ্গালা ভাষা জানি। আমি অনেক দিন বাঙ্গালা মুল্লুকে ব্যবসায় কার্য্যোপলক্ষে বসতি করিয়া আসিয়াছিলাম।

উ। আপনাদের কি বাড়ীই এই স্থানে ?

আ। না।

উ। এই স্থানের নাম কি ?—আমি. কোথায় আসিয়াছি, জানিবার জন্য অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে।

আ। বাঙ্গালা দেশ হইতে তুমি অনেকদূর আসিয়াছ। এস্থানের নাম আঙ্গোচিঙ পাহাড়।

উ। আপনাদের কি এই স্থানেই বাস ?

আ। না,—আমরাও অত্যাচারিত হইয়া এস্থানে আসিয়া বাস করিতেছি।

উ। আপনাদের বাসস্থান কোন্ দেশে ?

আ। ক্রমেই জানিতে পারিবে। তোমাকে একটি কথা বলি-—তুমি যখন স্বদেশে য়াইতে পারিবে না, তখন এই স্থানে যাহাতে তোমার প্রসার-প্রতিপত্তি হইতে পারে, তুমি যাহাতে এখানে এক-জন গণ্য-মান্য হইতে পার, তাহা তোমার করা কর্ত্তব্য।

উ। কর্ত্তব্যত বটেই,—সে ইচ্ছা মানুষ মাত্রেই করে। কিন্তু ঘটাইয়া তোলাই কঠিন।

আ। তার উপায় আছে,—তুমি যদি আমার কথা শোন,—আমি তোমাকে অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের গণ্য-মান্য লোকের শ্রেণীমধ্যে মিশাইয়া দিব।

উ। আমি কপর্দ্দকহীন পথিক।

আ। আমাদের ভাণ্ডার সমস্ত পর্ব্বতে পরিব্যাপ্ত,—আহরণ করিয়া আনিতে পারিলেই কাহারও কোন অভাব থাকে না।

উ। আমি, আপনি ভিন্ন কাহারও সহিত কথোপকথনও করিতে পারিবে না। যেহেতু আমি আপনাদের ভাষা জানি না।

আ। আমি তোমাকে আমাদের ভাষা শিক্ষা দিব। পনেরদিন পরিশ্রম করিলেই, তুমি সাধারণ কথাবার্ত্তা কহিবার উপযুক্ত হইতে পারিবে।

উ। আমার প্রতি এই অযাচিত করুণা, যথার্থ হৃদয়বানের কার্য্য।

আ। আমি তোমাকে আপন পুত্রের ন্যায় যত্ন করিয়া রাখিব, বন্ধুর ন্যায় উপদেশ দিব, এবং শিক্ষকের ন্যায় শিক্ষা দিব—কিন্তু কদাচ আমার বিনা অনুমতিতে কোন কার্য্য করিও না। আমরা এইস্থানে যতগুলি নরনারী বসতি করিতেছি, সকলেই বিশেষ কোন কার্য্যে লিপ্ত আছি—তাহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, আবার বলিতেছি—আমাদের এখানে যে সকল বিষয় দেখিবে বা শুনিবে, তাহা কাহাকেও বলিও না।

উ। আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিলাম, তাহা কাহাকেও বলিব না। আমার জ্ঞান হইতেছে, আপনিই এখানকার সর্দ্দার,—বোধ হয়, আমার অনুমান ভুল হয় নাই?

আ। হাঁ, তোমার অনুমান ভুল হইয়াছে। আমি সর্দ্দার নহি,—সর্দ্দার কোন কারণে কোন স্থানে বন্দী আছেন, তাঁহাকে উদ্ধার করাই আমাদের এখনকার প্রধান কার্য্য।

উ। আমি যদি সে কার্য্যে সহায়তা করিতে পারি, তবে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে পারিব। তিনি কোথায় বন্দী আছেন?

আ। সমস্তই জানিতে পারিবে। তোমার দ্বারা আমাদের বিশেষ কার্য্য হইবে বলিয়াই তোমাকে আমরা সর্ব্বপ্রকারে যত্ন করিব। কিন্তু এখন তোমাকে অধিক কিছুই বলিব না। কিছুদিন আমাদের এখানে থাক,—আমাদের ভাষা শিক্ষা কর—আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি অবগত হও,—আর তোমাকেও আমরা বুঝি, তারপরে সমস্ত অবগত হইতে পারিবে!

উ। যে আজ্ঞা।

আগন্তুক পার্শ্বোপবিষ্টা যুবতীর দিকে চাহিল, সে আলোটি হাতে করিয়া উঠিয়া গেল, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে একটা কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্রে কতকগুলি সুপক্ক ফল, একটা কাষ্ঠের চোঙ্গায় উষ্ণ দুগ্ধ ও একঘটি জল আনিয়া উদয়েশ্বরের সম্মুখে রক্ষা করিল। আগন্তুক বলিলেন,—"এই-গুলি আহার কর। আমি জানি, তোমরা অন্নাহার করিয়া থাক,—আমরাও ভাত খাই। কিন্তু এ রাত্রে কোথায় তোমার আহারের উদ্‌যোগ হইবে,—তাই এইগুলি আনা হইল, কল্য হইতে অন্নাহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিব।"

উ। আমার প্রতি আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ করা হইল। আপনার নাম কি জানিতে পারিলে বাধিত হইতাম।

আ। আমার নাম খড়্গাসিং। তোমাকে আর একটি কথা বলিতে চাহি।

উ। কি বলুন?

খ। আমি তোমাদের দেশে অনেক দিন ছিলাম, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—তোমাদের দেশের স্ত্রীলোকগণ অন্তঃপুরাবদ্ধা; কিন্তু

আমাদের দেশের স্ত্রীলোকগণ তাহা নহে—ইহারা স্বেচ্ছাবিহারিণী। এ সকল দেখিয়া, মনে করিও না যেন ইহারা অসচ্চরিত্রা। এ কথা তোমাকে বলিবার কারণ এই যে, স্ত্রীলোকগণের এরূপ ব্যবহার দেখিয়া পাছে তুমি আমাদের সকলকেই হীনচরিত্রের লোক মনে কর।

উ। আমাকে ঐ কথা বলিয়া ভালই করিলেন। তবে স্ত্রী-স্বাধীনতা অনেক স্থলে আছে, তাহা আমি শুনিয়াছি এবং আমিও উহা ভালবাসি।

খ। তবে এখন আমরা যাই, তুমি এই ফলজলাদি ভক্ষণ কর। এই আলো লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিও, শয্যা আছে, নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইও। এই গৃহখানি আমাদের বর্ত্তমান অবস্থানুযায়ী অথিতি-শালা।

উ। যে আজ্ঞা।

তখন খড়্গসিং ও যুবতী চলিয়া গেল। ক্ষুৎপিপাসাকাতর উদয়েশ্বর সেই পার্ব্বতীয় সুমিষ্ট ফল ও দুগ্ধ খাইয়া একঘটি জল ঢক ঢক করিয়া পান করিল। তারপরে, আলো লইয়া গৃহমধ্যে গমন করিয়া দেখিল বংশ-নির্ম্মিত এক মাচার উপরে একখানি সামান্য রকমের শয্যা আস্তৃত আছে। উদয়েশ্বর তাহার উপর শয়ন করিয়া পার্ব্বতীয় ব্যক্তিগণের কার্য্য, খড়্গসিংহের ভদ্র আচরণ ও যুবতীগণের সৌন্দর্য্য ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

তারপর প্রায় একমাস কাটিয়া গিয়াছে। উদয়েশ্বর তখন সেই পার্ব্বতীয়গণের ভাষা-আদি একরূপ শিক্ষা করিয়া লইয়াছে,—এখন সে সকলেরই সহিত মিলিয়া গান, গল্প, আমোদ, কৌতুকে কালক্ষেপ করিয়া থাকে।

উদয়েশ্বর তাহাদের সহিত মিশিয়া একরূপ সুখেই দিন কাটাইতেছিল,—কিন্তু তাহাদের এক একটা কার্য্য দেখিয়া, তাহাদের পুরুষগণের মধ্যে কাহারও কাহারও নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখিয়া, মধ্যে মধ্যে ভীত হইয়া পড়িত। তাহাদের স্বভাবে ঔদ্ধত্য, জীবে নিষ্ঠুরতা, কার্য্যাবলীতে কুটীলতা যেন উদয়েশ্বরের নিকট কোন্ অদূরের অমঙ্গল সংবাদ বহন করিয়া আনিত।

এক দিন খড়্গসিং উদয়েশ্বরকে বলিলেন,—"আমাদের সঙ্গে তোমাকে আমাদের দেশে যাইতে হইবে। আমাদের সর্দ্দার যেখানে বন্দী আছেন, আমরা কৌশলে তাহাকে উদ্ধারের চেষ্টা করিব—তুমিও তাহাতে সহায়তা করিবে।"

উদয়েশ্বর তাহাদের দেশ কোথায়, সর্দ্দার কেন বন্দী, কাহার নিকট বন্দী, কি অপরাধে বন্দী,—তাহার কিছুই অবগত ছিল না। তথাপি সে যাইতে স্বীকৃত হইল,—সে ভাবিল, যাহারা আমাকে আত্মীয়ের ন্যায় যত্নে পালন করিতেছে, সর্ব্ববিষয়ে সুবিধা করিয়া দিয়াছে, যাহাদের আশ্রয়ে না থাকিলে, আমাকে গৌড়ের বাদশা বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দিবে,—তাহাদের দলপতির উদ্ধার করিবার সহায়তা না করিলে নিশ্চয়ই আমার অকৃতজ্ঞতা হয়। আর খড়্গসিং বলিয়াছে, যদি আমি তাহাদের কার্য্যের সহায় হই,—তবে আমাকে প্রচুর

পুরস্কার প্রদান করিবে, তাহাদের মধ্যে যাহাতে গণ্যমান্য হইয়া বসতি করিতে পারি, তাহা করিয়া দিবে। যখন দেশে যাইবার আর উপায় নাই, জাহানারাকে দেখিবার সাধ্য নাই—মালতীর সংবাদ লইবার ক্ষমতা নাই, তখন এই দেশে—এই সমাজে, যাহাতে একটু মান-সম্ভ্রম—একটু খাতির-যত্নের সহিত বসবাস করিতে পারি, তাহা করা কর্ত্তব্য।

রাত্রি তখন প্রায় ছয়দণ্ড অতীত হইয়াছিল, কৃষ্ণপক্ষের রজনী ঘন-ঘোরা। বিশ্বের অন্ধকার যেন যোট পাকাইয়া উদয়েশ্বরের বাস-নির্দ্দিষ্ট অতিথিশালার ক্ষুদ্র গৃহের চারিধারে জমাট পাকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সর্ব্বত্র নিস্তব্ধ—কেবল মধ্যে মধ্যে দূরে কোন পাহাড়ীয় নিশাচর পক্ষীর বিকট ভৈরব রব উত্থিত হইতেছিল; উদয়েশ্বর নির্জ্জন নিস্তব্ধ সেই পর্ণকুটীরের মধ্যে শয্যায় শয়ন করিয়া প্রাগুক্ত বিষয় ভাবিতেছিল।

ভাবিতে ভাবিতে সহসা উদয়েশ্বর তাহার গৃহপার্শ্বে মনুষ্যকণ্ঠ-বিনিঃসৃত অনুচ্চ স্বর শুনিতে পাইল। দুইটি কি তিনটি মনুষ্যে কথা হইতেছে, এইরূপ তাহার জ্ঞান হইল। সে স্থিরকর্ণে সে কথা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইল, কিন্তু সকল কথা ভালরূপ শুনিতে পাইল না,—দুইটি কথা মাত্র তাহার শ্রুতি গোচর হইল। একজন বলিল,—"হাঁ, আজ রাত্রেই গুপ্তগৃহে যাইয়া প্রস্তুত করিতে হইবে।" আর একজন বলিল, "এ পথ দিয়া যাইতে আসিতে আমার ভয় করে, পাছে উদয়েশ্বর দেখিতে পায়—লোকটা বড় চতুর।"

উদয়েশ্বরের মনে ভয়ের সহিত কৌতুহলের সঞ্চার হইল। সে পা টিপিয়া টিপিয়া গৃহের বাহির হইল, এবং অন্ধকারে মনুষ্য দুইটি যে দিকে ছিল, সেই দিকে অগ্রসর হইল। অন্ধকারে তাহাদের ছায়ামাত্র অনুভব করিল। ভাবিল, ইহারা কোন্ দিকে যায়—ইহাদের গুপ্তগৃহ কোথায়, সেখানে গিয়া কি করে—তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে।

যাহাদের সঙ্গে আছি—তাহাদের ক্রিয়াকাণ্ড বিষয়ে যতদূর অভিজ্ঞ হইতে পারা যায়, ততই মঙ্গল।

মনুষ্য দুইটি অন্ধকার পথে অনেক দূর অগ্রসর হইল, আঁকিয়া বাঁকিয়া পাহাড়ের একটা শৃঙ্গের সানুদেশস্থ সমতল স্থানে উপস্থিত হইল। উদয়েশ্বরও এতদিন পাহাড়ে থাকিয়া পার্ব্বত্য পথে বিচরণে সক্ষম হইয়াছিল,—সেও তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিল।

আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া একটি বংশনির্ম্মিত বাটীর নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহার দ্বারে আঘাত করতঃ সম্মুখের মনুষ্য ডাকিয়া বলিল,—"দ্বার খোল।"

এই কথা বলিতে দ্বার খুলিয়া গেল। মনুষ্য দুইটি গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। উদয়েশ্বরের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সে ভাবিল, ফিরিয়া যাই—আবার ভাবিল, বাটীর মধ্যে না যাইতে পারিলে, ব্যাপার কিছুই অবগত হইতে পারা যাইবে না। তখনও দরোজা বন্ধ হয় নাই —উদয়েশ্বর সাহসে ভর করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং অতি সন্তর্পণে একটা বেড়ার গায়ে ঠেসান দিয়া দাঁড়াইয়া চাহিয়া দেখিল—, পাশের একটা পূর্ব্ব-পশ্চিম লম্বা গৃহে যাহারা তাহার অগ্রে অগ্রে আসিল, তাহারা প্রবেশ করিল। তখন তাহারা উপবেশন করে নাই, এবং সেই গৃহস্থিত একজনকে জিজ্ঞাসা করিল,—"জেল্লা কোথায়?"

যাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সে বলিল,—আপনি ডাকিলে আমি দরোজা খুলিয়া দিতে গিয়াছিলাম, জেল্লা তখন এই স্থানেই ছিল। বোধ হয়, বাহিরে কোন কাজে গিয়াছে।"

গৃহমধ্যে তিন চারিটি অতি উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছিল। দুইখানি মাদুর মেঝের উপর আস্তৃত ছিল,—আর মাটির কয়েকখানি সরাব, কাষ্ঠের সুনির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি কৌটা, পার্শ্বের দিকে মোটা দুই-

গাছি রজ্জুসংলগ্ন প্রায় আধুনিক কপিকলের মত একটী কল। সেই কলের পার্শ্ব দিয়া অপর গৃহে যাইবার দরোজা।—দরোজা বন্ধ।

উদয়েশ্বর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে সকল দেখিয়া লইল। আরও দেখিল, যে দুই ব্যক্তি তাহার অগ্রে আগমন করিল, তাহার মধ্যে এক জন পুরুষ, অপর রমণী! পুরুষ খড়্গসিং,—রমণীটিকে চিনিতে পারিল না।

উদয়েশ্বর দেখিল, অমন রূপ ত্রিজগতে বুঝি সুদুর্ল্লভ। তাহার সর্ব্বাঙ্গে যৌবনের উদ্দাম-প্রভা উছলিয়া পড়িতেছিল। সে সকল রমণী-গণ, পাহাড়ে আসিয়া দেখিতেছে, তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই পুষ্ট-দেহা, প্রোজ্জ্বল, গৌরবর্ণা ও কুসুমকান্তিবিশিষ্টা, কিন্তু অধিকাংশেরই প্রায় নয়ন কিঞ্চিৎ ছোট,—কিন্তু এ রমণী যেন সাক্ষাৎ বিদ্যাধরী। এ রূপ যে দেখে, তাহারই বুঝি মোহ হয়।

একটু পরেই আর এক জন লোক সেই গৃহে প্রবেশ করিল। খড়্গসিং বলিলেন,—"জেল্লা, কটা কুকুর প্রস্তুত হইয়াছে।"

জে। দুইটা।

খ। একটা লইয়া আইস। বাহিরের দরোজা বন্ধ হইয়াছে?

জে। আপনারা আসিলে খোলা ছিল, আমি বন্ধ করিয়া দিয়া আসিয়াছি।

খ। ভাল, এখন কুকুর আন।

জেল্লা পশ্চাতের দরোজা খুলিয়া আলো লইয়া অপর গৃহে প্রবেশ করিল। উদয়েশ্বর স্থিরদৃষ্টিতে জেল্লার হাতের উজ্জ্বল আলোক-সাহায্যে দেখিতে পাইল, সেই গৃহে অনেকগুলি ভীষণাকার দীর্ঘদেহী ব্যাঘ্রের ন্যায় পার্ব্বত্য কুকুর শৃঙ্খলাবদ্ধ রহিয়াছে—সম্মুখের দুইটী কুকুর ঠিক উন্মত্তের ন্যায় ছটফট করিতেছে।

যে গৃহে খড়্গসিংহ প্রভৃতি রহিয়াছে, সেই গৃহের দরোজা হইতে আর কুকুরের গৃহ-পথে বাঁশ দিয়া একটা গলিপথ প্রস্তত করা আছে। জেল্লা কৌশলে একটা ক্ষিপ্তবৎ কুকুরের শৃঙ্খল খুলিয়া সেই গলিপথে প্রবেশ করাইল, এবং সম্মুখের ঘরে আসিয়া শিকল ধরিয়া টান দিল,—উঠিতে পড়িতে, ক্রোধে বংশখণ্ডগুলি কামড়াইতে কামড়াইতে কুকুরটা আসিয়া সেই গলিপথের সম্মুখস্থ প্রান্তসীমায় কপিকলের মত যে কল প্রোথিত ছিল, তাহার নিকটে উপস্থিত হইল,—সে যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিল;—অপর ব্যক্তি যষ্টি সাহায্যে কুকুরের পশ্চাৎভাগের পদদ্বয়ে কলের রজ্জুর অগ্রভাগের দুইটা ফাঁসি লাগাইয়া টান দিল,—ফাঁস দুইটা তাহার পায়ে উত্তমরূপে আঁটিয়া গেল। তখন জেল্লা ও সেই ব্যক্তি কলের রজ্জু ধরিয়া টানিতে লাগিল,—কলের দড়ি উপরের বংশ ঘরের উপর দিয়া ঘোরান ছিল, সুতরাং সেই টানে উপরকার দড়ি নীচে নামিয়া আসিল, এবং কুকুরের পায়ের দড়ি উপরে উঠিয়া গেল,—তাহাতে কুকুরে পশ্চাদ্ভাগের পা দুইখানি উর্দ্ধে উঠিয়া গেল, মুখ ও সম্মুখের পদদ্বয় ঝুলিতে লাগিল—কুকুরের জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িল, তাহার মুখ দিয়া গেঁজ্‌লা নির্গত হইতে লাগিল,—যুবতী একখানি সরাব লইয়া তাহার মুখের নীচে পাতিয়া দিল। কুকুরমুখনিঃসৃত লালাসকল সেই সরাবে পড়িতে লাগিল।

উদয়েশ্বর স্তব্ধশ্বাসে সে দৃশ্য দেখিতেছিল, এমন সময় জেল্লা কি একটা কার্য্যের জন্য বাহিরে আসিয়া বংশবেড়াসংলগ্নদেহী উদয়েশ্বরকে দেখিতে পাইল। সে চমকিয়া উঠিল, এবং উদয়েশ্বরকে সিংহবিক্রমে চাপিয়া ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। উদয়েশ্বর তাহাদের এই গুপ্তক্রিয়া দর্শন করিয়াছে—লুকাইয়া প্রবেশ করিয়াছে, সহসা ইহা জানিতে পারিয়া যুবতী চমকিয়া উঠিল। খড়্গসিং

বিস্মিত নয়নে তাহারদিকে চাহিল, জেল্লাক্তিং গুপ্তদর্শনের প্রতিফল দিবার জন্য তাহাকে ঠাসিয়া ধরিল, এবং অপর ভীষণাকার ব্যক্তি একখানা বংশখণ্ড তুলিয়া তাহার মাথার উপরে তুলিল। মুহূর্ত্তে তাহার মস্তকে সেই ভীম আঘাত পড়িত, কিন্তু খড়্গাসিং নিষেধ করিলেন। উদয়েশ্বর অব্যাহতি পাইল।

খড়্গাসিংহের আদেশে জেল্লা তাহাকে টানিয়া লইয়া বাটীর বাহির করিয়া দিয়া আসিল।

যুবতীর নাম রোমাণী। রোমাণী বিস্মিত নয়নে খড়্গা সিংহের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—উহাকে ছাড়িয়া দিলে কেন?"

খড়্গাসিং মৃদু হাসিয়া বলিল,—"লোকটাকে বুঝিতে পারিলে না,—ভারি সাহসী, ভারি চালাক। রাত্রে—এই পাহাড়ে—এই অন্ধকারে যে বিনা কাজে—কেবল কৌতূহল চরিতার্থের জন্য এই অজানা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে, তাহার দ্বারা অনেক কাজ হইতে পারিবে।"

রো। তা পারুক,—কিন্তু এই গুপ্ত কথা যদি প্রকাশ করে?

খ। তার আগে কাজ নিকাশ করিলেই হইবে।

রো। বুঝিতে পারিলাম না।

খ। সর্দ্দারের উদ্ধার কার্য্যে ওর দ্বারা অনেকটা সুবিধা হইবে বলিয়া উহাকে যত্ন করিতেছি,—সে কার্য্য সাধন করিয়া আসিয়া, উহাকে মারিয়া ফেলিলেই সকল গোল চুকিয়া যাইবে?

রো। উহার দ্বারা সে কার্য্যের কি সুবিধা হইবে?

খ। তুমি বোধ হয় ভালরূপই জান যে, আমাদের দেশের লোক বাঙ্গালী চাকর রাখিতে খুব ভালবাসে,—জয়সিংহের দুর্গে উহাকে চাকর

রূপে প্রেরণ করিব, এবং সর্দ্দারের নিকটে উহার দ্বারা হলাহল পাঠাইব,--তাহা হইলেই সর্দ্দার বাহির হইয়া আসিতে পারিবে।

রো। মতলব মন্দ নয়। কোন্ বিষ পাঠাইবে ?

খ। এ ঘরের বিষ নহে,—মিস্ সাপের বিষ! যাহাতে পাঁচ মিনিটের মধ্যে যাকে দেওয়া যায়, তার কাজ সাবার হয়। ধীরে ধীরে দু'তিন মাসে কাজ হাসিল হলে কি হবে।

ততক্ষণ কুক্কুরটা মরিয়া গিয়াছিল। জেন্না সেই কুক্কুরের মৃত-দেহটা খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিল। রোমাণী সরাবস্থ সেই লালাটুকু দুই তিনটা কাষ্ঠকৌটায় পুরিয়া লইয়া যত্নে রক্ষা করিল,—তারপরে, খড়্গসিং এবং রোমাণী বাটীর বাহির হইয়া চলিয়া গেল। জেন্না বাটীর দরোজা আঁটিয়া দিয়া আসিল।
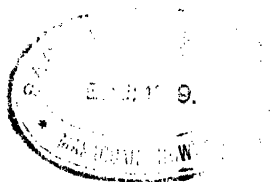
পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

উদয়েশ্বর ফিরিয়া আসিয়া তাহার বাঁশ-কুটীরে প্রবেশ করিল। বংশবিনির্ম্মিত খট্টার উপরে উপবেশন করিয়া ভাবিতে লাগিল, অন্যায় কাজ করিয়াছি,—যাহাদের অনুগ্রহে এই স্থানে নিরাপদে বসতি করিতেছি, কেন তাহাদের গুপ্তকার্য্য দর্শন করিতে গিয়া তাহাদের বিরাগভাজন হইলাম! এক্ষণে তাহারা আমাকে কি করিবে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা। উহারা যেরূপ নিষ্ঠুরপ্রকৃতি, আমায় হত্যা করিয়া ফেলিতেও পারে! বোধ হয়, এতদিনে আমার জীবনের অবসান কাল সমাগত। তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিল।

আবার মনে হইল, এখানে—এই অসভ্যগণের মধ্যে—নিষ্ঠুর মানব-মানবী-সমাজে চিরদিন আবদ্ধ থাকার চেয়ে, মরণই শান্তি। এখানে থাকা জীবনের ব্যর্থ পরিশ্রম,—ব্যর্থ উদ্দেশ্য!

তারপরে মনে হইল, কুকুরটাকে খুলাইয়া, তাহার মুখের লালা সংগ্রহ করিয়া উহারা কি করিবে? ইহাদের উদ্দেশ্য ভাল নহে,—তাহা নিশ্চয়, কিন্তু কিছুই বুঝা গেল না। খড়্গসিংকে ভাল লোক বলিয়াই এতদিন ধারণা করিয়া আসিতেছিলাম,—সেও ঐ কার্য্যে লিপ্ত! বুঝিতে পারিলাম না,—ঐ কার্য্যের উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য যে নিতান্ত ভাল নহে—তাহা উহাদের কার্য্য-সংশয়তা ও ভীততাতেই বুঝিতে পারা যায়।

যে রমণীকে তথায় দেখিলাম, ইহাকে আর কখনও দেখি নাই,—এতদিন এখানে আছি, আর কোন দিন উহাকে দেখিতে পাই নাই,—তবে কি' রমণী এখানে থাকে না? ঐ রমণীর মত সুন্দরী রমণী আমি

কখনও দেখি নাই। যেমন সুপুষ্টদেহ তেমনই বর্ণোজ্জ্বল-কান্ত-কান্তি। যেমন ভরা ভাদ্রের নদীর উচ্ছ্বল জলরাশির মত যৌবন-তরঙ্গে দেহ ভাসাইতেছে,—তেমনই আষাঢ়ের নবীন মেঘের মত ঘন-কৃষ্ণ-কেশরাশি শোভা পাইতেছে। মুখের সৌন্দর্যে শশধর হারি মানে। কিন্তু রমণী কি ঐ অকুশল পাপকার্যে লিপ্ত আছে?—যদি তাহা হয়, তবে কুসুমে কীট সংস্থানের ন্যায় অমন সুন্দর কামিনীকুসুমে পাপের আশ্রয়!

তারপরে মনে হইল,—এখন আমার কি করা কর্ত্তব্য? আমি উহাদের ঐ কার্য্য দেখিয়াছি, ইহাতে উহারা যে আমার উপরে অসন্তুষ্ট হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নতুবা আমাকে মারিবার জন্য—চিরজীবনের নিমিত্ত আমার মুখ বন্ধ করিয়া দিবার জন্য উহারা উদ্যত হইত না। খড়্গসিং আমাকে একটু অনুগ্রহ করে, তাই সে আমাকে রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু আর মুহূর্ত্তও আমাকে তথায় তিষ্ঠিতে দিলনা—যেরূপ ভাবে—যেরূপ ভঙ্গিতে আমাকে তথা হইতে তাড়াইয়া দিল। তাহাতে জ্ঞান হয়, সময় পাইলে আমাকে সংহার করিতে ক্রটী করিবে না। এক্ষণে এস্থান হইতে আমার পলায়ন করাই কর্ত্তব্য।

উদয়েশ্বর তাহাই স্থির করিল। সে, সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবার উদ্যোগ করিতেছিল,—ঠিক সেই সময় খড়্গসিং ও রোমাণী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের আগমনে উদয়েশ্বর ভীত হইল।

খড়্গসিং বলিল,—"উদয়েশ্বর, তুমি এখান হইতে বাহির হইয়াছিলে কেন?"

উদয়েশ্বর সত্য কথা বলিল। সে বলিল,—তোমরা বাহিরে কথা কহিতেছিলে, তাই শুনিয়া তোমাদের গতি-বিধির উপরে আমার সন্দেহ হয়, তাই তোমাদের পশ্চাদনুসরণ করিয়াছিলাম।"

খ। ঐ গুপ্তাবাসে প্রবেশ করিতে তোমার ভয় করে নাই?

উ। না।

খ। কেন?

উ। আমার ভয় খুব কম,—কেন জানেন? জীবনের উদ্দেশ্যহীন আমি, আমার কোন বিষয়ে ভয় সম্ভবে না। মরণ-বাঁচন যাহার সমসূত্রে গাঁথা, তাহার আবার ভয় কি!

খ। তুমি কি বাঁচিতে ইচ্ছুক নহ?

উ। এরূপ পরবাসে ঘৃণ্য জীবন যাপন করার চেয়ে মরণ কি মঙ্গল নয়?

খ। তোমার ভাগ্য-দেবতা শীঘ্রই সুপ্রসন্ন হবেন!

উ। কি করিয়া?

খ। আমরা আগামী কল্য প্রত্যুষেই আমাদের সর্দ্দারের উদ্ধারের জন্য গমন করিব।

উ। তাহাতে আমার কি?

খ। তোমাকেও আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবে।

উ। আমি গিয়া কি করিব?

খ। যে আমাদের সর্দ্দারকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেও আমাদের দেশীয় লোক। আমাদের দেশের অনেকেই এখন বিদ্রোহী কাজেই দেশীয় নূতন লোককে চাকর রাখিতে কেহ সম্মত নহে। তুমি বিদেশী—বাঙ্গালী, তুমি চাকর থাকিতে চাহিলে সহজে রাখিবে। তারপর সেই দুর্গের কারা-রক্ষীদিগকে কৌশলে বশীভূত করিয়া সর্দ্দারের নিকটে একটা পদার্থ দিবে, সে পদার্থের বলে তিনি উদ্ধার হইতে পারিবেন।

উ। তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পারিলে আমি সন্তুষ্ট হইব,—কিন্তু যে দ্রব্য দিবেন, তাহা যদি শীঘ্র তাঁহার হস্তে না দিতে পারি?

খ। যতদিন না দিতে পারিবে, ততদিন সেই স্থানে থাকিবে। কিন্তু এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিলে, তোমার জীবন আনন্দময় হইবে।

উ। কি প্রকারে?

খ। আমার সম্মুখে এই যে পরমা সৌন্দর্য্যময়ী যুবতীকে দেখিতেছ, ইনি তোমার পত্নী হইবেন।

উদয়েশ্বর যুবতীর মুখের দিকে চাহিল—যুবতী তার চঞ্চল সফরী-সদৃশ নয়নদ্বয় ঈষন্নিমিলিত করিয়া ঈষৎ সলজ্জ ভাবে এক কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল,—সৌন্দর্য্যের উপাসক উদয়েশ্বরের হৃদয়ে তরঙ্গ উঠিল।

উদয়েশ্বর খড়্গসিংয়ের মাথার দিকে চাহিয়া বলিল,—"আমি দরিদ্র" আমি পরদেশী—আমি কেমন করিয়া উঁহাকে প্রতিপালন করিব, কেমন করিয়া উঁহাকে আদর-যত্ন করিব?

যুবতীর রাঙ্গা অধরে ক্ষীণ হাসির তরঙ্গ বহিয়া গেল। খড়্গসিং বলিলেন,—"ইঁহাকে তুমি চেন না?"

উদয় সলজ্জভাবে বলিল,—"না"

খ। ইনি আমাদের সর্দ্দারের কন্যা। ইঁহার নাম রোমাণী। রোমাণীর বাহিরে যেমন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দর্শন করিতেছ, ইঁহার অন্তর ততোধিক সুন্দর। সঙ্গীত-বিদ্যা, কলাবিদ্যা ও ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনায় ইনি সুপণ্ডিতা। ইনি এখনও অবিবাহিতা,—তোমাকে দেখিয়া পতিত্বে বরণ করিবার জন্য অভিলাষিণী হইয়াছেন।

উ। আমার সৌভাগ্যের কথা,—কিন্তু উনি এ দীনহীন পথিকের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী কেন হইবেন?

খ। উঁহার পিতার উনি একমাত্র কন্যা,—বিপুল সম্পত্তির অধি-কারিণী, উনি তোমার অর্থের আশা করেন না,—বরং তুমি উঁহাকে

বিবাহ করিলে বর্ত্তমানে একজন বড়লোক হইবে, এবং ভবিষ্যতে আমাদের সর্দ্দার হইবে।

উ। আমি বিদেশী—আপনাদের দেশের হিসাবে আমি অকুলীন, এরূপ অবস্থায় উঁহার পিতা উঁহাকে আমার সহিত বিবাহে সম্মতি দিবেন কেন?

খ। আমাদের দেশে কন্যার ইচ্ছার উপরে বিবাহ নির্ভর করে। আমাদের দেশে জাতিভেদ নাই—তোমাদের দেশে আছে। বিশেষতঃ তুমি ব্রাহ্মণ,—ব্রাহ্মণ উচ্চশ্রেণীর জাতি, আমি তা জানি। ভাল, এ বিবাহে তোমার অমত নাই ত?

উ। আমার অমত কেন হইবে?

খ। তুমি ব্রাহ্মণ—আমাদের মেয়ে বিবাহ করিলে, তোমার জাতি যাইবে!

উ। যে সমাজ-চ্যুত—দেশ-চ্যুত—বান্ধব-চ্যুত—তার আবার জাতি যাইবার ভয় কি?

খ। তবে আর কোন কথা নেই। একাজ নিশ্চয়ই হইবে।

উ। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

খ। কর না,—তোমার সাক্ষাতে আমি কোন কথা গোপন করি না।

উ। যে বাড়ীতে আপনাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমি গিয়াছিলাম, ঐ বাড়ীটি কাহার?

খ। আমাদেরই।

উ। উহার নাম গুপ্তাবাস কেন?

খ। ঐ স্থানে আমাদের দেবতার উদ্দেশে জপ-যজ্ঞাদি করা হইয়া থাকে।

উ। কিন্তু আমি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিয়াছি।

খ। কি দেখিয়াছ ?

উ। একটা কুকুরকে ঊর্দ্ধপদে ঝুলাইয়া তাহার মুখনিঃসৃত লালা সংগ্রহ করা হইতেছিল।

খ। দেবতার উদ্দেশে ঐরূপে কুকুর বলি দিয়, সেই কুকুরের মুখ-নিঃসৃত লালার ফোটা করিয়া গেলে সর্ব্বকার্য সিদ্ধ হয়, আমাদের শাস্ত্রের এইরূপ আদেশ আছে।

উ। যদি তেমন থাকে, তবে তাহা ভুল।

খ। তোমাদের দেশেও কালীর সম্মুখে ছাগ বলি দিয়া বিজয়লাভ করিবার প্রথা আছে।

উ। তা আছে। কিন্তু তাহার রক্ত লইবার ব্যবস্থা নাই।

খ। আমি তোমাদের দেশে অনেক দিন ছিলাম, আমি অনেক বিষয় জানি,—বলির পরে রক্ত লইয়া দেবীকে দেওয়া হয়। তোমরা নয় ফোটা কর না, আমরা নয় ফোটা করি; এই প্রভেদ।

উ। হাঁ, তা বটে।

খ। তুমি তোমার স্বদেশ হইতে বিতাড়িত; আর কখন সে দেশে যাইতে পারিবে না, তোমার পক্ষে এই সুন্দরী রমণীরত্ন লাভ ও সর্দ্দারের জামাতা হইয়া অতুল ধনের অধীশ্বর এবং ভবিষ্যতে আমাদের সর্দ্দার হওয়া কি বাঞ্ছনীয় বিষয় নহে ?

উ। আপনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন,—আপনার কৃপাদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছি, ইহাই আমার সুখ সৌভাগ্য উদয়ের কারণ।

খ। যেখানে সর্দ্দার বন্দী আছেন, আগামী কল্য অতি প্রত্যুষেই আমরা তথায় গমন করিব, তুমিও প্রস্তুত হইও।

উ। আপনার আদিষ্ট কার্য্যে আমার অবহেলা নাই।

তখন খড়্গসিং রোমাণীকে ডাকিয়া গমনোদ্যোগী হইল। খড়্গসিং দাবা হইতে নামিল, রোমাণী তাহার মন্মথশরাসনতুল্য ভ্রূযুগল ঈষৎ কাঁপাইয়া আয়তচল-নীলোৎপল আঁখির তরল কটাক্ষের সলাজ চাহনীতে একবার উদয়েশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া খড়্গসিংয়ের পশ্চাদনুসরণ করিল। প্রথমে রূপ দেখিয়া উদয়েশ্বরের প্রাণের মধ্যে যে তরঙ্গ উঠিয়াছিল, এই তরল কটাক্ষে সেই তরঙ্গের উপর আবার তরঙ্গ উঠিল। উদয়েশ্বর বুঝিল, রোমাণীর সৌন্দর্য্য তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু জাহানারার মত রোমাণী তাহার হৃদয়ের প্রাণের ত্বক্ ভেদ করিতে পারে নাই।

উদয়েশ্বর উঠিয়া গৃহ-প্রাঙ্গণে গমন করিল। সে কি করিবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিল না। তখন আকাশের পশ্চিম দিকে চন্দ্রদেব বসিয়া কর বর্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার হৈম কিরণে পাহাড় জাগিয়া বসিয়াছিল, পার্ব্বত্য বৃক্ষের পত্রকুঞ্জ হইতে পাপিয়া তান ধরিয়াছিল। উদয়েশ্বর অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনেক প্রকার চিন্তা করিল, অবশেষে স্থির করিল, রোমাণী পবিত্র—খড়্গসিং পবিত্র, সর্দ্দারের মুক্তি কামনায় তাহারা দৈবকার্য্য করিতেছিল, অন্য অভিসন্ধি তাহাদের থাকিতে পারে না।

তখন তাহার মনে শান্তি আসিল, উৎসাহ জন্মিল, মনে করিল, রোমাণী সুন্দরী, তাহার পিতার অগাধ অর্থ আছে; ইহা লইয়া জীবনের দিন কয়টা কাটাইয়া দিতে পারিব। উদয়েশ্বর গৃহে গমন করিয়া শয়ন করিল, এবং কিয়ৎক্ষণ পরেই নিদ্রিত হইল।

পরদিন অতি প্রত্যুষে খড়্গসিং আসিয়া উদয়েশ্বরকে ডাকিয়া লইল। তারপরে তাহারা কয়েকজনে পার্ব্বত্যপথে চলিয়া গেল। রোমাণীও সে সঙ্গে গিয়াছিল,—আরও তিনজন যুবতী তাহাদের সঙ্গে ছিল।

পথে প্রায় তাহাদের তিন দিন অতিবাহিত হইয়াছিল। এই তিন দিন রোমাণী উদয়েশ্বরকে মুগ্ধ করিবার জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ উদয়েশ্বরও সুন্দরী রমণীর মোহের জালে জড়াইয়া পড়িতেছিল।

ষড়্‌বিংশতি পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মরাজ্যের অন্তর্গত নেগ্রেইস নামক দ্বীপ একটি মনোহর বন্দর। এখানে অনেক লোকের বসতি ও উপনিবেশ। এই দ্বীপে ব্যবসায় উপলক্ষে অনেক ধনী ও বিদেশীগণ বড় বড় কুঠী প্রস্তুত করিয়া বসবাস করিত। ব্রহ্মাধিপতির নিয়োজিত একজন সর্দ্দার এখানে অবস্থান করিয়া শাসন ও রাজস্ব আদায় আদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

পূর্ব্বে পাঞ্জাবসিং সর্দ্দারপদে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি অত্যন্ত অত্যাচারী ও তাঁহার দলস্থ লোক সকল সাধারণের নিতান্ত অপ্রীতি-ভাজন হইয়া উঠিয়াছিল। পাঞ্জাসিং, তাহার পুত্র ও কন্যা, নিজেদের উন্নতি ও স্বার্থ সাধন উদ্দেশে দেশের লোককে নানাবিধ উপায়ে বিষ প্রদানে নিহত করিতে আরম্ভ করে। তাহারা পাহাড় হইতে বড় বড় কুকুর ধৃত করিয়া আনাইয়া কুকুরগুলিকে সেঁকো বিষ খাওয়াইয়া উন্মত্ত করিত, তৎপরে তাহাদের মুখনিঃসৃত লালা-বিষ ভোজ্য দ্রব্যের সহিত গণ্যমান ব্যক্তিগণকে গোপনে ভোজন করাইত, তাহাতে দুই এক মাসের মধ্যেই তাহাদের জলাতঙ্ক রোগ জন্মিত, এবং মৃত্যুমুখে পতিত হইত। তদ্ভিন্ন অনেককে মৃত্যুকারী হলাহলও সেবন করাইয়া মুহূর্ত্তে মারিয়া ফেলিত। তাহাদের অত্যাচারে যখন দেশ অবসন্ন হইয়া পড়িল, তখন আর এক দলের অভ্যুত্থান হইল। তাহাদের সর্দ্দার জয়সিং ব্রহ্মাধিপতির সম্মতি লইয়া সর্দ্দারীপদ গ্রহণ করে ও পাঞ্জাবসিংকে আবদ্ধ করিয়া দুর্গমধ্যে রাখিয়া দেয়। পাঞ্জা-সিংয়ের দলবল পলায়ন করিয়া পর্ব্বতশৃঙ্গে আশ্রয় লয়। কিন্তু তাহাদের অত্যাচার-স্রোত একেবারে রুদ্ধ হইয়াছিল না, গোপনে

আসিয়া তাহারা তাহাদের এক নব গুপ্তভবনে আশ্রয় লইত, এবং বিবিধ কৌশলে—বিবিধ ছলে, সাধারণ লোকের মধ্যে মিশিয়া যাহাদিগকে শত্রু বলিয়া জানে, তাহাদিগকে নানাবিধ প্রকারের বিষ ভোজন করাইয়া অন্তর্ধান হয়,—বিষভুক্ত জনেরা অল্প দিনের মধ্যেই কালগ্রাসে পতিত হইত। জয়সিং বিশেষরূপে সতর্ক হইয়া এই সকল অত্যাচারের প্রশমন কামনায় সচেষ্ট ছিলেন. কিন্তু সফলকাম হইতে পারিতেছিলেন না।

রোমাণীর দেহে অসীম সৌন্দর্য্য ছিল,—সেই সৌন্দর্য্যে অনেক লোক মুগ্ধ হইয়া পড়িত। কিন্তু এমন কোন মহাপাতক জগতে নাই, যাহা রোমাণী কর্ত্তৃক সম্পাদিত না হইত। রোমাণী তাহার শরীর বিক্রয় করিতে মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিত না। যে ইন্দ্রিয়ের দাসী—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি রিপুসকল পূর্ণরূপে তাহার দেহে বিরাজিত ;—তাহার অসাধ্য কার্য্য জগতে নাই ; তেমন কুটিলা রমণীর জোড়া মেলা ভার। খড়্গসিং ভীষণ পিশাচপ্রকৃতির লোক। তাহাদের দলস্থ সকলেই নরহন্তা,—চুরি, ছলনা, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি কার্য্য করিতে কেহই ইতস্ততঃ করিত না। এক একজন এক একটি পিশাচের অবতার।

এক দিন সন্ধ্যার পরে তাহারা নেগ্রেইসের পূর্ব্বপল্লীর এক সুন্দর বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। সে দিন সেখানে বিশ্রাম করিয়া তৎপর দিবস সকালে খড়্গসিং উদয়েশ্বরকে ডাকিয়া বলিল,—"এই নগরের মধ্যভাগে জয়সিংহের দুর্গ আছে, তুমি তথায় গমন কর। সেখানে গিয়া কৌশলে চাকর থাকিবার জন্য আবেদন করিবে,—কিন্তু তুমি যে, কালা ও বোবা, তাহাই জানাইবে। তাহা হইলে সহজে কার্য্যোদ্ধার হইবে।—সাবধান! জয়সিং বড়

সুচতুর ও দুর্দ্দান্ত লোক। সতর্কতার সহিত কার্য্যোদ্ধার করিবে।”

উদয়েশ্বর জিজ্ঞাসা করিল,—“জয়সিং কি তোমাদের এই ভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকে ?”

খ। হাঁ, আমাদের দেশের সকলেই এই ভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকে।

উ। জয়সিং কি এদেশের রাজা ?

খ। না,—সেও একদলের সর্দ্দার। বর্ম্মাদিপতির অধীনস্থ এক-জন করিয়া সর্দ্দার এইস্থানে থাকে,—জয়সিং কৌশল করিয়া তাঁহার নিকটে আমাদের সর্দ্দারের নামে অনেক কলঙ্ক রটাইয়া নিজে সর্দ্দার হইয়া আসিয়াছে, এবং আমাদের সর্দ্দারকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে।

উ। আপনাদের সর্দ্দারের নাম কি ?

খ। তাঁর নাম পাঙ্গাসিং।

উ। আমি এখনই যাইব কি ?

খ। হাঁ। এই কাষ্ঠের কৌটাটি লও—কোন প্রকারে সর্দ্দারের হস্তে পঁহুছাইয়া দিতে পারিলেই তিনি মুক্ত হইয়া আসিতে পারিবেন আবার বলিয়া দিতেছি যে, তুমি খুব সতর্ক ও সাবধানতার সহিত কার্য্য করিবে—তোমার বুদ্ধি ও কৌশলের উপরেই সর্দ্দারের মুক্তি এবং তোমার উন্নতি নির্ভর করিতেছে।

উদয়েশ্বর একখানা ছিন্ন ও মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া, মস্তকের চুলগুলিতে ধূলি মাখাইয়া, একবার রাস্তায় গড়াগড়ি দিয়া সর্ব্বাঙ্গ ধূলি-ধূসরিত করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে জয়সিংহের দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিল।

পথে যাইতে যাইতে তাহার মনে হইল, খড়্গসিং কৌটায় কি

দ্রব্য প্রদান করিয়াছে? বোধহয় বিষ হইতে পারে। বোধহয়, খড়্গাসিংয়ের উদ্দেশ্য সর্দ্দার আমার নিকটে এই বিষ প্রাপ্ত হইয়া প্রহরীগণকে পান করাইবে, এবং তাহারা ঝটিতি মৃত্যুমুখে পতিত হইবে,—তখন সে বাহির হইয়া চলিয়া আসিবে। বড়ই ভীষণ কথা! উদয়েশ্বরের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সে মনে মনে বলিল,—"তাহা করিতে পারিব না। নিজের সুখের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য নরহত্যা যুক্তিসঙ্গত নহে।"

পাশের নর্দ্দামার ধারে একটা কুকুর দাঁড়াইয়া পথিক-পরিত্যক্ত অর্দ্ধভুক্ত একটা পক্কফল ভোজন করিতেছিল—পরীক্ষার সুযোগ বুঝিয়া উদয়েশ্বর কাষ্ঠকৌটা খুলিয়া তাহার একবিন্দু পদার্থ সেই কুকুরের আহারীয়ের উপর ফেলিয়া দিল। কুকুরটা উদয়েশ্বরের আগমনে একটু সরিয়া গিয়া লেলিহান রসনায় সাগ্রহদৃষ্টিতে সেই আহারীয়ের পানে চাহিতেছিল,—উদয়েশ্বর তাহার উপরে কৌটাস্থ পদার্থ একটু ঢালিয়া দিয়া সরিয়া আসিবামাত্র বর্দ্ধিত-আগ্রহ কুকুর আসিয়া আবার সেই ফল ভোজন করিতে লাগিল। উদয়েশ্বর একটু দূরে দাঁড়াইয়া রহিল। অর্দ্ধদণ্ড অতীত হইল না,—তীব্র হলাহলে কুকুরের আসন্নকাল উপস্থিত হইল, সে একবার পা ছুড়িয়া—একবার অস্ফুটস্বরে ডাকিয়া নর্দ্দমার নিকটে ঢলিয়া পড়িল। উদয়েশ্বর চমকিয়া উঠিয়া হাতের কৌটা মাটির মধ্যে প্রোথিত করিয়া ফেলিলেন। তারপরে উঠিয়া যাইতেছিলেন,—এমন সময় পশ্চাদ্দিক হইতে কিঞ্চিৎ পুরুষ স্বরে উচ্চারিত হইল,—"বিশ্বাসঘাতকতা!"

উদয়েশ্বর চমকিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন,—রোমাণী! রোমাণীর প্রচ্ছন্ন বেশ। বেশান্তরে সুন্দরীর সৌন্দর্য্য আরও ফুটিয়া পড়িতেছিল।

অপ্রতিভ স্বরে উদয়েশ্বর বলিলেন,—"না, না, আমি তোমাদের নিকট অবিশ্বাসী হইব না।"

ধাঁ করিয়া ঘুরিয়া সম্মুখের দিকে আসিয়া রোমাণী বলিল,—"তোমাকে ভাল লোক বলিয়াই হৃদয়ে স্থাপন করিয়াছি। কিন্তু তুমি কি আমাকে অবশেষে কাঁদাইবে? তুমি কি আমায় প্রতারণা করিবে?"

উ। আমিও তোমাতে অনুরক্ত হইয়াছি—তুমি খুব সুন্দরী। আমি তোমাকে পাইবার জন্য সর্ব্ব প্রকারেই যত্ন করিতেছি। আমি তোমার সহিত কখনই প্রতারণা করিব না।

রো। সে শুধু মুখের কথা। আমার পিতাকে উদ্ধার করা বর্ত্তমানে আমার প্রধান কার্য্য। পিতা আমার শত্রুর হস্তে বন্দী, আমি কখনই এ সময়ে বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারিব না। বিশেষতঃ পিতার অনুমতি না লইয়াই বা কি প্রকারে বিবাহ করি? আরও তুমি বিদেশী,—বিদেশীর সহিত কন্যার বিবাহে সম্মতি দানে কোন দেশের পিতাই সহজে স্বীকৃত হইতে চাহেন না। তুমি যদি তাঁহাকে মুক্ত করিতে পারিতে—তবে সেই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপে খড়্গসিং আমাদের এই বিবাহে সহজেই পিতার সম্মতি গ্রহণ করিতে পারিতেন।

উ। আমি তোমার পিতাকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিব।

রো। মিছে কথা।

উ। কেন?

রো। যদি তাহা করিতে, তবে আমাদের দেয় পদার্থ অমন করিয়া নষ্ট করিতে না।

উ। আমি জ্ঞানতঃ নরহত্যার সহায় হইতে পারিব না।

রো। ছি, তুমি কি ভ্রান্ত! ঐ কার্য্য না করিতে পারিলে কি প্রকারে তাঁহার উদ্ধার হইবে?

উ। যাহাতে হয়, আমি তাহা করিব।

রো। মিছে আশা।

উ। সে ভার আমার উপরে;—অল্প দিনের মধ্যেই তোমার পিতাকে লইয়া তোমাদের সহিত মিলিত হইব।

রোমাণী তাহার কথায় সন্তুষ্ট হইল না। উদয়েশ্বর কি করে, কোথায় যায়,—তাহার সন্ধান লইবার জন্যই সে প্রচ্ছন্ন বেশে উদয়েশ্বরের দূরে দূরে—পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছিল। সে যখন দেখিতে পাইল, বিষের পরীক্ষা করিয়া উদয়েশ্বর তাহা মৃত্তিকাগহ্বরে প্রোথিত করিল, তখন বুঝিল, উদয়েশ্বর বিষের ব্যাপার জানিতে পারিয়াছে, এবং সে উহাতে ঘৃণা করিয়াছে। তখন ভাবিল, হয়ত সে আর তাহার পিতার উদ্ধারার্থে গমন করিবে না,—তাই সে তাহার মহাস্ত্র—রূপের প্রলোভন প্রচার করিয়া দিল। তাহার অপ্সররূপের প্রলোভনে মুগ্ধ না হয়, এমন পুরুষ বিরল।

উদয়েশ্বর চলিয়া গেল,—রোমাণী আবার দূরে দূরে অলক্ষ্যে তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল।

জয়সিংয়ের দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া উদয়েশ্বর অঙ্গ-ভঙ্গি দ্বারা প্রহরীদিগকে জানাইল, সে কালা ও বোবা। সে এই বাড়ীতে ভৃত্য থাকিতে অভিলাষী।

একজন প্রহরী তাহাকে সঙ্গে করিয়া যেখানে বসিয়া জয়সিংহ তাহার কয়জন সহকারীর সহিত গল্পগুজব করিতেছিল, তথায় গিয়া উপস্থিত হইল। জয়সিং প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিলে—"এ কে?"

প্রহরী অভিবাদন করিয়া বলিল,—"ইহার পরিচয় জানি না। এ ব্যক্তি কালা ও বোবা। ইহার অবস্থা ও ভঙ্গ-ভঙ্গীতে বোধ হইতেছে, এ চাকর থাকিতে অভিলাষী।

জয়সিং উদয়েশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"তুই কি বাঙ্গালী? চেহারা দেখিয়া তাহাই জ্ঞান হইতেছে।"

উদয়েশ্বরের কোন কথাই নাই। সে যে, সে কথা শুনিতে পাইয়াছে, এমনও বোধ হইল না। জয়সিং পার্শ্বের সহকারীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"লোকটা বাঙ্গালীই বটে, কিন্তু নিরেট কালা ও বোবা!"

স। ঠিক তাই। বোধ হয়, কোন বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর সঙ্গে এদেশে আসিয়াছিল, তাহারা দেশে চলিয়া গিয়াছে—ও তাই নিরাশ্রয় হইয়া চাকুরীর জন্য আসিয়াছে।

জ। বাঙ্গালী চাকর বিশ্বাসী—তাতে—লোকটা কালা ও বোবা। এখন যেরূপ সময় চলিতেছে,—তাতে সর্ব্বদা আমাদের গূঢ় বিষয়ে পরামর্শ করিতে হয়; এ অবস্থায় এইরূপ একটা চাকর থাকিলে বড় সুবিধা হইবে। এই আমার খাস চাকর থাকিবে। এ আমাদের নিকটে উপস্থিত থাকিলেও আমরা স্বচ্ছন্দে গুপ্ত বিষয়ে পরামর্শ করিতে পারিব।

স। হাঁ। সে বিষয়ে বিশেষ সুবিধাই হইবে। তবে কাজ কর্ম্ম করিতে পারিলে হয়।

জ। না না। লোকটা বেশ বলিষ্ঠ আছে—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুগঠিত, কাজের লোক হইবে।

স। কিন্তু যাহা বলা যাইবে, তাহা বুঝিতে পারিবে না।

জ। আমি অঙ্গভঙ্গি করিয়া উহাকে সব কথা বুঝাইয়া দিব। আমি সে বিষয় মজবুত আছি।

তদনন্তর জয়সিং অঙ্গভঙ্গি করিয়া উদয়েশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুই কি বাঙ্গালী?"

উদয়েশ্বর মস্তক সঞ্চালন পূর্ব্বক জানাইল "হাঁ।"

জয়সিং পুনরপি অঙ্গভঙ্গি সহকারে জিজ্ঞাসা করিল,—"কাজ করিবে?"

উদয়েশ্বর ও মস্তক সঞ্চালন করিয়া জানাইল—"হাঁ।"

জয়সিং গর্ব্বের হাসি হাসিয়া পার্শ্বস্থ সহকারীকে বলিল,—"দেখলে ভায়া, এ বিষয়ে আমার ক্ষমতা?"

সহকারী জয়সিংয়ের এই কার্য্যদক্ষতার প্রশংসা করিয়া ধন্যবাদ প্রদান করিল,—এবং জয়সিংয়ের আদেশে উদয়েশ্বর তাহার ভৃত্যপদে নিযুক্ত হইল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

উদয়েশ্বর জয়সিংহের দুর্গে প্রবেশ করিল দেখিয়া, রোমাণী ফিরিয়া বাসায় গেল। খড়্গাসিংয়ের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কি বিবেচনা কর, যে, উদয়েশ্বর আমাদের কাজ করিতে জয়সিংয়ের দুর্গে প্রবেশ করিয়াছে?"

খ। হাঁ, সে বিশ্বাস করি। আমি আরও বিশ্বাস করি যে, উদয়েশ্বর সর্দ্দারকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসিবে,—সে ভারি চতুর, ভারি সাহসী।

রো। কিন্তু বিষের কৌটা ফেলিয়া দিল কেন?

খ। বাঙ্গালীরা নরহত্যা করিতে নিতান্ত নারাজ। ঐ সকল কাজ উহারা মহাপাপ বলিয়া মনে করে।

রো। তবে কি করিয়া সে বাবার উদ্ধার করিবে?

খ। কি করিয়া করিবে তাহা সেই স্থির করিয়া লইবে। তবে নিশ্চয় বোধ হইতেছে, সে সর্দ্দারকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসিবে।

রো। আমি ছলে, বলে, কৌশলে জয়সিংহের সহকারীদের মধ্যে মিশিয়া তাহাদিগকে কুকুরের লালা সেবন করাইতেছি,—প্রায় দশ জনকে খাওয়াইয়াছি—আরও চেষ্টা করিতেছি।

খ। কি প্রকারে কি করিতেছ? সাবধান! যদি কেহ একটু মাত্র সন্দেহ করে যে, তুমি রোমাণী তাহা হইলে তোমাকে আবদ্ধ করিয়া ফেলিবে।

রো। তা আমি ভালরূপেই জানি,—কিন্তু তুমি কি জাননা যে, আমার হাতের এই আংটিতে মিস্ সাপের বিষ পোরা আছে, এবং

আংটির গায়ে সূচ্যগ্র তীক্ষ্ণ অতি ক্ষুদ্র শলাকা আছে,—তেমন তেমন দেখিলে বিপক্ষের শরীরের যে কোন স্থানে আংটিটি টানিয়া লইলেই মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার দফা রফা হইবে। আরও এক কথা,—আমি বাজারের বেশ্যারূপে কাহাকেও আহ্বান করি, কাহাকে বা ভিখারিণীর বেশে কৃপা করি, কাহাকেও বড়লোকের ঘরণী বেশে দেখা দিয়া, রূপের আহ্বানে মুগ্ধ করিয়া বিষ দান করিতেছি,—সে স্থলে, সহজে তাঁহাদের মনে সন্দেহ হওয়া কঠিন।

খ। তোমার বুদ্ধি ও সাহসকে ধন্যবাদ।

রো। জেল্লার যে জয়সিংহের জামতার বাড়ী প্রবেশ করিবার কথা ছিল?

খ। সে আ'জ রাত্রে যাইবে।

রো। জয়সিংহের জামাতা ভারি দুঃসাহসিক ও বুদ্ধিমান,—সেই লোকটাকে নিহত করিতে পারিলে, জয়সিংহের দক্ষিণ হস্ত কাটা পড়ে। জয়সিংহের যা কিছু বিদ্যা বুদ্ধি—সাহস, বল, ছলনা, কৌশল; তার জামাইকে লইয়া, সেইটাকে নিহত করিতে পারিলে জয়সিংহের বিষদন্ত ভাঙ্গিয়া যায়।

খ। জেল্লা আ'জ রাত্রে যাইবে বলিয়াছে,—একবার তাহাকে এখানে ডাকাও।

রোমাণী একজন দাসীকে বলিল,—"জেল্লাসিংকে শীঘ্র ডাকিয়া আন।"

দাসী চলিয়া গেল, কিয়ৎক্ষণপরে জেল্লাসিং আসিয়া উপস্থিত হইল। রোমাণী তাহাকে পাশের আসনে বসিতে বলিল। জেল্লা আসন পরিগ্রহ করিলে, রোমাণী বলিল—"জয়সিংহের জামাতার ঘরে যাইয়া তাহাকে হত্যা করিয়া আসিবে, কথা ছিল,—কবে যাইবে স্থির করিয়াছ?"

জেল্লাসিং বলিল,—সে কার্য্যের ভার আঙ্গসিং লইয়াছে, আ'জ রাত্রেই সে যাইবে ?”

রোমাণী বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে জেল্লার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—“কেন তুমি ?”

জে। আমার চেয়ে আঙ্গসিং একার্য্য সুবিধায় পারিবে ; সে তাহার ঘর দরোজার ভালরূপ সন্ধান জানে,—কারণ যে বাড়ীতে জয়সিংহের জামাতা অবস্থান করিতেছে, আগে সেই বাড়াতে আঙ্গসিং ছিল।

সুবিধা বুঝিয়া রোমাণী তাহাতে সম্মতি দিয়া বলিল,—“যাহাতে নিশ্চয় সে আজি রাত্রে সেখানে যায়, তুমি তাহা করিও।

জেল্লা তাহাতে সম্মতি জানাইয়া, উঠিয়া চলিয়া গেল। রোমাণী ও গঙ্গাসিং তখন আরও বহুবিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের কথা নরহত্যা, গুপ্ত সন্ধান ও বিষপ্রয়োগের বিষয় লইয়াই হইতেছিল।

সেই দিন সন্ধ্যার পরে যখন ধরাতল রজনীর গাঢ় অন্ধকারে তমোমলিন হইয়া উঠিল, তখন একখানি দ্বিধার তীক্ষ্ণ ছোরা হস্তে লইয়া, অতি ধীরে ধীরে, অতি সন্তর্পণে আঙ্গসিং জয়সিংহের জামাতার ভবনাভিমুখে গমন করিল,—তাহার রুদ্রমূর্ত্তি—নরহত্যার উদ্যমের উষ্ণশ্বাস যেন অন্ধকারাপ্লুত ধরণীবক্ষে ভীতি বিকাশ করিতেছিল। সে ধীরে ধীরে তাহার গন্তব্য বাড়ীর পশ্চাদ্দিকের দরোজার নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। বাটির প্রাচীর-গাত্রে দেহ-সংলগ্ন করিয়া রুদ্ধনিশ্বাসে অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিল। বাটীর একজন দাসী, কি একটা কার্য্যে পশ্চাদ্দিকের দ্বার খুলিয়া চলিয়া গেল,—সেই অবকাশে যমদূতরূপে আঙ্গসিং অতি সন্তর্পণে অথচ দ্রুতপদে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটা অন্ধকারময় নিভৃতস্থলে লুকাইয়া থাকিল। ক্রমে রাত্রি

অধিক হইল,—বাটীর সকলে আহারাদি করিয়া বিশ্রামার্থ শয্যা গ্রহণ করিল,—ক্রমে সকলেই নিদ্রার নীরব শান্তিময় ক্রোড়ে দেহ ঢালিয়া দিল,—সমস্ত বাড়ীটি নীরব নিস্তব্ধ হইল।

সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কালের করাল দূতের ন্যায়, আঙ্গসিং সমস্ত প্রকোষ্ঠে, প্রকোষ্ঠে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কোন্ গৃহে জয়সিংহের জামাতা নিদ্রিত আছেন, আঙ্গসিং তাহারই অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল।

এক সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় দুইটি রমণী নিদ্রা যাইতেছিল। রমণী দুইজনই যুবতী এবং অপ্সরাকল্প সুন্দরী; আঙ্গসিং সে রূপ দেখিয়া চমকিয়া উঠিল,—তাহার প্রাণের তার বড় বেসুরা বাজিয়া গেল। সে একবার সেই ফুল্লারবিন্দ রমণী-গণ্ড স্পর্শ না করিয়া ফিরিতে পারিল না,—ধীরে ধীরে শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া পড়িল, ধীরে ধীরে একটি যুবতীর গাত্র স্পর্শ করিল।

আঙ্গের কঠোর করস্পর্শে রমণী জাগিয়া পড়িল,—অপরা ঘুমাইতেছিল। যুবতী জাগিয়া মস্তকোত্তলন করিল, সম্মুখে যমদূতের ন্যায় মূর্ত্তি দেখিয়া কাঁপিয়া উঠিল,—সে চীৎকার করিতে যাইতেছিল। মুহূর্ত্তে—চক্ষুর নিমেষ না ফেলিতে নিষ্ঠুর আঙ্গসিং সিংহবিক্রমে সেই কুসুমকোমল রমণী-বক্ষে তাহার করধৃত তীক্ষ্ণ ছোরা আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল, বালক-নখরবিচ্ছিন্ন পুষ্পমালার ন্যায়, রমণী শয্যার উপরে লুটাইয়া পড়িল। রমণীর মৃতদেহের সঙ্কোচ-বিকোচন-স্পর্শে নিদ্রিতা যুবতীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল,—সে যেমন ফিরিতেছিল, নিষ্ঠুর কৃতান্তোপম আঙ্গসিং, অমনি তাহারও অমর-বাঞ্ছিত সুন্দর বক্ষে ছুরিকা-বিদ্ধ করিয়া দিল,—দুইটি সৌন্দর্য্য-প্রতিমা-দেহ রক্তাক্ত কলেবরে শয্যায় গড়াগড়ি দিতে লাগিল,—শ্বেতশয্যা রক্তে ভাসিয়া গেল।

যুবতীদ্বয় জয়সিংহের দৌহিত্রী,—উভয়ে দুই তিন বৎসরের ছোট বড়, উভয়েই যৌবনসীমায় পঁহুছিয়াছিল,—কিন্তু নরহন্তার বিষম ছোরা তাহাদের জীবনের শেষ করিয়া দিল!

আঙ্গের পরিধেয় বস্ত্র এবং কলুষিত হস্ত রক্ত-রঞ্জিত হইয়া গিয়াছিল। নারী-রক্ত-রঞ্জিত হস্তে, নারী-রক্ত-রঞ্জিত ছোরা লইয়া আঙ্গসিং সে প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া পড়িল,—তৎপরে, প্রলয়ের ব্যাধির ন্যায় সে জয়সিংহের জামাতাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া, কক্ষে কক্ষে ফিরিতে লাগিল।

একটা কক্ষে আলো জ্বলিতেছিল,—দ্বারমুক্ত, গৃহের পার্শ্বে অন্ধকারে দেহ লুকাইয়া আঙ্গসিং গিয়া দাঁড়াইল, এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল—সেই গৃহমধ্যে জয়সিংহের জামাতা শয্যার উপরে বসিয়া আছে, নিম্নের একটা শয্যার উপরে তাঁহার পত্নী রোরুদ্যমান শিশুপুত্রকে সান্ত্বনা করিতেছিলেন। নিষ্ঠুরহৃদয় আঙ্গসিং আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া, সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় ছোরা উত্তোলন পূর্ব্বক ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিয়া পড়িয়া জয়সিংহের জামাতার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল,—এবং সেই ভীষণ ছোরা তাঁহার বক্ষে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল,—আর একটি নিশ্বাস পরিত্যাগ না করিতেই তাঁহার প্রাণবায়ু বিনির্গত হইয়া গেল,—মুহূর্ত্ত সময়ে নিমেষ ফেলিতে না ফেলিতে এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়া গেল। জয়সিংহের কন্যা কি করিবে, কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না—হত্যাকার্য্য সমাধা হইবামাত্র তিনি চীৎকার করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দানে আঙ্গসিং তাঁহাকেও গিয়া চাপিয়া ধরিল। রমণীর কথা কহিবার শক্তি রহিত হইয়া গেল। তিনি আসন্ন মৃত্যু বুঝিতে পারিয়া, অতি করুণ নয়নে আঙ্গসিংহের মুখের দিকে চাহিয়া ক্রোড়

বিচ্যুত শিশুকে দেখাইয়া দিলেন,—বুঝি বলিলেন, "এই ক্ষুদ্রশিশুকে মারিও না, আমার অন্তিম অনুরোধ।" কিন্তু পাপাত্মা আঙ্গ তাঁহাকে হত্যা করিবার পূর্ব্বেই এক পদাঘাতে শিশুটিকে মারিয়া ফেলিল, এবং তারপর তাঁহাকেও শমন-সদনে প্রেরণ করিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

রাত্রি অবসান কালে আঙ্গসিং তাহাদের গুপ্তবাসে উপস্থিত হইল,—রোমাণী তখনও জাগিয়া বসিয়াছিল, আঙ্গসিংয়ের ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ও রক্ত-রঞ্জিত বস্ত্রাদি দেখিয়া ভীত না হইয়া আনন্দিত হইল। উৎফুল্ল হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিল,—"কার্য্য সমাধা হইয়াছে ?"

নরহন্তা আঙ্গসিং স্তব্ধ কলুষ শ্বাস ধরাবক্ষে পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—"হাঁ।"

রোমাণী তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহাকে বস্ত্রাদি প্রদান করিল। সে তাহা পরিধান করিলে, রোমাণী নিজহস্তে তাহার গাত্রস্থ নররক্ত ধৌত করিয়া দিয়া, নরহত্যার পুরস্কার স্বরূপে তাহার মুখে এক শীতল চুম্বন প্রদান করিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

পর দিবস প্রভাতে সকলেই জয়সিংয়ের জামাতা ও তদীয় পত্নী, কন্যা এবং পুত্রের নিষ্ঠুর হত্যার বিষয় অবগত হইতে পারিল। তখনই জয়সিংয়ের নিকট এই নিষ্ঠুর ও শোকাবহ সংবাদ প্রেরিত হইল। তিনি সংবাদ শ্রুত হইয়া তখনই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল,—সর্ব্বত্র শোক ও বিস্ময়ের হাহাকার ঘোষিত হইল। সর্ব্বত্র বিস্ময়, বিভীষিকা ও শোকের দৃশ্য লোকের সম্মুখে সম্মুখে ঘুরিতে লাগিল। গৃহ হইতে কোন দ্রব্য অপহৃত হয় নাই, ধন রত্ন সকলই যথাস্থানে রহিয়াছে;—কাজেই কাহারও বুঝিতে বাকি থাকিল না যে, এই হত্যাকাণ্ড পাঞ্জাসিংয়ের নিষ্ঠুর অনুচরগণের ষড়যন্ত্রে সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে।

জয়সিং সহরকোতোয়ালের উপরে বিশেষরূপ আদেশ করিলেন যে, গোয়েন্দাদ্বারা সর্ব্বদা সন্ধান কর যে, পাঞ্জাসিংয়ের অনুচরগণের কেহ এই সহরে অবস্থান করিতেছে কি না। সন্ধান পাইলে বা সন্দেহ হইলে তদ্দণ্ডেই ধৃত করা হয়। আমার বিশ্বাস, পিশাচেরা সহরে মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমার সহকারী বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে; অধিকাংশ লোক জলাতঙ্করোগে মরিতেছে,—কুকুরের বিষ প্রয়োগ, পাঞ্জাসিংয়ের দলের লোকের এক মহাস্ত্র। নিশ্চয়ই তাহার দলের লোকেরা ছদ্মবেশে সেই বিষ প্রয়োগ করিতেছে। সত্বরেই যদি তাহাদিগকে সন্ধান করিয়া ধৃত করিতে না পার, তোমাকে নিশ্চয়ই পদচ্যুত হইতে হইবে, জানিও।

সহরকোতোয়াল পুচ্ছবিমর্দ্দিত সুপ্তসিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠি-

লেন। তিনি তাঁহার কার্য্যালয়ে গিয়া, উচ্চশ্রেণীর কর্ম্মচারী হইতে নিম্ন শ্রেণীয় পাহারাওয়ালাগণ পর্য্যন্ত একত্র করিয়া পাঞ্জাসিংয়ের দলস্থ পিশাচ পিশাচীগণের অনুসন্ধান ও ধৃত করিতে বিশেষ ভাবে আদেশ প্রদান করিলেন। তারপরে, বলিয়া দিলেন, নূতন লোক, নূতন দোকানদার, নূতন ব্যবসাদার, নূতন বারবনিতা বা নূতন গৃহস্থ দেখিলেই গোপনে তাহার বিশেষ সন্ধান লইতে হইবে, পাঞ্জাসিংয়ের দলস্থ পিশাচ পিশাচী-গণ ঐরূপ ছদ্মবেশেই ঘুরিয়া থাকে। পুলাসকর্ম্মচারীগণ নবোৎসাহে অনুসন্ধান-কার্য্যে পরিলিপ্ত হইল।

সুচতুর খড়্গসিং সে সংবাদ প্রাপ্ত হইল। রোমাণীকে সে সংবাদ জানাইল, তারপরে বলিল,—"দিন কতক আমরা পাহাড়ে চলিয়া যাই। এখানে থাকিলে, নিশ্চয়ই ধরা পড়িতে হইবে।"

রোমাণী অস্বীকৃত হইল; বলিল;—"উদয়েশ্বর যদি বাবাকে মুক্ত করিয়া লইয়া আসে, তাহারা কোথায় যাইবে।"

খ। সর্দ্দারের ভাবনা ভাবিতে হইবে না,—তিনি যদি মুক্ত হইতে পারেন, তবে আমাদের আড্ডায় সহজেই পঁহুছিতে পারিবেন।

রো। আমাদের আড্ডা কোথায় তাহা তিনি জানেন না।

খ। উদয়েশ্বর জানে।

রোমাণী অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিল, তারপরে স্বীকৃত হইল। সেই দিবস রাত্রেই তাহারা নেগ্রেইস পরিত্যাগ করিয়া, তাহাদের আশ্রম-পর্ব্বতাভিমুখে চলিয়া গিয়াছিল।

উদয়েশ্বর কালা ও বোবা ভৃত্যরূপে জয়সিংহের বাড়ীতে অবস্থিতি করিতেছিল। তাহাকে কালা ও বোবা বলিয়াই সকলে স্থির করিয়াছে,—কাজেই তাহার সম্মুখে কেহ কোন কথা গোপন করিত না। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে কার্য্যদক্ষতায় সে জয়সিংয়ের অনুগ্রহ

লাভ করিয়াছিল।—জয়সিং তাহাকে স্নেহকরুণার চক্ষে দর্শন করিত।

জয়সিং পাঞ্জাসিংকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু সাধারণ বন্দীর সহিত তাহাকে রাখে নাই—বাড়ীর এক অতি পুরাতন, এবং অব্যবহার্য্য মহল্যার এক অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল,—সেখানে প্রহরীগণের গমনাগমন নিষিদ্ধ; সেই অন্ধকার গৃহ মধ্যে পাঞ্জাসিংয়ের পদদ্বয় সুদৃঢ় লৌহ-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখা হইত। জয়সিং কাহাকেও বিশ্বাস করিত না, হয় সে নিজে, নয় তাহার ছোট কন্যা চন্দ্রা, সেই অন্ধকারময় গৃহে গিয়া পাঞ্জাসিংয়ের আহার্য্য দিয়া আসিত। জয়সিং কনিষ্ঠ কন্যা চন্দ্রাকে বড় ভালবাসিত,—চন্দ্রা সুন্দরী চন্দ্রা মধুরভাষিণী, চন্দ্রা বুদ্ধিমতী।

ক্রমে উদয়েশ্বরের উপরে বন্দী পাঞ্জাসিংয়ের আহারান্তের স্থানাদি পরিষ্কারের ভার অর্পিত হইল। হয় জয়সিং, নয় তাঁহার কন্যা আহার্য্য প্রদান করিয়া আসিত,—পাঞ্জাসিংয়ের আহার সমাপ্ত হইলে, উদয়েশ্বর অথবা জয়সিংয়ের কালা ও বোবা ভৃত্য গিয়া তাহা মুক্ত করিয়া দিয়া আসিতে আরম্ভ করিল।

একদা চন্দ্রা, আহার্য্য প্রদান করিয়া উদয়েশ্বরকে স্থান মুক্ত করিবার আদেশ দিয়া চলিয়া গেল,—উদয়েশ্বর সেখানে বসিয়া থাকিল। কেহ কোথাও নাই দেখিয়া, পাঞ্জাসিংয়ের দিকে আরও অগ্রবর্ত্তী হইয়া, উদয়েশ্বর অতি ধীরে ধীরে বলিল,—"আমি যাঁহা বলি শুনিয়া যাও। এ বাড়ীতে আমি কালা ও বোবা বলিয়া পরিচিত, কিন্তু বস্তুতঃ আমি তাহা নহি।"

পাঞ্জাসিং আশ্চর্য্যান্বিত হইল। উদয়েশ্বর পুনরপি বলিল,—"তোমার উদ্ধারের জন্য রোমাণী ও খড়্গাসিং আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছে।

পাঙ্গাসিং সোৎসুক্যে জিজ্ঞাসা করিল,—"তাহারা কোথায়?"

উ। তাহারা আঙ্গচিঙ পাহাড়ে আড্ডা করিয়াছে,—বর্ত্তমানে এখানে আসিয়া প্রচ্ছন্নভাবে আছে।

পা। তুমি কে?

উ। আমি একজন বাঙ্গালী,—দেশ হইতে তাড়িত। কৃপাভিখারী হইয়া তোমাদের দলে মিশিয়াছি,—খড়্গাসিং আমাকে পুত্রবৎ ভালবাসে।

পা। আমাকে উদ্ধার করিবার কি উপায় করিয়াছ?

উ। এখানে কয়দিন ধরিয়া আসিতেছি,—তুমি শৃঙ্খলাবদ্ধ আছ দেখিয়া বাজার হইতে, শৃঙ্খল কাটিবার জন্য তীক্ষ্ণধার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুইখানি উকা কিনিয়া আনিয়া, পরিধেয় কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছি,—উহা তোমাকে দিয়া যাইতেছি,—এখানে সমস্ত দিন রাত্রি একা বসিয়া থাক,—এখানে জনমানবও থাকে না,—এখানকার অল্প অল্প শব্দও কেহ শুনিতে পায় না। আমি উকা দুই খানি দিয়া যাইতেছি,—তুমি উহা-দ্বারা শৃঙ্খল কাটিতে থাক। এক দিনে না হয়, দশ দিনে কাটা হইবে,—তারপর বাহিরে যাইবারও উপায় স্থির করিয়াছি। শিকল কাটা শেষ হইলে, তোমাকে লইয়া বাহির হইব।

উদয়েশ্বর পরিধেয় বস্ত্র হইতে উকা দুইখানি খুলিয়া পাঙ্গাসিংয়ের হস্তে প্রদান করিল। পাঙ্গাসিং উদয়েশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া উহা গ্রহণ করিল।

তৎপরে প্রায় পঞ্চদিবস গত হইলে, একদিন মধ্যাহ্নে উদয়েশ্বর যখন ভোজন-স্থান মুক্ত করিতে গেল, তখন পাঙ্গাসিং বলিল,—"কার্য্য শেষ হইয়াছে। এখন বাহির হইবার উপায় কি?"

উ। অদ্যই রাত্রে বাহির হইব।

পা। আমার একটি অভিলাষ আছে, তাহা যদি তুমি পূর্ণ করিতে পার, বাহির হইয়া,—দলের সহিত মিশিয়া, আমি তোমাকে বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিব।

উ। সে অভিলাষ কি ?

পা। জয়সিংহের কন্যা চন্দ্র ফুটন্ত পদ্মের মত সুন্দরী। উহার রূপ দেখিয়া পাগল হইয়াছি,—উহাকে লইয়া যাইবার ইচ্ছা করি।

উ। তাহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ?

পা। এই অসম্ভব, সম্ভব করিতে পারিলে, আমি তোমার কেনা হইয়া থাকিব। যদি তুমি ইচ্ছা কর, আমার মেয়ে রোমাণীর সঙ্গে তোমার বিবাহ দিয়া জামাতা করিয়া রাখিব।

উদয়েশ্বর ভাবিল, যে উদ্দেশ্যে আমার এত কষ্ট স্বীকার,—সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার পক্ষে ইহাই সহজ ও অত্যন্ত সুযোগ। সে একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল,—"রাত্রে যখন খাবার লইয়া আসিবে, তখন তাহাকে ধরিয়া, মুখ বাঁধিয়া স্কন্ধে করিয়া লইয়া এই প্রাচীরের গুপ্তদ্বার দিয়া চলিয়া যাইতে হইবে।"

পা। উত্তম পরামর্শ। কিন্তু দ্বার খোলা পাওয়া যাইবে কি প্রকারে ?

উ। আমি তাহার চাবি সংগ্রহ করিয়াছি, সন্ধ্যার পরে খুলিয়া রাখিয়া আসিব।

পা। শেষ বা পশ্চাদ্দিকের প্রধান দরোজার উপায় কি করিবে ? সেখানে অস্ত্রধারী সতর্ক ও বলবান্ পাহারাওয়ালা প্রহরায় নিযুক্ত থাকে।

উ। আমি অতর্কিতভাবে তাহাকে আক্রমণ করিব,—তুমি চন্দ্রাকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িবে।

পা। কিন্তু চন্দ্রা একদলা মাখন বা এক টুক্‌রা মিছরী নহে। তাহার দেহ সুপুষ্ট যদি কেহ পশ্চাদনুসরণ করে,—উহাকে লইয়া কত দূর দৌড়িতে পারিব ?

উ। আমি বৈকালে একবার বাহিরে গিয়া একটা ঘোড়ার যোগাড় করিব। তুমি এবাড়ীর পশ্চাদ্দিকের বড় দরোজা কখনও দেখিয়াছ কি ?

পা। এ বাড়ী আমারই ছিল,—যখন যে সর্দ্দার থাকে, এই বাড়ীতেই সে বসবাস করিয়া থাকে, আমি বহুদিবস এই বাড়ীতে বাস করিয়াছি। ইহার সমস্ত জানি।

উ। পশ্চাদ্দিকের প্রধান দরোজার অদূরে একটা পাকুড় গাছ আছে, জান ?

পা। হাঁ, জানি।

উ। যদি ঘোড়া সংগ্রহ করিতে পারি, তবে ঐ গাছের তলে তাহা বাঁধিয়া রাখিয়া আসিব। ঘোড়ার কাছে দুই একখানা অস্ত্রও রাখিয়া আসিতে পারিলে ছাড়িব না। সন্ধ্যার পর সেই দিকে বড় কেহ যায় না।

পা। তোমার কাছে টাকা নাই,— ঘোড়া পাইবে কোথায় ?

উ। জয়সিং আমাকে একটা ঘোড়া চড়িবার জন্য দিয়াছেন। সে দিবস তিনি মৃগয়ায় গিয়াছিলেন—আমাকেও সঙ্গে লইয়া ছিলেন,—তাই আমাকে চড়িয়া যাইবার জন্য ঐ ঘোড়াটি দেন।

পা। সে ঘোড়া কোথায় আছে ?

উ। আমি একজনের বাড়ীতে তাহা রাখিয়া দিয়াছি,—যদি সে কোথাও চড়িয়া না লইয়া গিয়া থাকে, তবে নিশ্চয় পাইব।

পা। যদি না পাও, গঙ্গাসিংয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবে,—সে যোগাড় করিয়া দিবে।

উ। তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার উপায় নাই,—জয়সিংয়ের জামাতা, কন্যা, দৌহিত্র ও দুইটি দৌহিত্রীকে, কে এক রাত্রে হত্যা করিয়া গিয়াছে,—সেই দিন হইতে গোয়েন্দা পুলিস সহরের চারিদিকে সতর্কতার সহিত সর্ব্বদাই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সে দিকে গেলে,—হয়ত আমাকেও সন্দেহ করিয়া আর এ বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দিবে না।

পান্নাসিং হাসিয়া, আনন্দোচ্ছল হৃদয়ে বলিল,—"বড় ভাল কাজ হইয়াছে। নিশ্চয়ই ইহা খড়্গসিংয়ের কার্য্য! যাক্,—তুমি এখন যাও। যে যে কাজের কথা সাব্যস্ত হইল,—প্রাণপণে তাহার সংগ্রহ করগে।"

উদয়েশ্বর চলিয়া গেল। বাড়ীর মধ্যে গিয়া সে কালা ও বোবা হইল।

যথা সময়ে সন্ধ্যা হইল। সন্ধ্যা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই উদয়েশ্বরের কাজ বাড়িয়া পড়িল। সে অতিশয় সতর্কতার সহিত—অতিশয় ক্ষিপ্রতার সহিত এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া নানাবিধ কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিল।

সন্ধ্যা অতীত হইল, ক্রমে রাত্রি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনুমান সার্দ্ধৈক প্রহরের সময় চন্দ্রা, এক থালে অন্ন ব্যঞ্জনাদি লইয়া উদয়েশ্বরকে ডাকিয়া আলো লইতে বলিল। কথা কহিয়া বলিলে উদয়েশ্বর শুনিতে পায় না, কাজেই ইসারা-ইঙ্গিতে বলিয়া দিল। উদয়েশ্বর আলো লইয়া অন্নপাত্রহস্তা সুন্দরীর অগ্রবর্ত্তী হইল; উভয়ে গিয়া বন্দী পান্নাসিংয়ের গৃহে পঁহুছিল।

পান্নাসিংয়ের কিঞ্চিৎ দূরে অন্নপাত্র রাখিয়া চন্দ্রা ফিরিতেছিল, পান্নাসিং ব্যাঘ্র-লম্ফে উঠিয়া আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

উদয়েশ্বর ভিতর-দরোজা টানিয়া বন্ধ করিয়া দিল,—ততক্ষণ পাঞ্জাসিং চন্দ্রার মুখের মধ্যে বস্ত্র পুরিয়া দিয়া, স্কন্ধের উপরে তুলিয়া লইল,—উদয়েশ্বর পশ্চাদ্দিকের দ্বার খুলিয়া ফেলিল,—উভয়ে ত্বরিত পদে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। দ্বিতীয় দ্বার অতিক্রম করিয়া, তাহারা তৃতীয় দ্বার-সন্নিধানে পঁহুছিল।

সেখানে একজন ভীমকান্তি প্রহরী পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছিল, অতর্কিত ভাবে সিংহ বিক্রমে উদয়েশ্বর গিয়া তাহার উপরে আপতিত হইল, সে প্রস্তুত ছিল না, কাজেই বিপন্ন হইয়া পড়িল,—উদয়েশ্বরের আক্রমণ রক্ষা করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল,—সেই অবসরে পাঞ্জাসিং মূর্চ্ছিত হতজ্ঞানা চন্দ্রাকে লইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল। উদয়েশ্বরের সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত প্রহরী তাহা দেখিতে পাইল,—সে চীৎকার করিয়া উঠিল। অনতিদূরে আর একজন প্রহরী ছিল, সে চীৎকার শুনিয়া ছুটিয়া আসিল।

উদয়েশ্বর তৎক্ষণাৎ কটিদেশস্থ ছুরিকা টানিয়া লইয়া, প্রথম প্রহরীর বক্ষে বিদ্ধ করিয়া দিয়া লাফ দিয়া উঠিয়া পড়িল এবং নবাগত প্রহরীকে আক্রমণ করিতে ধাবিত হইল,—প্রহরী ব্যাপার দেখিয়া পিছাইয়া পড়িল,—সেই অবসরে উদয়েশ্বর ছুটিয়া পলায়ন করিল, এবং একটা অন্ধকারময় ঝোপের মধ্যে মিশিয়া পড়িল।

যখন বৃক্ষতল হইতে অশ্ব লইয়া পাঞ্জাসিং তাহাতে উঠিয়া বসিল, এবং মূর্চ্ছিত চন্দ্রাকে ক্রোড়দেশে স্থাপিত করিয়া, অশ্বকে পুনঃপুনঃ কশাঘাতে পীড়ন করিয়া ছাড়িয়া দিল, সেই সময় একজন অশ্বারোহী নগররক্ষক তাহা দেখিতে পাইয়া, ত্বরিত গতিতে পাঞ্জাসিংয়ের ধাবমান অশ্বের অনুসরণ করিল।

কিয়দ্দূর যাইয়া পাঞ্জাসিং তাহা দেখিতে পাইল, সে গম্যমান

অশ্বোপরি বসিয়া, পশ্চাৎ ফিরিয়া দৃঢ় মুষ্টি উত্তোলন করিয়া অনুসরণকারীকে ভয় দেখাইল,—অনুসরণকারী তাহাতে ভীত হইয়া মনে মনে ভাবিল,—"একা উহার অনুসরণ করা বৃথা! অতএব ফিরিয়া পড়ি। তারপরে প্রধান কর্ম্মচারীকে সংবাদ দিলে, যে ব্যবস্থা হয়, তিনিই করিবেন। নগররক্ষক জানিতে পারে নাই যে,—সর্দ্দারের কন্যা লইয়া পাঞ্জাসিং পলায়ন করিতেছে। সে ফিরিয়া গেল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নগররক্ষক ফিরিয়া গিয়া, তাহাদের কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইল,—সেখানে গিয়া দেখে, তাহাদের প্রধান কর্ম্মচারীমহাশয় কার্য্যালয়ে উপস্থিত নাই—জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিল, তিনি সর্দ্দারের বাড়ী গমন করিয়াছেন, কাজেই নগররক্ষক তাহার কর্ত্তব্যকার্য্য প্রতিপালনার্থ নগর মধ্যে গমন করিল।

প্রধান কর্ম্মচারী অর্থাৎ সহরকোতোয়াল সর্দ্দারবাড়ী যে জন্য গমন করিয়াছিলেন, তাহা এই,—

তিনি সংবাদ পাইলেন, সর্দ্দারের বাড়ীর পশ্চাৎ দ্বারের প্রহরী হত হইয়াছে। কাহার দ্বারা এবং কি প্রকারে সে নিহত হইল,—এবং এই হত্যাকাণ্ডের সহিত ষড়যন্ত্রকারী পাঞ্জাসিংয়ের দলের লোকের কোন সংস্রব আছে কি না, ও এই হত্যার উদ্দেশ্যই বা কি, তাহারই তদন্ত জন্য।

তিনি সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তখনও প্রহরীর মৃতদেহ সেই দরোজার নিকট পড়িয়া আছে। তাহার বক্ষঃস্থল দিয়া রুধির ধারা নির্গত হইতেছিল। সর্দ্দার এবং অন্যান্য ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান কর্ম্মচারীমহাশয় প্রথমে নিকটের প্রহরীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাকে কে হত্যা করিয়াছে, তুমি সে বিষয়ে কি জান ?

প্রহরী হত্যাকারীর নাম না জানিলেও ঘটনা সে দর্শন করিয়াছে, কিন্তু কর্ত্তব্যকার্য্যে ত্রুটি হইয়াছে বলিয়া ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী যদি তাহাকে বলেন, এই ভয়ে সে বলিল,—"হুজুর ; আমি এই দুর্ঘটনার কিছুই

অবগত নহি। আমি জানিতে পারিলে, কখনই এমন দুর্ঘটনা ঘটিতে পারিত না।

পাহারাওয়ালার কার্য্যক্ষমতা তিনি সবিশেষ অবগত ছিলেন, কাজেই প্রহরীপুঙ্গবের এই বীরত্বব্যঞ্জক কথাতে হাস্যসম্বরণ করিতে পারিলেন না।

তখন তিনি হত্যাকারী কোন দিক হইতে আসিয়াছিল, তাহার অনুসন্ধানে লিপ্ত হইলেন। প্রথমেই দেখিতে পাইলেন, বাড়ীর পশ্চাদ্দিকের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি সর্দ্দারকে বলিলেন,—"সমস্যা গুরুতর। বোধ হইতেছে আপনারই বাড়ীর মধ্য দিয়া কেহ এই পথে বাহির হইয়া গিয়াছে,—প্রহরী তাহাকে বাধা দেওয়ায় নিহত করিয়া গিয়াছে।"

সর্দ্দার চমকিয়া উঠিলেন, এবং আরও আগ্রহের সহিত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। সর্দ্দার ও সহর কোতোয়াল সেই পথে বাড়ীর মধ্যের দিকে গমন করিলেন। দুইটি দরোজা ছাড়াইয়া সর্দ্দার চমকিয়া উঠিল,—দেখিতে পাইল, যে গৃহে পাঞ্জাসিং আবদ্ধ ছিল, সেই গৃহের অর্গল বিমুক্ত। সর্দ্দারের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল,—সর্দ্দার বুঝিল, আবদ্ধ ব্যাঘ্র পিঞ্জর ভাঙ্গিয়াছে—পাঞ্জাসিং পলায়ন করিয়াছে; কিন্তু কে তাহার পলায়ন-পথের পথপ্রদর্শক হইল,—কে তাহাকে মুক্ত করিয়া দিল, জয়সিং তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সে অতি দ্রুতপদে যে গৃহে পাঞ্জাসিং আবদ্ধ ছিল, সেই গৃহে প্রবেশ করিল, দেখিল—দুইখানি তীক্ষ্ণধার ক্ষুদ্র টকা ও ভগ্নশৃঙ্খল পড়িয়া রহিয়াছে, —গৃহ শূন্য, এবং বাটীর মধ্যের দিকের দ্বার বন্ধ। কেবল পাঞ্জাসিংয়ের জন্য যে আহার্য্য আসিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাতে কেহ হস্তস্পর্শও করে নাই। জয়সিংহ চমকিয়া উঠিল।

তাহার প্রাণের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল। মনে পড়িল, আমি আর চন্দ্রা ভিন্ন, আহার্য্য দিতে অপর কেহ আসে না। চন্দ্রা আহার্য্য দিয়া গিয়াছে ত? তাহার কোন বিপদ ঘটে নাই ত? এ কার্য্য কে করিল? বাঙ্গালী চাকরটা করে নাই ত? সে ত কালা ও বোবা,—তাহার দ্বারা কি এতদূর সম্ভবে? কিন্তু সে ভিন্ন আর ত কেহ এ গৃহে আসিতে পারে না! তবে কি ছদ্মবেশী পাঞ্জাসিংহের দলের লোক! কিন্তু বাঙ্গালী—কিন্তু পাঞ্জাসিংহের দলের লোক কি এত ধূর্ত্ত বাঙ্গালীকে সংগ্রহ করিয়া শিক্ষা দিয়া পাঠাইয়াছে!

জয়সিং আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিল না, দ্রুতপদে বাটীর মধ্যে চলিয়া গেল। প্রথমেই তাহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইল, জিজ্ঞাসা করিল,—"চন্দ্রা কোথায়?"

তাহার স্ত্রী বলিল,—"আমি কি জানি? সে আমার কাছে ত থাকে না। তাহার ঘরে থাকে,—তোমার কাজ করে, আর পুঁথি পড়ে, সময় পাইলে গান গায়।"

জয়সিং স্ত্রীর সহিত আর কথা কহিলেন না, ছুটিয়া চন্দ্রার প্রকোষ্ঠে গমন করিলেন। দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"চন্দ্রা কোথায়?"

দাসী বলিল,—"তিনি অনেকক্ষণ হইল, কোথায় গিয়াছেন, এখনও ফিরেন নাই।"

জয়সিংহের সন্দেহ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। সে, প্রকোষ্ঠ হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া যেখানে পাঞ্জাসিংহের আহার্য্য প্রস্তুত হইতেছিল, তথায় উপস্থিত হইল। পাচককে জিজ্ঞাসা করিল,—"চন্দ্রা কি পাঞ্জাসিংহের খাবার লইয়া গিয়াছে?"

পা। অনেকক্ষণ গিয়াছেন।

জ। সঙ্গে কি বাঙ্গালী চাকরটা গিয়াছিল?

পা। হাঁ।

জ। সে কি ফিরিয়া আসিয়াছে?

পা। কৈ, এখানে আসে নাই ত।

জ। চন্দ্রাকে আর দেখিয়াছ কি?

পা। না আর দেখি নাই।

জ। খাবারের পাত্র পাও নাই?

পা। না।

জয়সিং উন্মত্তের ন্যায় হইল। সমস্ত প্রাসাদের সমস্ত কক্ষে কক্ষে "চন্দ্রা চন্দ্রা" বলিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া ছুটিয়া বেড়াইল। সে সঙ্গে উদয়েশ্বরকেও খুঁজিয়া পাইল না—সে মস্তকের চুল ছিঁড়িয়া, কপালে করাঘাত করিয়া বলিল,—"হায়! আমি প্রতারিত হইয়াছি। পাণ্ডাসিংয়ের দলের লোক কালা ও বোবা সাজাইয়া কোন্ ধূর্ত্তকে আমার কক্ষে পাঠাইয়া আমার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে।"

সহর কোতোয়াল জয়সিংহকে বিবিধ প্রকারে প্রবোধ দিলেন, এবং এখনই চন্দ্রার অনুসন্ধানে কর্ম্মচারীগণকে পাঠাইবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন। জয়সিং কাঁদিয়া বলিলেন,—"আমার বড় মেয়ে, জামাতা, দৌহিত্র ও দুইটি দৌহিত্রীকে এক সময়ে রাক্ষসেরা নিহত করিয়াছে, তাহাতে আমার প্রাণে এত আগুন জ্বলে নাই; তাহারা পিশাচ শত্রুর পৈশাচিক দণ্ডে মরিয়া বাঁচিয়াছে,—কিন্তু চন্দ্রা জীবন্তে মরিবে। তাহার প্রতি যে পাশব অত্যাচারের আগুন জ্বলিবে, কে তখন তাহাকে তাহা হইতে রক্ষা করিবে? সে যে আমার নিতান্ত সরলা,—হা জগদীশ্বর! নির্ব্বুদ্ধিতার যথেষ্ট দণ্ড লইয়াছে।"

সহরকোতোয়াল তাঁহার কার্য্যালয়ে ফিরিয়া গেলেন। যে অশ্বারোহী নগররক্ষী একটি যুবতীকে লইয়া এক অশ্বারোহীকে পলায়ন করিতে দেখিয়াছিল, তাহার কার্য্যকাল শেষ হওয়ায়, সে তখন কার্য্যালয়ে ফিরিয়া আসিয়াছিল, সহরকোতোয়ালের সাক্ষাৎ পাইয়া সে কথা জানাইল। সহরকোতোয়াল শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। তিনি বুঝিলেন, সর্দ্দারের কন্যা চন্দ্রাকে লইয়াই পলায়ন করিয়াছে। তিনি তখনই সেই কর্ম্মচারীকে অনুসন্ধানের ভার অর্পণ করিলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য পঞ্চাশ জন সিপাহীকে আদেশ করিলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আঙ্গোচিঙ্‌ পাহাড়ে কয়দিন ধরিয়া আনন্দোৎসবের খরস্রোত প্রবাহিত হইতেছে,—খড়্গসিং রোমাণী প্রভৃতি পূর্ব্বে নিরাপদে তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। সর্দ্দার পাঞ্জাসিং উদয়েশ্বরের নিকটে আড্ডার সন্ধান পাইয়া চন্দ্রাকে লইয়া তথায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছে,—উদয়েশ্বরও কয়েক দিন পরে তথায় পঁহুছিয়াছে।

সর্দ্দারের মুক্তিতে সকলেই আনন্দিত হইয়াছে, বিশেষতঃ জয়-সিংয়ের সমূহ অনিষ্ট সংসাধিত হইয়াছে, এই জন্য সকলে আরও আনন্দিত। কাজেই কয়েক দিন ধরিয়া তাহাদের আনন্দোৎসব প্রবল ভাবেই প্রবাহিত হইয়াছে।

ব্যাধ-জাল-আবেষ্টিতা যূথহীন কুরঙ্গীর ন্যায় চন্দ্রা কেবল ছটফট করিতেছিল। রবি-কর-ক্লিষ্টা নৈশ ফুল্ল-কুসুমের ন্যায় চন্দ্রা কেবল শুকাইতেছিল। রাহু-গ্রাস পতিত নিশাকরের ন্যায় সর্দ্দার-ভয়-চকিতা চন্দ্রা দিবানিশি কাঁপিতেছিল, সর্দ্দার তাহার করুণার প্রার্থনা করিতেছিল, কিন্তু চন্দ্রা ঘৃণার সহিত তাহা প্রত্যাখান করিয়াছে। চন্দ্রা বলিয়াছে,—"প্রাণের" মায়া করি না, কিন্তু সতীত্ব রাখিব। আমার কাছে আসিও না। সর্দ্দার ভাবিয়াছে, কিছু দিন আঙ্গো-চিঙ্‌ পাহাড়ের প্রাকৃতিক শোভা-সৌন্দর্য্য উপভোগ করিলে, আর একটু পোষ মানিলেই হাতছাড়া হইবে না।

দিবা দ্বিপ্রহর,—পার্ব্বতীয় শ্যামল বৃক্ষশ্রেণীর পত্র-পুষ্পের মধ্যে-দেশ দিয়া সূর্য্যকর পাহাড়-গাত্রে আসিয়া পড়িতেছিল। সেই পতিত

সূর্য্য-কর বুকে করিয়া পাষাণ-ঝরণা বিয়োগীর ব্যথার ন্যায় ঝর ঝর করিয়া বহিয়া চলিতেছিল।

একটা ঝরণার কাছে বসিয়া চন্দ্রা, আপন মনে বুঝি তাহার অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছিল,—ঝরণার জলের ন্যায় তাহারও চক্ষু দিয়া জলরাশি ঝরিতেছিল। দূরে, তাহার প্রহরিণীদ্বয় আপন মনে একটা সূর্য্যমুখী ফুলের গাছের সকল ফুলগুলি তুলিয়া লইতেছিল। পার্শ্বে একটু উচ্চ পাহাড়ের বৃক্ষকুঞ্জের অভ্যন্তরে অদৃশ্য ভাবে দুইটি মানুষ অবস্থান করিতেছিল।

চন্দ্রা যেখানে বসিয়াছিল, তাহারই নিকটে উদয়েশ্বরের আবাস কুটীর। উদয়েশ্বর গৃহ হইতে দেখিল, ঝরণার নিকটে বিষাদ প্রতিমার ন্যায় চন্দ্রা বসিয়া কাঁদিতেছে। উদয়েশ্বর উঠিয়া তাহার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল।

চন্দ্রা শব্দ পাইয়া চাহিল, দেখিল উদয়েশ্বর! বাণবিদ্ধা হরিণীর ব্যথিত কম্পিত আতঙ্ক-চকিত চাহনির ন্যায় চাহিয়া বলিল,—"কেন উদয়েশ্বর জ্বালাইতে আসিলে? কেহ হাসিয়া শান্তি পায়, কেহ কাঁদিয়া শান্তি পায়। আমি কাঁদিয়া শান্তি পাইতেছি,—আমার কান্নায় কেন বাধা দিতে আসিলে? পাষণ্ড;—তুমিইত আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ, তুমিইত আমার বাবাকে ছলনা করিয়া এতদূর ঘটাইয়াছ? বিশ্বাসঘাতক;—এর প্রতিফল কি তুমি পাবে না? উপরে ভগবান আছেন,—ঐ দিবাকর আকাশের গায়ে বসিয়া সব দেখিতেছেন।"

উদয়েশ্বর চমকিয়া উঠিল। তাহার প্রাণে অনুতাপের শত বৃশ্চিক দংশন অনুভূত হইল। উদয়েশ্বর ফিরিয়া আপন গৃহে গমন করিল। সেখানে গিয়া, শয্যায় শয়ন করিয়া, মুদিত নয়নে ভাবিল,—"আমি কোথায় নামিয়া পড়িয়াছি—বাস্তবিকই ইহার প্রতিফল পাইব।"

চন্দ্রা যে ঝরণার নিকটে বসিয়াছিল, তাহার অদূরে উচ্চ পাহাড় খণ্ডের বৃক্ষ শ্রেণীর মধ্যে যে দুইটি মনুষ্য ছিল; সে খড়্গসিং ও রোমাণী। উদয়েশ্বর যখন চন্দ্রার নিকট হইতে অনুতাপের ম্লান মুখ লইয়া ফিরিতেছিল, তখন তাহাকে দেখিয়া তাহারা বুঝিল—চন্দ্রার নয়ন-জলে উদয়েশ্বর ব্যথিত হইয়া ফিরিতেছে! রোমাণী বলিল,—"উদয়েশ্বরের মুখ দেখিয়া কি বুঝিলে?"

খ। চন্দ্রার দুঃখে ব্যথিত হইয়াছে। লোকটা বাঙ্গালী কি না,—বাঙ্গালীদের প্রাণ বড় কোমল।

রো। বিপদ ঘটাইতে পারে। চন্দ্রার উদ্ধারের জন্য নেগ্রেইসে সংবাদ দিতে পারে। উহার কাজ সাবাড় করিয়া দেওয়া যাক।

খ। কিন্তু সর্দ্দার নিষেধ করেন।

রো। তাঁহার নিষেধ শুনিলে চলিবে না: তাঁহাকে জানিতে দেওয়া হইবে না,—গোপনে হত্যা করা যাক। তিনি বুঝিতেছেন না যে, আড্ডায় একজন দুর্ব্বলচেতা মানুষকে রাখা হইয়াছে,—তিনি বলেন, লোকটা খুব চালাক—বিশেষ উপকার করিয়াছে। আমি বলি শোন, বিষদানে উহাকে মারিলে বাবা জানিতে পারিবেন,—উহাকে অন্য প্রকারে মারিয়া ফেলিয়া বাবাকে বলিব, সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

খড়্গসিং রোমাণীর কথার কোন প্রকার উত্তরই প্রদান করিল না।

সেই দিবস বৈকালে রোমাণী হাসিতে হাসিতে উদয়েশ্বরের আবাস-কুটীরে প্রবেশ করিল। উদয়েশ্বর বলিল,—"অধীনের আবাসে কি মনে করিয়া আসা হইয়াছে?"

নয়ন-ভঙ্গিতে বৈদ্যুতি নিক্ষেপ করিয়া রোমাণী বলিল,—"তুমি কি আমায় ভুলিয়া গেলে?"

উ। কেন রোমাণী; তুমিই আমাকে আর দেখা দাও না।

রো। দেখা দেই না কেন, শুনিবে? আর সহ্য করিতে পারি না—তোমায় দেখিতে দেখিতে আমি পাগল হইয়াছি—এখন চাই, তুমি খড়্গসিংকে দিয়া বাবার কাছে বিবাহের কথা বল।

উ। আ'জ বলিব।

রো। চল না কেন, একটু বেড়াইয়া আসি। পাহাড়ের ও প্রান্তে কত নূতন নূতন ফুল ফুটিয়াছে দেখিয়া আসিব। তুলিয়া মালা গাঁথিব—দুইজনে গলায় পরিব।

উদয়েশ্বর স্বীকৃত হইল। উভয়ে বাহির হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে চলিয়া গেল।

কত দূরে গিয়া, পর্ব্বত-শিখরে উঠিয়া উভয়ে কতকগুলি পার্ব্বতীয় প্রস্ফুট কুসুম তুলিয়া লইল। রোমাণী বিবিধ হাব-ভাবে, বিবিধ প্রণয়ালাপে ক্রমেই উদয়েশ্বরকে মাতাইয়া তুলিল।

পর্ব্বতের শিখর-তলে গহ্বর;—গহ্বর কতদূর চলিয়া গিয়াছে উপর হইতে তাহার নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। রোমাণী ও উদয়েশ্বর যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, সেখান হইতে একটু পদস্খলন হইলে, একেবারে সেই গভীর গহ্বর-তলে পতিত হইতে হয়। রোমাণী বলিল—"চাহিয়া দেখ, নিম্ন দেশে কি সুন্দর দৃশ্য!"

উদয়েশ্বর নিম্ন দিকে ঝুঁকিয়া যেমন চাহিয়াছে, পিশাচী রোমাণী অমনি উদয়েশ্বরকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল। অসাবধান উদয়েশ্বর সে ধাক্কা সামলাইতে পারিল না,—সে পাহাড়-গাত্র-সংলগ্ন ভাগে গড়াইতে গড়াইতে নিম্নের গহ্বরে ছুটিয়া পড়িল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

উদয়েশ্বর গড়াইতে গড়াইতে পড়িল,—ঊর্দ্ধ হইতে গভীরতম নিম্ন দেশে চলিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু সৌভাগ্যের মধ্যে, সে গড়াইতে গড়াইতে এক গুচ্ছ কঠিন ও লম্বিত লতায় জড়াইয়া গেল,—মনুষ্য ভারে লতাগুচ্ছ আর ও ঝুলিয়া গেল,—লতাগুচ্ছসহ উদয়েশ্বর এক গহ্বর মধ্যে নামিয়া স্থির হইল। উদয়েশ্বর প্রাণে মরিল না, কিন্তু তাহার জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। লতাগুচ্ছ বেষ্টিত দেহে উদয়েশ্বর সেই গহ্বর-মধ্যে বহুক্ষণ পড়িয়া থাকিল,—কতক্ষণ সেখানে পড়িয়াছিল, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু যখন তাহার চৈতন্য হইল, তখন দেখিল প্রভাত-সূর্য্যের কর রাশির মৃদু কিরণ গহ্বর-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। প্রভাতের ধীর প্রবাহিত শীতল সমীরণাঙ্গে পার্ব্বতীয় প্রস্ফুট কুসুমের সুগন্ধ গহ্বরের মধ্যে আসিতেছিল, এবং বাহিরের বৃক্ষে বসিয়া নানা জাতীয় পক্ষী প্রভাতী গাহিতেছিল, তাহার স্বর-লহরী গহ্বর মধ্যে ভাসিয়া আসিতেছিল।

চৈতন্য পাইয়া উদয়েশ্বর প্রথমে বুঝিতে পারে নাই, সে কোথায় এবং কি অবস্থায় আছে। তারপরে ক্রমে ক্রমে সকল কথা তাহার স্মৃতিপথে উপস্থিত হইল। পিশাচী রোমাণী যে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল, তাহা তখন সে অনুভব করিতে পারিয়াছিল— এখন সে কথাও তাহার স্মরণ হইল,—সে বুঝিল, নিম্নের গহ্বরে পড়িয়া অচৈতন্য হইয়াছিল, এখন তাহার জ্ঞান হইয়াছে—কিন্তু সর্ব্বাঙ্গে অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হইতে লাগিল।

উদয়েশ্বর উঠিয়া বসিল। সর্ব্বাঙ্গে লতাগুচ্ছ বিজড়িত ছিল, ধীরে

ধীরে দুর্ব্বল ও অবসন্ন হস্তে সেগুলা মুক্ত করিয়া ফেলিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, সে একটি সুন্দর গহ্বর,—তখন ধীরে ধীরে গহ্বর মধ্যে চলিতে লাগিল।

গহ্বরের দক্ষিণদিকে একটি ঝরণা হইতে ঝর ঝর শব্দে জল ঝরিয়া পড়িয়া নিম্ন দিকে চলিয়া যাইতেছে। ঝরণার পার্শ্বে এক পাষাণ বেদিকার উপরে একজন মনুষ্য মুদিত নেত্রে বসিয়া আছে। উদয়েশ্বর বিশেষরূপে চাহিয়া দেখিল, যিনি বসিয়া আছেন, তিনি সন্ন্যাসী। নীরবে বসিয়া ঈশ্বর-ধ্যান করিতেছেন; তাঁহার দেহে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বিকশিত হইতেছে—কিন্তু বয়স কত, কোন্ দেশবাসী, কি জাতি, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য—সন্ন্যাসী সম্পূর্ণ রূপে নগ্ন।

উদয়েশ্বরের অত্যন্ত তৃষ্ণা পাইয়াছিল। অঞ্জলি পুরিয়া ঝরণার জল পান করিয়া, সেই স্থানে বসিয়া ভাবিতে লাগিল, এখন কোথায় যাই, এ সংসারটা কেবলই পাপ আর অত্যাচার; প্রেম আর দয়া, শুধু এখানকার দুটা কথা মাত্র। প্রেম আছে,—কিন্তু পাইবার উপায় নাই; দয়া আছে,—পারিজাত পুষ্পের ন্যায় তাহা দেবভোগ্য হইয়া রহিয়াছে,—মানুষের তাহা পাইবার উপায় নাই, অতএব মনুষ্য-সমাজে আর যাইব না,—ঐ সন্ন্যাসীর সেবা করিয়া, এই নিভৃত নির্জ্জনে জীবনের অবশিষ্ট দিন কয়টা কাটাইয়া দেই। কিন্তু ইহ-জীবনে আর জাহানারাকে দেখা হইল না। মালতী বড় ভাল মানুষ,—আমাকে বড় ভালবাসে—তাহার কি হইল, সে সংবাদও পাইলাম না। কিন্তু সে সকল সংবাদ লইয়াই বা কি করিব। যাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবার উপায় নাই, যে দেশে জীবন্তে যাইবার সম্ভাবনা নাই সে দেশের মানুষের সংবাদ লইয়াই বা কি

হইবে। শুনিয়াছি "যোগ-সাধনায় জীবনের উন্নতি হয়,— ঐ সন্ন্যাসীর নিকটে, ঐ যোগীর সদনে যোগ শিক্ষা করিব। যোগের আচরণ করিয়া এই জনহীন পর্ব্বত-গহ্বরে জীবন কাটাইয়া দিব। এ জন্মে এই কষ্ট পাইলাম, আগামী জন্মে যাহাতে আবার এরূপ কষ্ট পাইতে না" হয়, তাহার উপায় করাই এখন আমার কর্ত্তব্য। উদয়েশ্বর যোগীর ধ্যান ভঙ্গের সময় অপেক্ষা করিয়া, সেখানে বসিয়া থাকিল।

মধ্যাহ্নকালে যোগীর ধ্যানভঙ্গ হইল, তিনি পাষাণবেদী হইতে উঠিয়া ঝরণার জলে অবতরণ করিলেন, এবং যথারীতি শিখাবন্ধন ও আচমনাদি করতঃ ঝরণার জলে আবগাহন করিয়া স্নান করিলেন,—তারপরে তীরে উঠিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, সহসা উদয়েশ্বরের দিকে দৃষ্টি পড়াতে যোগী একটু বিস্মিত হইলেন। পথশূন্য এই গভীর গহ্বরে মানুষ কি প্রকারে আসিতে সক্ষম হইল? উদয়েশ্বরের দৈহিক আকৃতি দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, কখনই সাধক বা যোগী নহে। কৌতূহলাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি উদয়েশ্বরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে?"

কথা সংস্কৃত ভাষায় বলিয়াছিলেন। উদয়েশ্বরও সংস্কৃতে বলিলেন,—"আমি বাঙ্গালী।"

যো। বাঙ্গালী! এখানে কেমন করিয়া আসিলে?

উ। সে অনেক কথা, আপনি যদি কৃপা করিয়া শ্রবণ করেন, বলিতে পারি।

যো। অধিক কথা শুনিয়া সময় নষ্ট করিতে চাহি না।

উ। সংক্ষেপেই বলিতেছি,—দেব! আমি বড়ই বিপন্ন। সংসার-সাগরে ভাসমান। আপনি আমাকে দয়া করুন,— আমি আজীবন আপনার চরণ সেবা করিব।

যো। চরণসেবার জন্য লোকের প্রয়োজন নাই তোমার কি প্রয়োজন বল ?

উ। আমাকে সঙ্গে লউন আমি চরণ ছাড়া হইব না।

যো। কেন তোমার কি হইয়াছে ? তুমি এখানে কি প্রকারে আসিলে ?

তখন উদয়েশ্বর সংক্ষেপে তাহার জীবনের ঘটনা যোগীর নিকটে নিবেদন করিল এবং রোমাণী কর্ত্তৃক যেরূপে সে প্রতারিত ও নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাও বলিল। যোগী তাহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন—"তুমি এই স্থানে অপেক্ষা কর। মধ্যাহ্ন-উপাসনার পরে আমি তোমাকে মনুষ্যদেশে যাইবার পথ দেখাইয়া দিব।"

উদয়েশ্বর করুণ কণ্ঠে কহিল,—মনুষ্যলোকে গিয়া আমার সুখ নাই। জগতে আমার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব কেহ নাই—যে দু একজন দু'দণ্ডের পরিচিত লোক আছে, সে গৌড়নগরে,—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে দেশ হইতে আমি নির্ব্বাসিত,—পলায়িত। সে দেশে আমার যাইবার উপায় নাই—তবে অন্য দেশে—অন্যত্রে মনুষ্যসমাজে গিয়া কি ফল হইবে ? কেবল প্রতারণার আগুণে দগ্ধ হইতে হইবে।

যো। তবে কি করিতে চাহ ?

উ। আপনার নিকটে থাকিয়া, আপনার ন্যায় ঈশ্বরোপাসনায় দিন কাটাইতে চাহি ; আপনি আমাকে দীক্ষা দান করুন।

যো। আমার বৃথা সময় নষ্ট হইতেছে,—মধ্যাহ্ন-উপাসনার পরে এই ঝরণায় স্নানার্থে আসিব, তখন তোমার সহিত আবার কথা হইবে। এই গহ্বরের উপরেই রক্তবর্ণ পত্রবিশিষ্ট একরূপ

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ দেখিতে পাইবে, সেই পত্র তুলিয়া ভক্ষণ করিও, উহার স্বাদ উত্তম এবং বলপ্রদ।

যোগী চলিয়া গেলেন। উদয়েশ্বর অনেকক্ষণ সেই স্থানে বসিয়া কত কথা চিন্তা করিল, অবশেষে গিয়া ঝরণার জলে স্নান করিয়া গহ্বরের বাহির হইল। বাহিরে গিয়া দেখিল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু বৃক্ষ রক্তবর্ণ পত্রপুষ্পে শোভিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। উদয়েশ্বর তাহার একটি পত্র ছিঁড়িয়া লইয়া চর্ব্বণ করিয়া দেখিল,—তাহার আস্বাদের নিকট মাখনপূর্ণ ময়দার খাদ্যও হেয়। আশ্চর্য্য হইয়া উদয়েশ্বর উদর পূর্ণ করিয়া তাহা ভক্ষণ করিয়া গহ্বরে ফিরিয়া গেল, এবং একটা পাষাণস্তূপে শয়ন করিয়া নিদ্রা গেল। বৈকালে নিদ্রা হইতে উঠিয়া দেখিল, বেলা অবসান হইয়া গিয়াছে,—কিন্তু তাহার শরীরে বল ও স্ফূর্ত্তি আসিয়াছে। সে বুঝিল, যোগীর কথিত সুখাদ্য পত্রেই তাহার শরীরে এমন বল ও স্ফূর্ত্তি আনয়ন করিয়াছে। সে, তখন ঝরণার নিকটে গিয়া যোগীর অপেক্ষা করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরেই যোগী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উদয়েশ্বর তাহাকে প্রণাম করিল। যোগী বলিলেন,—"তোমাকে মনুষ্যলোকে যাইবার পথ দেখাইয়া দিয়া আসিতে ইচ্ছা করিতেছি।"

উ। আমাকে পায়ে ঠেলিবেন না, আমাকে সাধন পথ দেখাইয়া দিয়া দীক্ষিত করুন।

যোগী মৃদু হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন,—"তোমার চেহারা দেখিয়া বুঝা যাইতেছে, তোমার দেহের প্রত্যেক রক্তবিন্দুতে আসক্তির আগুন মাখান রহিয়াছে, তুমি কি প্রকারে সাধন-পথে আসিতে পারিবে?

উ। আমার মত লোক কি তবে পাপ করিয়াই বেড়াইবে? আমার মত লোকের কি তবে উদ্ধার নাই?

যো। আছে, কিন্তু সে এক জন্মের কাজ নহে। এবারকার সারা জীবন কঠোর সংযমের পথে থাকিতে হইবে,—পরে জন্মে ক্রমোন্নতি হইয়া ঠিক পথে যাইতে পারিবে। কিন্তু উহার মধ্যেও পতনের আশঙ্কা আছে,—মুনি ঋষিগণও অপ্সরাগণের রূপের প্রলোভনে নিম্নে সরিয়া পড়েন। অতএব, ও পথে যাওয়াটা বড় সহজ নহে। এই যে জগৎটা দেখিতেছ, ইহা প্রকৃতির আকর্ষণ মাখান, অথবা প্রকৃতির রসের মূর্ত্তি। সত্ত্বঃ, রজঃ, তম—এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি ও তদুৎপন্ন যে কিছু ভূত-ভৌতিক—সমস্তই পুরুষের (চৈতন্যের) ভোগের ও অপবর্গের (মোক্ষের) নিমিত্ত-কারণ (প্রয়োজক)। উহারা অবিবেকীর ভোগ এবং বিবেকীর মোক্ষ প্রদানার্থ উদ্যত আছে।

ঐ চতুরাবস্থাপন্ন প্রকৃতি সেই চিন্ময় পুরুষের ভোগসাধনরূপে পরিণত হইতেছে। অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, সুখ, দুঃখ মোহ,—ইত্যাদি বহু প্রকারে পরিণত হইতেছে। জড় স্বভাব লৌহ যেমন সম্পূর্ণ ইচ্ছাবিহীন ও চলন রহিত হইয়াও চুম্বক-সন্নিধানে প্রচালিত হয়, সক্রিয় বা ইচ্ছাযুক্ত প্রাণীর ন্যায় গতিশক্তি সম্পন্ন হয়, তেমনি প্রকৃতিও চিদাত্মার সন্নিধান বশতঃ সুখদুঃখাদি নানা আকারে পরিণত হন। পরন্তু যে ব্যক্তি দ্রষ্টৃত্ব অবস্থায় যোগাভ্যাসাদির দ্বারা প্রকৃতির কথিত প্রকার গূঢ় অভিসন্ধি অর্থাৎ উক্তবিধ পরিণাম তত্ত্ব জানিতে পারেন, সে পুরুষ আর তখন প্রকৃতির বাঁধনে বাঁধা থাকেন না।

উ। কতদিন যোগাভ্যাস করিলে, একাজ হইতে পারে?

যো। সকলের পক্ষে সমান সময় নির্দ্দিষ্ট নাই—যাহার পূর্ব্ব জন্মের সাধনা আছে, সে সহজেই পারে। কিন্তু তোমার সংস্কারের অস্থিমজ্জায় আসক্তি মাখা,—তোমার দীর্ঘসময় লাগিবে।

উ। আপনি বলিলেন যে, পরিদৃশ্যমান প্রকৃতি অবিবেকীর ভোগ এবং বিবেকীর মোক্ষ প্রদানার্থ উদ্যত আছে। আমি অবিবেকী—কৈ দেব, আমার ভোগ কোথায়?

যোগী হাসিয়া বলিলেন,—"ভোগ অর্থে সুখ ভোগ ভাবিতেছ? সুখ দুঃখ সমস্ত মনের অবস্থা মাত্র,—যুবক, সুন্দরী রমণী পাইলে সুখী হয়, বৃদ্ধ বিরক্তি জ্ঞান করে, বালক রাঙ্গা পুতুল পাইলে সুখ বোধ করে, যুবকের নিকটে উহার কোন মূল্যই নাই। যাক্, —আরাধনার দ্বারা মানুষ প্রকৃতির উপরে আধিপত্য করিয়া, তাহার বাঞ্ছিত আদায় করিতে পারে। শাস্ত্রে সে সকল আরাধনার কথা আছে।

উ। আরাধনা বলিলেন কেন? উপাসনা নহে কি?

যো। না।—উপাসনা ও আরাধনার অর্থ বিভিন্ন। উপাসনা অর্থে উপাস্যে আপন হারা হওয়া আর আরাধনা অর্থে আরাধ্য দেবতাকে আপন অভীষ্ট কার্য্যে নিয়োজিত করা।

উ। যাক্—আমাকে এমন একটি আরাধনার কথা বলিয়া দিন্ এবং তাহার মন্ত্র দীক্ষা দিন, যাহাতে আমি যাহা মনে করিব, তাহা সিদ্ধ করিতে পারিব।

যো। দৈত্য, দানব ও পিশাচাদি সাধনে ঐরূপ হয়। কিন্তু যুবক; সে বড় ভয়ানক পথ। চৈতন্যের দিক্ ছাড়িয়া একেবারে কঠোর জড়ের রাজত্বে পড়িতে হয়,—ইহ-সংসারের দু'দণ্ডের সুখের জন্য দীর্ঘ কাল নরকাগ্নিতে জ্বলিতে হয়। দেব ও দানবের কথা শুনিয়া থাকিবে,

—দেবতা পুণ্য, দানব পাপ। দেবতা স্বর্গে,—দানব নরকে। দেব-দৈত্যের বা পাপ-পুণ্যের চির সমর—তুমি দৈত্য পক্ষ আশ্রয় করিবে?

উ। আমাকে দয়া করুন,—আমাকে সেই সাধনার পথ বলিয়া দিন, যাহাতে আমার ইচ্ছামত কার্য্য সমাধা হয়। ইহজীবনে আসক্তির আগুনে আর পুড়িতে পারি না। পরলোক থাকে যদি, তখন কষ্ট হইবে? সে কষ্ট কি দেখিতে যাইবে! কি হইবে না হইবে,—তাহারই বা স্থিরতা কি?

যো। নির্ব্বোধ! পরকাল নাই? ইহ-কালত দুদণ্ডের খেলা। ইহকালের সুখ-দুঃখ অচিরস্থায়ী।

উ। তথাপি আমি ইহকাল চাহি, আমাকে দয়া করুন। আমাকে সেই সাধনার পথ বলিয়া দিন, যাহাতে আমার ইচ্ছামাত্র কামনা পূর্ণ হয়।

যো। তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ,—পরিণাম বড় ভয়ঙ্কর। আর নিবৃত্তির পথে পরিণাম বড় সুখকর। তোমাকে মন্ত্র দীক্ষা দিতে আমার বাসনা হইয়াছে,—বাসনার পূরণ করিব,—বাসনা অপূর্ণ রাখিব না। কিন্তু ভাল পথে যাও, নিবৃত্তি মার্গ অনুসরণ কর।

উ। না, আমি ভোগ করিতে চাই।

যো। আজিকার দিন সময় দিলাম, এইস্থানে অবস্থান কর, কোন ভয় নাই—কা'ল প্রভাতে আবার আমি স্নান করিতে আসিব, তখন তোমাকে দীক্ষা দিব। এখন হইতে সমস্ত রাত্রি চিন্তা করিয়া দেখ কোন্ পথে যাইবে।

যোগী ঝরণার জলে স্নানাদি সমাপ্ত করিয়া চলিয়া গেলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

উদয়েশ্বর একা সেই পাষাণ-গহ্বরে বসিয়া ভাবিতে লাগিল, কোন্ পথে যাই? যোগীবর দুই পথের কথাই বলিয়া গেলেন,—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দুই পথ। প্রবৃত্তির সাধনায় ইহকালে সুখ ও ক্ষমতা লাভ, নিবৃত্তির পথে পরকালে সুখ,—কিন্তু পরকাল কে দেখিতে গিয়াছে? পরকাল আছে কি না, তাহাই বা কে জানে? মানুষ মরিয়া কি হয় না হয়, তাহারই বা স্থির কি? দানবের আরাধনায় দানবী শক্তি বশীভূত হইবে, সেই শক্তির বলে যাহা ইচ্ছা, তাহাই করা যাইতে পারিবে,—তাহা হইলে আমি সুখৈশ্বর্য্য লাভ করিতে পারিব; যাহার জন্য আজীবন ঘুরিয়া মরিতেছি সেই অনিন্দ্য সুন্দরী জাহানারাকে লাভ করিতে পারিব। জাহানারাকে পাইলে যে সুখ হইবে, তার চেয়ে কি স্বর্গ সুখ অধিক? কখনই না। স্বর্গে যাওয়া যাইবে কি না, তারও ঠিক নাই। হয়ত সকল মানুষই দানবী শক্তিতে শক্তিবান্ এবং মহৎ ও অতুলনীয় শক্তিধর হইয়া সমাজে বিশৃঙ্খলা ঘটাইবে, তাই শাস্ত্রকারগণ নরকের ভয় দেখাইয়াছে;—সমাজের সকলেই শক্তিবান্ হইলে, সমাজে কাটাকাটি মারামারি হয়, কেহ কাহারও অধীন হয় না, এই ভয়েই হয়ত নিবৃত্তির পথের কথা। যাক্, আমি ইহকাল চাই,—জাহানারা চাই। যদি পরকাল থাকে, তখন নয় নরকে ডুবিব, এখনত সুখ করিয়া লই।

সারারাত্রির চিন্তায় উদয়েশ্বর উহাই স্থির করিল। এবং নির্ঝরিণী-

তটে পাষাণ-বেদিকার উপরে দেহভার রাখিয়া, বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিয়া দিল।

প্রভাত-সূর্য্যের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যোগী তথায় উপস্থিত হইলেন। উদয়েশ্বর প্রণাম পূর্ব্বক হাতযোড় করিয়া দাঁড়াইল।

যোগী বলিলেন,—"কি স্থির করিয়াছ?"

উ। যাহাতে ইহকালে সুখী হইতে পারি, কামনা-বাসনার পূরণ হয়, এমন করিতে পারি,—সেই সাধনার কথা আমাকে বলিয়া দিন।

যো। এখনও সেই মত?

উ। আজ্ঞে হাঁ।

যো। শোন যুবক; ইহজীবন দু'দণ্ডের জন্য,—এক মুহূর্ত্তে এখানকার খেলার অবসান হইতে পারে। কিন্তু পরকাল দীর্ঘ সময়ের। ভ্রমে মজিওনা, আপনার পায়ে আপনি কুঠারাঘাত করিও না।

উ। আপনি আমাকে দীক্ষা দান করুন,—উপদেশ চাহিনা।

যো। তথাপি আবার বলিতেছি,—প্রকৃত সুখের অনুসন্ধান কর।

উ। ইহকালের সুখই সুখ,—পরকাল দেখিতে যাইব না।

যো। দেখিতে যাইবে না? দেখিতে যাইবে, ভোগ করিতে যাইবে,—সেই-ই তীব্র ভোগ।

উ। কৃপা করুন, মন্ত্রদান করুন।

যো। আবার বলি শোন, পিশাচাদি সাধনা না করিলে, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। কিন্তু অবিধি পূর্ব্বক এই আচরণ আবার প্রবৃত্তির পথের অতি নিম্নতমস্তর,—এখানে কষ্ট জন্ম জন্মের, যাতনা প্রাণভেদী।

উ। তথাপি এখন সুখী হইব।

যো। ভাল, তাহাই হউক; কিরূপ ক্ষমতা লাভ করিতে চাও?

উ। আমি যাহা ইচ্ছা করিব, তাহাই সম্পন্ন হইবে। আমি অদৃশ্য হইয়া লোকের উপর অস্ত্রাঘাত করিলেও কেহ আমাকে দর্শন করিতে পারিবে না। আমি ইচ্ছা করিলে, রাজসৈন্য মথিত করিতে পারিব,—আমি ইচ্ছা করিলে, মানুষের গতি জড়ের ন্যায় স্থগিত করিতে পারিব।

যো। পিশাচসিদ্ধির জন্য সাধনা কর।

উ। আপনি মন্ত্র দিন, এবং সাধনোপায় ও প্রণালী বলিয়া দিন।

যো। আমি যে মন্ত্র তোমাকে প্রদান করিব, তাহা সিদ্ধমন্ত্র—এক সপ্তাহ নিয়মক্রমে জপ করিলেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। কিন্তু আমার এ আশ্রমে থাকিয়া পিশাচ সাধনা করিতে পারিবে না।

উ। যেখানে বলিবেন, সেই স্থানে যাইব।

যো। এস্থানে পিশাচসিদ্ধ হইবে না। কেননা, পিশাচ এ স্থলে আগমন করিতে পারিবে না। বহু নিবৃত্তি মার্গের সাধকের শরীর-দ্যুতিতে এস্থান পবিত্রীকৃত। তোমাকে আমি দীক্ষা দিয়া, পথ দেখাইয়া দিতেছি, সেই পথে গেলে, এক জলশূন্য বৃহৎ দীর্ঘিকার নিকটে উপস্থিত হইতে পারিবে। সেই স্থানে ফল পুষ্প ও পত্রাদি শূন্য এক বৃহৎ বটবৃক্ষ আছে, তথায় বসিয়া পিশাচমন্ত্র জপ করিও—সেখানে আরও দুই চারিজন পিশাচসিদ্ধ করিয়াছে, সত্বরেই তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে। পিশাচ তোমাকে নানা প্রকারে ভয় দেখাইবে, কিন্তু ভীত হইও না। পরে তোমাকে সত্য করাইয়া লইয়া, সে তোমার বশীভূত ও আজ্ঞাকারী দাসের ন্যায় হইবে।

উ। যে আজ্ঞা। আমায় মন্ত্র দিন।

যো। স্নান করিয়া আইস।

উদয়েশ্বর স্নান করিয়া যোগীর নিকটে উপবেশন করিল। যোগী তাহাকে পিশাচ মন্ত্র প্রদান করিয়া প্রণালী আদি বলিয়া দিয়া পথ দেখাইয়া দিলেন। উদয়েশ্বর পাষাণ-গহ্বর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

মধ্যাহ্নকালে উদয়েশ্বর জলশূন্য দীর্ঘিকার নিকটে উপস্থিত হইয়া পত্র পুষ্পহীন বটবৃক্ষ দেখিয়া, তাহার তলে উপবেশন করিল এবং নিয়মক্রমে পিশাচ-মন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিল।

পাঁচ দিন অতীত হইলে, উদয়েশ্বর দেখিল, এক পাল ব্যাঘ্র তাহাদের করাল বদন ব্যাদন পূর্ব্বক তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে, —উদয়েশ্বর গ্রাহ্য করিল না, ব্যাঘ্রপাল অদৃশ্য হইল। সেই দিন হইতে কখনও সর্প হইয়া, কখনও শূকর হইয়া, কখনও মত্ত হস্তী হইয়া, কখন ভল্লুক, গণ্ডার প্রভৃতি হিংস্র জন্তু হইয়া পিশাচ তাহাকে ভয় দেখাইত, কিন্তু সে অটল,—যোগীর কথার উপরে নির্ভর করিয়া, স্তিমিত নয়নে জপ করিত।

সাত দিনের দিন সন্ধ্যার সময়ে পিশাচ দর্শন দিল। বলিল,— "মানব! আমাকে দাস করিতে চাহিতেছ, আমি স্বীকৃত আছি। কিন্তু তোমাকে আমার নিকটে কিছু প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে।"

উ। বল প্রস্তুত আছি।

পি। তুমি কখনও শুচি হইবে না,—সর্ব্বদাই অশুচি থাকিবে। কখনও নারায়ণ শিলা স্পর্শ করিবে না। গায়ত্রী পাঠ করিবে না; কোন দেবালয়ে প্রবেশ করিবে না।

উ। সত্য করিলাম।

পি। ইহকালে আমি তোমার অধীন থাকিব, কিন্তু পরকালে আমার শক্তি তোমায় আচ্ছন্ন করিবে। আমার শক্তি আজীবন নাড়া চাড়া করিলে, মরণের পরেও সে শক্তি তোমায় ছাড়িবে কেন,—মৃত্যুর পূর্ব্বে সেই শক্তি সংস্কারে বাঁধা পড়িবে।

উ। স্বীকৃত হইলাম।

পি। আমি তোমার দাসের ন্যায় আজ্ঞাকারী হইলাম,—এক্ষণে কি করিতে হইবে, বল ?

উ। আমার ক্ষুধা হইয়াছে।

পি। ঐ ক্ষুদ্র বৃক্ষে যে কৃষ্ণবর্ণের পত্র দেখিতেছ, উহা ভক্ষণ কর।

উদয়েশ্বর যোগীর নির্দ্দেশে আর একবার ক্ষুদ্র বৃক্ষের রক্ত বর্ণ পত্র ভক্ষণ করিয়া প্রীত হইয়াছিল, দানবের নির্দ্দেশে কৃষ্ণবর্ণ পত্রও ভক্ষণ করিল—ইহা ভাজা মৎস্যের ন্যায় স্বাদ বিশিষ্ট ও সেইরূপ গন্ধ। উদয়েশ্বর পিশাচকে জিজ্ঞাসা করিল,—"এ কি ?" মৃদু হাসিয়া পিশাচ উত্তর করিল,—"আমিষ আমরা ভালবাসি।"

দ্বিতীয় খণ্ড।

জাহানারা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গৌড় নগরের পরিখা-সীমা মধ্যে রামকেলী গ্রামের দক্ষিণভাগে এক অতি বৃহৎ সৌধনির্ম্মিত হইতেছিল,—তাহার বিস্তার, তাহার দৈর্ঘ্য, তাহার কারুকার্য্য, তাহার শোভা-সৌন্দর্য্য, গৌড়েশ্বরের প্রাসাদকেও হারাইয়া দিতেছিল। এই বিপুল প্রাসাদ কে প্রস্তুত করাইতেছে তাহা কেহ অবগত নহে এই. প্রাসাদ যাহারা প্রস্তুত করিতেছে, তাহাদিগকেও কেহ চিনিত না,—সর্ব্বত্র রাষ্ট্র যে. পাশ্চাত্য প্রদেশ হইতে শিল্পী আনাইয়া এই বাড়ী প্রস্তুত হইতেছে, এবং অতি দূরতর স্থান সকল হইতে বহু মূল্যবান প্রস্তর সমূহ আনাইয়া এই সৌধের নির্ম্মাণ কার্য্য পরিসমাপ্তি হইতেছে।

অতি দ্রুততর ভাবে কার্য্য সম্পন্ন হওয়ায় ছয় মাসের মধ্যেই বাটীর নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা হইয়া গেল,—দেশী বিদেশী বহু মূল্যবান্ দ্রব্যসম্ভারে বাড়ীর সর্ব্বত্র সুসজ্জিত করা হইল,—বাড়ীর সম্মুখে তিন চারিটি সুন্দর দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী খনন করা হইল,—তারপরে যাহার বাড়ী, সে আসিল।

যে আসিল, সে উদয়েশ্বর। উদয়েশ্বর এই সুবিস্তৃত প্রাসাদের অধীশ্বর,—উদয়েশ্বর অগাধ-ধনের অধীশ্বর।

সত্বরেই গৌড়েশ্বরের কর্ণে কথা উঠিল যে. এক অতুল ধনশালী

ব্যক্তি গৌড়ের সীমা-মধ্যে অতুল শোভা সৌন্দর্য্য-শালী অভূতপূর্ব্ব প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় আসিয়া বাস করিতেছে,—তাহার ধনৈশ্বর্য্যের সীমা নাই,—সে ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে অর্দ্ধেক জগৎ ধন দ্বারা পূর্ণ করিয়া দিতে পারে।

গৌড়েশ্বর কালবিলম্ব করিলেন না, সত্বরেই তাঁহার একজন দূতকে সবিশেষ সন্ধান জানিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন,—দূত ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"যে ধনী ব্যক্তি আসিয়াছে, তাহার নাম উদয়েশ্বর। তাহার পূর্ব্বনিবাস কোথায়, তাহা জানিবার উপায় নাই,—জাতিতে না কি ব্রাহ্মণ।"

গৌড়েশ্বর তাহার ধনৈশ্বর্য্যের কথা শুনিয়া সুখী হইলেন না,—পাছে, সেই নবাগত ব্যক্তি গৌড়ের সিংহাসনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, পাছে, তাহার অতুল ধনবলে ওমরাহগণকে এবং সৈন্যাধক্ষ্যদিগকে বশীভূত করিয়া ফেলে,—তাই তিনি পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হইবেন, বিবেচনা করিলেন,—বৃক্ষকে অঙ্কুরে ছেদন করা সহজ, বৃহৎ হইতে দিলে কুঠার দ্বারা বহুকষ্টে ছেদন করিতে হয়।

উদয়েশ্বর নামক নবাগত ধনী ব্যক্তি কে, তাহাকে কি উপায়ে দোষী সাব্যস্ত করিয়া, তাহার সমস্ত সম্পত্তির সহিত প্রাসাদটী রাজসম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত করা যায়, বাদশাহ তচ্চিন্তায় ব্যস্ত হইলেন।

সহসা তাঁহার বাসনার সাফল্য ঘটিল, দবিরখাস সনাতন সংবাদ দিল যে, যে উদয়েশ্বরকে শূলদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, এবং যে কারাগার হইতে পলায়ন করে,—বোধ হয়, সেই উদয়েশ্বর হইবেন,—সন্ধান লওয়া কর্ত্তব্য।

গৌড়েশ্বর মহা আনন্দিত হইলেন। সেই দিবসই সহর কোতোয়ালকে পাঠাইয়া দিলেন,—সহর কোতোয়াল উদয়েশ্বরের নব নির্ম্মিত

প্রাসাদে গিয়া সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিল, উদয়েশ্বর সাক্ষাৎ করিবেন না, বলিয়া ভৃত্যের দ্বারা সংবাদ পাঠাইলেন।

কোতোয়াল ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিলেন। তিনি ধৈর্য্যধারণে অক্ষম হইয়া বলিলেন,—"উদয়েশ্বরের প্রতি শূলদণ্ডের আদেশ হয়, কিন্তু কারাগার হইতে পলায়ণ করে,—এতদিনে ফিরিয়া আসিয়াছে—আমি রাজাদেশে তাহাকে ধৃত করিতে আসিয়াছি।"

ভৃত্য সে কথা গিয়া তাহার প্রভু উদয়েশ্বরকে জানাইল। উদয়েশ্বরও ক্রোধে অঙ্গার মূর্ত্তি ধারণ করিল,—সে তাহার ভৃত্যের প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন যে,—দারোয়ানকে বল্‌গে কোতোয়ালের গলা ধাক্কা দিয়া এখনই বাড়ী হইতে দূর করিয়া দেয়, তাহাতে যেন কিছুমাত্র ভয় না করে।"

ভৃত্য দারোয়ানকে সে কথা বলিলে, তাহারা চারি পাঁচজন জুটিয়া কোতোয়ালকে ধাক্কা দিয়া বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিল। যথা সময়ে কোতোয়াল সে কথা গিয়া গৌড়েশ্বরের দরবারে নিবেদন করিল।

গৌড়েশ্বর চিন্তিত হইলেন। আশঙ্কা তিনি পূর্ব্ব হইতেই করিতেছিলেন,—উদয়েশ্বর বোধ হয় তাহাই করিয়াছে, অর্থাৎ সে বোধ হয়, ওমরাহগণের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া ফেলিয়াছে,—বোধ হয় দেশের লোকদিগকে ধনদ্বারা বশীভূত করিয়া ষড়যন্ত্রে মিশাইয়া লইয়াছে। তিনি চারিদিকে অবিশ্বাসের করাল ছায়া দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার প্রিয়তম এক ব্রাহ্মণ সেনাপতিকে আদেশ করিলেন, "যত সৈন্য সঙ্গে লওয়া তুমি বিবেচনা কর, তাহা লইয়াই উদয়েশ্বরকে ধৃত করিয়া আন,—কোন প্রকারেই তাহাকে কদাচ ক্ষমা করিবে না; কিন্তু খুব সাবধানতার সহিত কাজ করিবে,—ভিতরে ভিতরে বোধ হয় দেশের অনেক ওমরাহ তাহার সহিত যোগ দিয়াছে।"

বলগর্ব্বিত ব্রাহ্মণ যুবক বলিলেন,—"জাঁহাপনা, তজ্জন্য আপনি কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না। আমি অবলীলাক্রমে উদয়েশ্বরকে বাঁধিয়া আনিয়া দিব। তাহার অগাধ ধন থাকুক,—কিন্তু অস্ত্রবলের নিকট ধনবল গণ্যই হইতে পারে না।"

পর দিন অতি প্রত্যূষে তিন চারি হাজার সুশিক্ষিত সৈন্য সঙ্গে লইয়া ব্রাহ্মণ যুবক উদয়েশ্বরের প্রাসাদ আক্রমণ করিলেন। বাড়ীর চারিদিকে বৃহৎ বৃহৎ কামান পাতিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগের আদেশ দান করিলেন,—আর অশ্বারোহী সৈন্যদিগকে পুরী মধ্যে যাইতে অনুমতি করিলেন। অনুমতি পাইবা মাত্র সমুদ্র-কল্লোলের ন্যায় সৈন্যগণ গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—প্রলয়ের মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় অগ্নি সংযোগে কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—সহস্রাধিক আশ্বরোহী সৈন্য কোষোন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে লইয়া উদয়েশ্বরের প্রাসাদাভিমুখে প্রধাবিত হইল।

উদয়েশ্বরের প্রাসাদে বহুলোক বাস করিতেছিল,—দাস, দাসী, সূপকার, উচ্চশ্রেণীর কর্ম্মচারী, হস্তীরক্ষক, অশ্ব রক্ষক, গাভী রক্ষক প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারী, কয়েক জন দরোয়ান, এবং পালোয়ান ও এক শত কি দুই শত সিপাহী ছিল,—তাহারা প্রলয়ের গর্জ্জনবৎ সৈন্যগর্জ্জন ও ঘন ঘন কামানের কালানলবর্ষী ভীষণ শব্দ শুনিয়া জাগিয়া পড়িল। পালোয়ান ও সিপাহীগণ তাড়াতাড়ি তাহাদের অস্ত্র শস্ত্র লইয়া দরোজার বাহির হইল,—কিন্তু পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় অসংখ্য সৈন্য ও অস্ত্র শস্ত্র দেখিয়া তাহারা ভয় পাইল, এবং তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া প্রভুকে সংবাদ দিল।

উদয়েশ্বরের ভ্রুক্ষেপও নাই। মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল, —"তোমরা ভয় পাইয়াছ? ভাল, কা'ল হইতে ডা'ল রুটির ব্যবস্থা অধিক করিয়া দেওয়া যাইবে।

বকাউল্লা জমাদার বলিল ;—"খোদাবন্দ! অত সৈন্যের কাছে, আমরা এই কয়জনে কি করিতে পারিব? কিন্তু হুজুর ; উপায় কি? সকলকেই যে, জাহান্নমে দেবে।"

প্রসন্ন মুখে উদয়েশ্বর বলিল,—"তোমাদের কোন ভয় নাই তোমরা ভাঁড়ার হইতে ডা'ল ময়দা লইবার ব্যবস্থায় মনঃসংযোগ কর,—আমি একাই সমস্ত সৈন্য তাড়াইয়া দিয়া আসিতেছি।"

বকাউল্লা ভাবিল, প্রভু বোধ হয় অত্যধিক পরিমাণে সরাপ সেবন করিয়াছেন। সে বিস্মিত হইল,—কোন কথা কহিল না।

উদয়েশ্বর বলিল,—"একটা ঘোড়া তৈয়ারি করিয়া দাও।"

হুকুম তামিল হইল, অশ্ব সজ্জিত করিয়া উদয়েশ্বরের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল। উদয়েশ্বর একখানি রক্তবর্ণের তরবারি হস্তে লইয়া অশ্বারোহণ করিলেন, এবং বেগবান্ সেই অশ্বটিকে সৈন্য-সমুদ্রের মধ্যে চালাইয়া দিলেন। বকাউল্লা প্রভৃতি উদয়েশ্বরের লোকেরা ভাবিল, প্রভুর জীবনের আজি অবসান হইল।

কিন্তু সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইল,—উদয়েশ্বরের অশ্ব যে পথ দিয়া ছুটিয়া গেল, সেই দিকের অশ্বারোহী সমুদয় সৈন্য অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া ভূমিচুম্বন করিল। ক্রমে উদয়েশ্বরের অশ্ব পদাতিক সৈন্য-সমুদ্রে প্রবেশ করিল,—উদয়েশ্বর কাহাকেও অস্ত্রাঘাত করিলেন না—কিন্তু সকলেই পরাজয় স্বীকার করিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল—গোলন্দাজগণ কামানের নিকট হইতে বহুদূর গিয়া দণ্ডায়মান হইল।

যে ব্রাহ্মণ যুবক সেনাপতি হইয়া আসিয়াছিল, উদয়েশ্বর কেবল তাহাকে ধৃত করিলেন,—কাচপোকা যেমন তেলাপোকাকে ধরিয়া

আনে,—অনায়াসে, অবহেলে উদয়েশ্বর তদ্রূপ অনায়াসে—অবহেলে তাহাকে লইয়া নিজ পুরী মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

উদয়েশ্বর অভূতপূর্ব্ব দ্রব্য সম্ভারে সুসজ্জিত নিজ বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণ যুবককে একখানা আসন দেখাইয়া দিয়া বসিতে বলিলেন। সে তখন কাঁপিতেছিল,—এরূপ কম্পের কারণ সে নিজেই কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। তারপরে আসন গ্রহণ করিল—উদয়েশ্বরও একখানা বহুমূল্যবান্ আসনে উপবেশন করিলেন। গৌড়েশ্বরের সেনাপতির মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"তোমার কি অত্যন্ত ভয় করিতেছে?

কম্পিত কণ্ঠে গৌড়েশ্বরের সেনাপতি বলিলেন,—"ভয় হইতেছে না, তথাপি আমি কাঁপিতেছি,—কেন কাঁপিতেছি, তাহা আমি নিজেই ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না, তথাপি কাঁপিতেছি।"

উ। তোমাদের দুর্ব্বুদ্ধি, আমার সহিত লড়াই করিতে আসা পতঙ্গ বৃত্তি গ্রহণ করা।

সে। এখন তাহা বুঝিতে পারিতেছি।

উ। আর কিছু বুঝিয়াছ কি?

সে। বুঝিয়াছি,—আপনি কোন দৈববলে বলীয়ান্।

উ। তোমার একটি সৈন্যও প্রাণে মরে নাই,—তাহাদিগকে লইয়া ফিরিয়া যাও।

সে। আপনার মত ক্ষমতা কি আর কেহ লাভ করিতে পারে না?

উ। না। তবে আমি যাহার প্রতি প্রসন্ন হই, জগতে তাহাকে অজেয় করিতে পারি।

সে। এ অধীন কি সে করুণা পাইতে পারে না?

উ। হাঁ, কিন্তু কতকগুলি কাজ করিতে হইবে।

সে। স্বীকৃত আছি।

উ। তবে সময়ে আসিও।

সেনাপতি বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উদয়েশ্বরের অদ্ভুত ক্ষমতার কথা যথা সময়ে সেনাপতি তাহার প্রভু গৌড়েশ্বরের নিকটে নিবেদন করিল। তিনি শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন,—তখন বিবেচনা করিলেন, এই ব্যক্তির সহিত সখ্য না করিলে আর নিস্তার নাই। অল্পদিনের মধ্যেই গৌড়েশ্বর উদয়েশ্বরের পরম বন্ধু হইয়া পড়িলেন। অল্পদিনের মধ্যেই উদয়েশ্বর গৌড়ে একজন বিখ্যাত ধনী ও ক্ষমতাশালী লোক বলিয়া পরিগণিত হইলেন যাহার কথা বাদশা না শুনিয়া থাকিতে পারেন না, যাহার ধনরাশির সংখ্যা কেহ করিয়া উঠিতে পারে না, যাহার দান ও খয়রাতের তুলনা হইতে পারে না, যাহার প্রতাপে বাদশাও নম্রশির, তাহার প্রতিপত্তি ও গৌরব যে, সকলের মুখে মুখে ঘোষিত হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি?

কিন্তু উদয়েশ্বরের প্রাণের পিপাসা এখনও মিটে নাই,—তাহার হৃদয়ে শান্তি আইসে নাই। যাহার জন্য তিনি সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া আয়োজন করিয়া বসিয়াছেন,—যাহাকে তিনি এক মুহূর্ত্ত ভুলিতে পারেন নাই, যাহার জন্য তিনি দেবতা ত্যাগ করিয়া দানবের অধীন হইয়াছেন—পুণ্যের সাধনা পরিত্যাগ করিয়া পাপের আশ্রয় লইয়াছেন,—সেই জাহানারার কোন সন্ধানই মিলিতেছে না। কেহই জাহানারার সংবাদ বলিতে পারে না। মোকদ্দমশার বাগান এখন জনশূন্য—সেখানে কেহই নাই। বাহিরের লোকে বলে, মোকদ্দমশা তাঁহার শিষ্য-শাখা সমভিব্যাহারে মদিনার পথে চলিয়া গিয়াছেন।

যদি জাহানারাকে না পাওয়া গেল, তবে বৃথায় এই শক্তি লাভ।

মনের দুষ্পুর বাসনার নিবৃত্তির জন্যইত পিশাচ সাধনা করা হইয়াছ,—কিন্তু পৈশাচী শক্তিতে জাহানারার কোন তত্ত্বই আবিষ্কৃত হয় না।

তারপর মালতীর কথা। উদয়েশ্বর মালতীর সন্ধানও লইয়াছিল,—পথের পাথিকের সহিত আলাপ হইলে, আবার সেই পথে গেলে যেমন পথিকের কথা মনে হয়, তেমনই একটু ক্ষুদ্র আসক্তি মালতীর সংবাদ পাইবার জন্য হইয়াছিল। উদয়েশ্বর মালতীর সন্ধান লইয়াছিল। কিন্তু তাহারও কোন সন্ধান মিলে নাই। লোকে বলিল.—মালতীর পিতার মৃত্যুর পরে, সে সমস্ত সম্পত্তি শীতলরায়ের নামে লিখিয়া পড়িয়া দিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। উদয়েশ্বরের একবার মনে হইয়াছিল—শীতল রায় হয় ত মালতীর সংবাদ জানিতে পারে, তাহাকে ডাকিয়া একবার জিজ্ঞাসা করা যাউক,—কিন্তু সে ইচ্ছা স্থায়ী হয় নাই—কাজেই শীতলরায়কে ডাকিয়া অভাগিনীর কথা জিজ্ঞাসাও করা হয় নাই। উদয়েশ্বর একা—সেই জন কোলাহল মুখরিত প্রকাণ্ড প্রাসাদে। নিঃসঙ্গ অবস্থায় উদয়েশ্বর দিনগুলা কাটাইয়া দিতেছিল। তাহার মনে শান্তি নাই,—কেন না, উদয়েশ্বরের জাহানারা নাই। জাহানারার সংবাদ পাইবার জন্য সর্ব্বত্র লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে।

একদিন মধ্যাহ্নকালের দিবা ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল, বাদশাহের অন্যতর সেনাপতি কালাপাহাড় একটা কালো রঙ্গের অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক উদয়েশ্বরের প্রাসাদের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক বাটীর মধ্যে চলিয়া গেল।

উদয়েশ্বর তখন উন্মনা হইয়া বৈঠকখানার এক প্রকোষ্ঠ মধ্যে বসিয়া কি ভাবিতেছিল। কালাপাহাড় তথায় উপস্থিত হইয়া অভিবাদন করিয়া বলিল,—"আপনার নিকটে আমি আসিয়াছি।"

উদয়েশ্বর চোখে মুখে প্রসন্নতার ভাব আনিয়া কালাপাহাড়কে বসিতে বলিলেন।

কালাপাহাড় আসন পরিগ্রহ করিয়া বলিল,—যে জন্য আসিয়াছি, তাহা শুনুন।"

উ। হাঁ, বল।

কা। আপনি আমাকে কোন গুপ্ত বিষয় শিক্ষা দিবেন বলিয়াছেন।

উ। আমি গুপ্ত বিষয় কি জানি ?

কা। আপনি কোন দৈবশক্তিতে শক্তিমান্।

উ। দৈব ? ও কথা মুখে আনিও না। দেবতা আমি মানি না।

কা। আপনি হিন্দু নহেন কি ?

উ। হিন্দু মুসলমান সব সমান,—সব মানুস।

কা। আপনার উদার মতকে প্রশংসা করি,—কিন্তু অনেকে অনুমান করেন, আপনি হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী।

উ। মিথ্যা অনুমান। আমি ধর্ম্ম মানি না।

কা। কোন ধর্ম্মই না ?

উ। না।

কা। অনেকে সে কথাও বলেন,—আপনার এত সম্পত্তি, আপনি কোন দিন প্রতিমা পূজা আদি করেন না,—কিন্তু প্রতিমা পূজাটা একেবারেই খারাপ !

উ। তুমি বুঝি সম্প্রতি হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছে ?

কা। আজ্ঞা, হাঁ।

উ। তোমার কাছে প্রতিমা পূজা বড়ই খারাপ হইতে পারে, আমার কাছে কিন্তু ধর্ম্ম মাত্রেই খারাপ,—তুমি মুসলমান ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পার ?

কা। তাহা হইলে কি হয় ?

উ। আমি তোমাকে এমন ক্ষমতাবান্ করিতে পারি যে, তোমার সঙ্গে কেহই আঁটিয়া উঠে না।

কা। তা পারি,—সত্য কথা বলিতে কি, আমিও ধর্ম্ম মানি না, বা বুঝিতে পারি না। ছিলাম হিন্দু, দেখিলাম রাজা মুসলমান—মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে রাজার প্রিয়পাত্র হইতে পারিব, এই আশাতেই আমার মুসলমান হওয়া,—আমি মুসলমান ধর্ম্মও বুঝি নাই।

উ। বেশ করিয়াছ—কিন্তু ওটাও ছাড়িয়া দাও। নমাজ টমাজ পড়িয়া থাক ?

কা। পড়ি, কিন্তু কেন পড়ি, তা বুঝি না।

উ। নাই বোঝ, তাহাও ছাড়িয়া দিও। খাদ্যাখাদ্যের কোন বাঁধা ধরা নিয়ম রাখিও না।

কা। আপনার সমস্ত কথাই বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করিব, কিন্তু আমাকে আপনার ন্যায় শক্তিমান্ করুন।

উ। তবে বলি শোন,—তুমি আর আমি জানিব অন্য কেহ যেন একথা ঘুণাক্ষরেও না জানে। আমি শক্তিমান্ একথা নিশ্চয়—কিন্তু এ শক্তি আমার স্বভাবজ। আপনিই হইয়াছে,—তবে আমি তোমার এক কাজ করিতে পারি—তুমি যখন কোন যুদ্ধে যাইবে, আমি গোপনে তথায় গিয়া তোমার বিপক্ষ সৈন্যগণকে রসাতলে দিয়া আসিব। তাহা হইলে তোমার নাম হইবে, যশ হইবে, কিন্তু কোন প্রকারে যেন আমার নাম প্রকাশ না পায়।

কা। এমন করিলেও আমি বাধিত হইব। আমার যশোহানি করিয়া কখনই আপনার নাম আমি প্রকাশ করিয়া দিব না। কিন্তু আপনি আমার জন্য সে কষ্ট সহ্য করিতে যাবেন কেন ?

উ। যাব কেন, তাহাও বলিতেছি,—আমার হৃদয়ে সর্ব্বদাই এক অদম্য বাসনার উদ্ভব হয়,—আমার ইচ্ছা হয়, জগতে যত দেব মন্দির আছে,—সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ধ্বংস করিয়া ফেলি। আমি তোমাকে বড় বড় যুদ্ধে জয়ী করিয়া দিব—কিন্তু তুমি দেব মন্দির চূর্ণ করিয়া দেবচিত্র, খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিয়া দিবে।

কা। যে আজ্ঞা,—তবে একটি কথা।

উ। কি?

কা। মুসলমান এখন রাজা—তাদের মস্‌জিদ-আদি ভাঙ্গিতে পারিব না—তবে হিন্দুর দেবতা ও দেবমন্দির দেখিলেই চূর্ণ করিয়া দিব। উড়িষ্যায় মহাসমর চলিতেছে,—আমি আগামী কল্যই সে দেশে যাইব,—যদি আপনি আমাকে সে যুদ্ধে জয়ী করিয়া দেন,—উড়িষ্যার যত দেব-মন্দির,—বিনষ্ট করিয়া আসিব।

উ। আমি নিশ্চয় তোমাকে জয়ী করিয়া দিব।

কা। আপনি কবে যাবেন?

উ। আমি যাব, এই পর্য্যন্ত জানিয়া লও,—কবে যাব, তার খোঁজ লইও না আমার কাজ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিও না, বা অনু-সন্ধান লইও না—তবে ইহা নিশ্চয় জানিও যে, আমি যাহা বলিব—তাহা নিশ্চয় প্রতিপালন করিব।

কালাপাহাড় প্রতিজ্ঞা করিল, হিন্দুর দেববিগ্রহ ও দেবমন্দির দেখি-লেই চূর্ণ করিয়া দিব,—উদয়েশ্বর প্রতিজ্ঞা করিল, প্রতি যুদ্ধেই তোমাকে জয়ী করিয়া দিয়া তোমাকে যশস্বী করিব।

কালাপাহাড় বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। উদয়েশ্বর উঠিল,—বাহিরে গিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার জ্ঞান হইল, সমস্ত আকাশ রক্তমেঘে ছাইয়া পড়িয়াছে। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বিদ্যুতের

রেখা এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটিয়া ছুটিয়া ধাইয়া বেড়াইতেছে—দিক্ সমুদয় নীরব নিস্তব্ধ। এক একবার কেবল দানবীদীপ্তি চমকিয়া চমকিয়া চলিয়া যাইতেছে। উদয়েশ্বরও চমকিয়া উঠিল,—তাহার প্রাণের রক্ত হিম হইয়া উঠিল। মনে হইল, কাজ ভাল হয় নাই,—দু'দণ্ডের জন্য এমন সাধের মরণে বরণ করা কর্ত্তব্য হয় নাই,—কিন্তু তখনই মনে হইল, জাহানারার অনিন্দ্য সুন্দর রূপ কত জন্ম জন্ম ধ্যান করিয়াছি, পাইনি কেন? যদি দেখিতে পাইয়াছি,—তবে ছাড়িব কেন? কোথাকার নিবৃত্তি—এই ঘোর জড়, বন্ধুর পথে চলিব,—পরকাল সেটি বালক ভুলান কথা হইতে পারে—কিন্তু ইহকালের সুখ ছাড়িয়া পরকালের জন্য সর্ব্বস্বত্যাগ,—জাহানারাকে ত্যাগ, কখনই হইতে পারে না। হয়, আকাশ হইতে রক্ত বৃষ্টি হউক,—যায় রক্তবন্যায় দিগন্ত ভাসিয়া যাক্,—শত শত রক্ত নাগিনী তাহাদের শত শত রক্তফণা তুলিয়া গর্জ্জন করুক—কিন্তু সকলই মিথ্যা বিভীষিকা। জগতে জাহানারার রূপই স্বর্গ—আর স্বর্গ কোথায়? জাহানারাকে লাভ করিব,—আর এই সর্ব্বলোকোপরি সম্মান,—অগাধ ধনরাশি, অতুল ক্ষমতা—কাহার আছে? কেবল শুষ্ক একটু শান্তি আর দেবতার একটি পারিজাত ফুল, ইহা লইয়া থাকিলে কি হইত? ডাক আকাশ—তোমার রক্তাম্বুগর্ভ মেঘমালা লইয়া মরণের প্রলয় গর্জ্জনে ডাক,—নরকের অন্ধকার বিদ্যুতাকারে ছুটিয়া যাও, মহাপাতকের রক্ত নাগিনীগণ, ফুলিয়া ফুলিয়া গর্জ্জিয়া নিশ্বাস ছাড়—আমি দৃক্পাতও করিব না। অশান্তি—সে গ্রাহ্য করি না। যার অতুল ধন আছে—ধনী বলিয়া সম্ভ্রম আছে, দানবী ক্ষমতা আছে, তাহার আবার অশান্তি কিসের।

উদয়েশ্বর মনে মনে একই নিশ্বাসে এ ক'টি কথার আলোচনা করিয়া

ফেলিল। প্রাণে শান্তি আসিল না,—অশান্তি তাহার শতবাহু সৃজন করিয়া প্রাণের মধ্যে প্রেতমূর্ত্তিতে ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল।

একজন ভৃত্য আসিয়া অভিবাদন করিয়া বলিল,—"প্রভু; একজন লোক আপনাকে খুঁজিতেছে।"

উদয়শ্বরের মেজাজটা তখন বড় খিট-খিটে ছিল। সে, ভৃত্যের দিকে রোষ কষায়িত লোচনে চাহিয়া বলিল,—"যখন তখন আমাকে আসিয়া জ্বালাস্,—কে লোক, কোথাকার লোক! আমি গৌড়ের বাদশারও বাদশা,—যখন তখন আমার কাছে লোক,—দূর হ গাধা।"

ভৃত্য ভীত কম্পিত বিশুষ্ক মুখে বলিল,—"আজ্ঞা হুজুর, আমি তাকে বলেছিলাম, এখন দেখা হবে না,—সে বলিল, আমি যাহাকে অনুসন্ধান করতে গিয়াছিলাম—তাহার সন্ধান পাইয়াছি।"

ধাঁ করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া উদয়েশ্বর বলিল,—"কোথায়—কোথায় সে! শীঘ্র এখানে ডাক।"

ভৃত্য চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে অপর একজন লোক আসিয়া উদয়েশ্বরকে অভিবাদন করিল। যে আসিল, সে উদয়েশ্বরের পরিচিত। উদয়েশ্বর তাহাকে জাহানারার অনুসন্ধানে পাঠাইয়াছিল।

সে আসিয়া দাঁড়াইবা মাত্র উদয়েশ্বর জিজ্ঞাসা করিল,—"তাহার খোঁজ পাইয়াছ, আবদুল্যা?"

আ। আজ্ঞা হাঁ, খোঁজ পাইয়াছি।

উ। কোথায় আছে, শীঘ্র বল?

আ। নিকটেই,—অধিক দূরে নহে। এই রামকেলী গ্রামের সাতক্রোশ দূরে—এক সুন্দর বাগানের মধ্যে, এক সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বসতি করিতেছে।

উ। কে? জাহানারা?

আ। হাঁ।

উ। সেখানে আর কে আছে?

আ। বর্ত্তমানে কেহ নাই,—জনশূন্য বাগানে, সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া একাই আছে,—তবে সময়ে সময়ে অনেক সাধু সন্ন্যাসী আসিয়া সমবেত হয়।

উ। আমি অদ্যই সেখানে গমন করিব।

আ। আমি সংবাদ মাত্র আনিয়া দিলাম, এখন আপনার যাহা অভিরুচি হয়, তাহাই করুন।

উদয়েশ্বর তাহাকে যথোচিত পুরস্কার প্রদান করিয়া বিদায় করিয়া দিল, এবং সহিসকে অশ্ব সজ্জা করিতে বলিয়া নিজে গমনোদ্যোগ করিতে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাত্রি প্রায় চারিদণ্ড উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সাতকানিয়ার সুপ্রকাণ্ড আম্র বাগানের পার্শ্বে দুইটা গৃহশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী খালি জমিতে বসিয়া কয়েক জন দরিদ্র কৃষক গল্প গুজব করিতেছিল। আশ্বিন মাস; এখনই ঘাসের উপরে শিশির জমিয়াছে; বাতাস একটু শীতলস্পর্শ। মধ্যস্থলে কতকগুলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড ও শুষ্কপত্র জ্বালাইয়া কৃষকেরা তাহা ঘিরিয়া বসিয়াছিল। তাহারা দিবসের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর মধ্যে মধ্যে এইরূপে একত্রে বসিয়া বিশ্রান্তালাপ করিত। এবং কেহ কেহ বা গান গাহিয়া, কেহ ধর্ম্ম কথা বলিয়া পরস্পর চিত্তবিনোদন করিত।

শুষ্কপত্রের সহিত ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ডস্তূপ ধীরে ধীরে পুড়িতেছিল, আর ঈষৎ পীতাভ গাঢ় ধূসর ধূমরাশি উঠিয়া বাতাসে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। আকাশে চন্দ্র উঠিয়াছে;—চন্দ্রকিরণে সুপ্ত বাগানের মধ্যে সমীর এক একবার মন্থর গমনে চলিয়া যাইতেছিল। মধ্যে মধ্যে দুই একখানা লঘু মেঘ গগনপথে অল্পক্ষণের জন্য চন্দ্রকিরণ আচ্ছাদিত করিয়া ছায়ালোক বৈচিত্র্যে যেন প্রেতলোকের আভাস দিয়া যাইতেছে।

সহসা কৃষকেরা দেখিল, এক প্রকাণ্ড অশ্বে আরোহণ করিয়া একজন লোক আসিয়া তাহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইল। তদ্দর্শনে তাহারা সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইল,—এবং চকিত বিস্মিত নয়নে অশ্বারোহীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিল, এবং কাষ্ঠখণ্ডগুলি আপন মনে পুড়িয়া পুড়িয়া ধূমোদ্গীরণ করিতে লাগিল।

অশ্বারোহী উদয়েশ্বর। উদয়েশ্বর জিজ্ঞাসা করিল,—"এ গ্রামের কি নাম?"

কৃষকেরা বুঝিল, কোন ওমরাহ ব্যক্তি হইবে। বলিল—"আজ্ঞা একে সাতকানিয়ার বাগান বলে।"

উদয়েশ্বর তখনও অশ্বোপরি ছিল। বল্গাকর্ষণে তেজস্বী অশ্ব নাচিতেছিল, দুলিতেছিল, এবং শ্রমজল নির্গমন করিতেছিল।

উ। এই বাগানের নিকটে কোন স্ত্রীলোক আসিয়া নূতন বাড়ী করিয়াছে, বলিতে পার?

কৃ। আজ্ঞা হাঁ।—এই বাগানটার দক্ষিণদিকে, এক খানি সুন্দর বাড়ী ও একটি বাগান তৈয়ারি ক'রে একজন স্ত্রীলোক বাস করিতেছেন।

যে কথা বলিল. তদীয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান অপর কৃষক বলিল,—"এক জন মেয়েমানুষ, সেখানে নিয়মিত বাস করেন:—কিন্তু আর একজন মাঝে মাঝে সেখানে আসিয়া থাকে।

উ। কোন্ পথ দিয়া সেখানে যাইতে হয়?

কৃ। যে পথে যাচ্চেন, এই পথে একটু এগিয়ে গিয়ে ডানপাশের পথ ধ'রে গেলেই সম্মুখে বাড়ী।

উদয়েশ্বর অশ্ববল্গা শ্লথ করিয়া দিয়া তদীয় কক্ষে পদ ঘর্ষণ করিল.—অশ্ব আবার দ্রুত গতিতে চলিয়া গেল।

যথানির্দ্দিষ্ট পথে গমন করিয়া সম্মুখে বাড়ী দেখিতে পাইয়া, তন্নিকটবর্ত্তী হইয়া উদয়েশ্বর অশ্ব হইতে অবতরণ করিল, এবং অশ্ব বল্গা একটা আম্র বৃক্ষের শাখায় বন্ধন করিয়া রাখিয়া সেই বাটীর দিকে অগ্রসর হইল।

আকাশে প্রফুল্ল জ্যোৎস্না—ধরাতলও সেই জ্যোৎস্নার ন্যায় দিগন্ত হারাইয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে। উদয়েশ্বর সেই ফুটন্ত জ্যোৎস্নায় দেখিল,—একখানি আটচালা সেই নিথর জ্যোৎস্না মাখিয়া নীরবে

দাঁড়াইয়া আছে। আটচালার আশে পাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিন চারি খানি গৃহ,—আটচালা ও গৃহগুলি খড়ের ছাওয়া ও চেটাইয়ের বেড়া দেওয়া। আটচালার চারিপার্শ্বে বংশ-বাড়। উদয়েশ্বর আটচালার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া ডাকিল,—"গৃহে কে আছ গো।"

ঝণাৎ করিয়া দ্বার খুলিয়া গেল। একটা প্রদীপ হস্তে লইয়া এক রমণী মূর্ত্তি বাহির হইল। রমণীর লুলিত কুন্তল রুক্ষ, পরিধানে গৈরিক মৃৎ রঞ্জিত বসন,—আপন রূপে আপনি ফাটিয়া পড়িতেছিল,—সে রূপ দেখিলে পাষাণও ভক্তিরসে দ্রবীভূত হয়। উদয়েশ্বর সে মূর্ত্তি চিনিল,—তাহারই আজন্ম ধ্যানের মধুর মূর্ত্তি জাহানারা।

জাহানারাও উদয়েশ্বরকে চিনিল। মৃদু হাসিয়া বলিল,—"তুমি উদয়েশ্বর? এস, এস,—কত দিন তোমার সংবাদ পাই নাই।"

উদয়েশ্বর সে আদর-অভ্যর্থনায় দ্রব হইয়া গেল। উদয়েশ্বর বলিল,—"আমি তোমাকে কত খুঁজিয়া তবে এখানে আসিয়াছি।"

জাহানারা বলিল,—"সব কথা শুনিব, এখন একটু বিশ্রাম কর। বোধ হয়, অত্যন্ত পথশ্রম হইয়া থাকিবে।"

উদয়েশ্বর আর সে কথার কোন উত্তর করিতে পারিল না। সে চুম্বকাকর্ষিত লৌহের ন্যায় জাহানারার সমীপস্থ হইল। জাহানারা তাহাকে লইয়া গৃহমধ্যে গমন করিল।

গৃহে উজ্জ্বল প্রদীপ জ্বলিতেছিল। গৃহের একপার্শ্বে একখানি মৃগ চর্ম্ম আস্তৃত ছিল এবং সেই মৃগ চর্ম্মের সম্মুখে একখানি পাতঞ্জলদর্শন পুঁথি খোলা ছিল,—উদয়েশ্বর বুঝিল না সেখানা কি পুঁথি, কিন্তু ইহা বুঝিল যে, মৃগচর্ম্মের আসনে বসিয়া জাহানারা পুঁথি পড়িতেছিল।

জাহানারা তাড়াতাড়ি একখানি কম্বলের আসন পাতিয়া উদয়েশ্বরকে

বসিতে বলিল। উদয়েশ্বর আসনে উপবেশন করিলে জাহানারা জিজ্ঞাসা করিল,—"কেমন আছ ?"

উ। আর সব বিষয়ে ভাল আছি,—কেবল তোমার কাঙ্গাল হইয়া ফিরিতেছি।

জা। ও কাঙ্গালে ক্ষতি হ'বে না। আর ত সব ভাল, সেই ভালই ভাল।

উ। তুমি আমার সম্মুখে খানিক ব'স।

জা। (মৃদু হাসিয়া) কেন, খানিক দেখিবে নাকি ?

উ। কত দীর্ঘ দিন দেখি নাই—কত বর্ষ মাস কাটিয়া গিয়াছে,—তোমায় দেখি নাই। তোমার জন্য আত্মবলি—না না, ওর ভাল বাঙ্গালাটা কি ?

জা। কথাটা বলিতে বলিতে চাপিয়া গেলে যে,—আত্মবলি সুন্দর কথা। আমার জন্য আত্মবলি—কি বলিতেছিলে ?

উদয়েশ্বর কথাটা ধাঁ করিয়া সামলাইয়া লইয়া বলিল,—"যদি ঐ কথাই ভাল হয়, তবে ঐ কথাতেই বলিতেছি—তোমার জন্য আত্মবলি দিতেও কুণ্ঠিত হই নাই, অর্থাৎ আবার দেশে ফিরিয়া আসিতে ভয় করি নাই। তবু এত দিন দেখা পাই নাই—কত সন্ধানে, কত চেষ্টায়, যদি দেখা পাইয়াছি—তবে দাঁড়াও ভাল করিয়া দেখিয়া লই।"

কথাটা জাহানারার মনের মত হইল না। তাহার মনে যেন সন্দেহের একটু ক্ষুদ্র অবিশ্বাসের ছায়া পড়িল। সে বুঝিল, উদয়েশ্বর কি একটা কথা চাপিয়া গেল।

উদয়েশ্বর পুনরপি বলিল,—"শোন জাহানারা, সেই প্রথম দর্শনাবধি তোমার ও চারু মূর্ত্তি এ হৃদয় হইতে এক মুহূর্ত্তও নামাইতে পারি

নাই,—যেখানে যখন যে অবস্থাতেই ছিলাম, তোমাকেই ভাবিয়াছি—তুমিই আমার একমাত্র ধ্যানের প্রতিমা।"

জাহানারা মৃগচর্ম্মের আসনখানা আর একটু টানিয়া আনিয়া, তাহার উপরে উপবেশন করিল। মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল,—"কেন উদয়েশ্বর ; আমার উপরে তোমার এত আকাঙ্ক্ষা কেন ?"

উ। কেন আকুল-আকাঙ্ক্ষা, তা জানি না জাহানারা। এইমাত্র জানি, তুমি না থাকিলে বুঝি, আমার মানবজীবন বৃথা।

জা। তুমি আমার নিকটে সেই বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছিলে,—সে অনেক দিনের কথা, তারপর কোথায় গিয়াছিলে ?

উ। অনেক দেশ ঘুরিয়াছি—রাজভয়ে ছুটিয়া ছুটিয়া পলাইয়াছি—তারপরে ব্রহ্মদেশে গিয়াছিলাম, সেখান হইতে দেশে আসিয়াছি।

জা। তুমি আসিয়াছ, গৌড়েশ্বর তাহা জানিতে পারিয়াছেন, কি ?

উ। হাঁ পারিয়াছেন।

জা। তুমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মনুষ্য,—এত দিন পরে ফিরিয়া আসিলে, তথাপিও বাদশা জানিতে পারিলেন কি প্রকারে ? বোধহয়, কোন লোক সন্ধান দিয়া দিয়াছে।

উ। না না, জাহানারা ;- আমি এখন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র নহি আমি গৌড়ের মধ্যে অদ্বিতীয় ধনী। তুমি বলিয়াছিলে বিষয় হইলে, বিবাহের ব্যবস্থা হইবে,—তাই আমি বিষয় করিয়াছি। আমার সম্পত্তি, আমিই স্থির করিতে পারি না তাহার সংখ্যা কত ? আমাকে আর কাঁদাইও না,—ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য তোমার পদতলে ঢালিয়া দিব,—তুমি আমার গৃহে চল।

জাহানারা বলিল,—"আমায় দেখিতে ভালবাস—দেখিয়া সুখী হও ; ঘরে লইবার বাসনা কেন ?"

উ। ওরূপ দেখিয়া আমার বাসনা পূর্ণ হয় না,—প্রাণে প্রাণে হৃদয়ে হৃদয়ে মিশাইতে চাহি। দুই মিশিয়া এক হইতে চাহি।

জা। জগতে দুই আছে, তা জান?

উ। বুঝিতে পারিলাম না।

জা। বলিতেছি শোন,—জগতে যথার্থই দুই আছে,—প্রকৃতি আর পুরুষ। পুরুষ প্রকৃতির লালসায় উন্মত্ত প্রকৃতি পুরুষের প্রেমের কাঙ্গালিনী। রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দের জগতের প্রাণ প্রকৃতি—আর ভাব পুরুষ। এই দুইয়ের মিলনে রসোপভোগ। এই দুইয়ের মিলনে আনন্দ উপভোগ। কিন্তু পুরুষ প্রকৃতির মিলন না হইলে, সে আনন্দ হয় না,—সেখানে দুঃখ আর বাসনা। বাসনার নিবৃত্তি নাই—জন্ম জন্ম যুগ যুগ বাসনার আকুল পিপাসার শান্তি হয় না।

উ। মেয়ে মানুষকেই ত প্রকৃতি বলে, আর বেটা মানুষকে পুরুষ বলে। দুইয়ের মিলনে আনন্দ হয়।

জা। তা হয়,—স্ত্রীলোক প্রকৃতির অংশ অধিক,—তারা জননী, পুরুষ জনক, তাই ভাব সুতরাং পুরুষের সত্ত্ব,—কিন্তু যারা প্রকৃতির অধীন; প্রকৃতিকে বশে রাখিয়া, প্রকৃতির আসক্তি নষ্ট করিয়া, যে পুরুষ, পুরুষানুসন্ধানে নিরত—সেই রসোপভোগী,—নতুবা কামচারী।

উ। এই পুরুষ আর প্রকৃতি কি।

জা। সাংখ্য ইহাদিগের নাম দিয়াছেন—প্রকৃতি ও পুরুষ। তন্ত্র বলেন, শিব দুর্গা, কিন্তু এই প্রকৃতি ও পুরুষ—রসের অবতার শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ।

উদয়েশ্বর চমকিয়া উঠিল, লাফাইয়া দাঁড়াইতে যাইতেছিল, অনেক কষ্টে সামলাইয়া লইয়া বলিল—"ও সকল কথা ছাড়—জাহানারা, আমার হবে কি না, তাই বল?"

জাহানারা উদয়েশ্বরের ভাব লক্ষ্য করিয়া মনে মনে চিন্তিত হইল। কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিল না।

জাহানারাকে চিন্তা করিতে দেখিয়া উদয়েশ্বর বলিল,—"কি ভাবিতেছ জাহানারা? আমি তোমা ভিন্ন বাঁচিব না।

জা। তাই ভাব্‌ছি। ভাল একথার উত্তর আর একদিন দিব।

উ। তবে কি আজ এইরূপেই ফিরিব?

জা। হাঁ।

উ। তবে যাই?

জা। যাই বলিতে নাই,—এস।

উদয়েশ্বর উঠিয়া চলিয়া গেল। জাহানারা যেন স্পষ্ট অনুভব করিল, উদয়েশ্বরের চক্ষু দিয়া দানবীশক্তির অনল নিঃশ্বাস বহিয়া গেল।
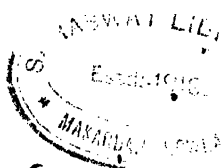
চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বৃক্ষকাণ্ড হইতে অশ্ববল্গা খুলিয়া লইয়া উদয়েশ্বর তাহাতে আরোহণ করিল,—দানবীশক্তিসম্পন্ন অশ্ব তীরবেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

পথে যাইতে যাইতে উদয়েশ্বর ভাবিতে লাগিল,—জাহানারা কামরূপিণী জাহানারা—যতবার দেখি, ততবারই যেন নূতন দেখি। আজ রুক্ষ চুলে গেরুয়া কাপড়ে যে রূপ দেখিলাম, অমন রূপ রাজরাণীতেও নাই, ও রূপ উপভোগ করিতে না পারিলে, আমার জীবনই বৃথা। জাহানারার জন্যই দানবের কোলে দেহ ঢালিয়া দিয়াছি,—পুণ্যের পথ ছাড়িয়া দিয়া পাপের সাধনা করিয়াছি। জাহানারা সহজে বিবাহে সম্মতি না দেয়, অবশেষে দানবী শক্তিতে আকর্ষণ করিব। আমি পিশাচসিদ্ধ,—আমার সঙ্গে জগতে কেহ পারে না। কিন্তু হায়! জাহানারার সাধনা আর আমার সাধনা যেন অমৃত অগ্নির প্রভেদ,—কি শান্তি—কি আনন্দ, তাহার সমস্ত আটচালায় যেন ছড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। আর আমার হৃদয়ে যেন আগুনের হল্কা দিবানিশি বহিয়া যাইতেছে,—শান্তি প্রাণের জাহানারাই শান্তি।

সহসা উদয়েশ্বরের মনে হইল, খড়্গসিং, রোমানী ইহাদিগের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই,—হতভাগিনী চন্দ্রারই বা কি গতি হইল, তাহাও জানা হয় নাই,—বহুদিন সেখান হইতে আসিয়াছি। উদয়েশ্বরের ইচ্ছা হইল, সেখানে যাইবে,—পিশাচসিদ্ধ উদয়েশ্বরের অসাধ্য কিছুই ছিল না। পৈশাচিক বলে—দানবী শক্তিতে সে কত দীর্ঘদিনের

পথ একরাত্রির মধ্যেই অতিক্রম করিয়া আঙ্গোটিং পাহাড়ে উপস্থিত হইল।

সেখানে গিয়া আড্ডার নিকটে উপস্থিত হইতেই একটা ঝরণার পার্শ্বে বনান্তরালে রমণীর করুণ ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইল। সে ক্রন্দন স্বর এক একবার উত্থিত হইতেছে, আবার এক একবার স্বর নরম পড়িতেছে—এবং ক্রন্দনস্বরে কথা হইতেছে। আর একজন পুরুষও যেন তাহার সহিত কথা কহিতেছে। ঝরণার অপর পার্শ্বস্থ একটা পার্ব্বতীয় বৃক্ষ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্থিরকর্ণে উদয়েশ্বর সে স্বর লক্ষ্য করিল।

ক্রন্দনস্বরে কথা হইল,—"আর আমায় কষ্ট দিও না। আমার উপরে আর পশু-বল প্রয়োগের চেষ্টা করিও না। আমি তোমার মেয়ে—আমাকে দয়া কর—ছাড়িয়া দাও, আমি দেশের মানুষ দেশে চলিয়া যাই। কত দীর্ঘ দিন হইল ধরিয়া আনিয়াছ, কত দিন এই পাপে মজিতে অনুরোধ করিতেছ,—কিন্তু আমি জীবন দিব, তথাপি সতীত্ব নষ্ট করিব না। একথা তোমায় এতদিন বলিয়া আসিতেছি,—তবু কি তুমি শুনিবে না?"

পুরুষ কণ্ঠে পরুষ স্বরে উত্তর হইল,—"যদি ছাড়িবার হইত, সেই সময়েই ছাড়িতাম। ছাড়িব না—ছাড়িতে পারিব না। এই সারা রাত্রি সাধিলাম,—ভোর হইয়া গেল, তথাপি কথা রাখিলে না,—আজ দেখিব, এক রত্তি বালিকার দেহে কত বল?"

র। তুমি যতই বলবান্ হও—আমার এই ক্ষুদ্র শক্তিতে তোমার বল রোধ করিতে পারিব,—না হয় মরিব।

"তবে মর্—দেখি তোকে কে ঠেকায়—এই কথা বলিয়া পুরুষটী তাহাকে আকর্ষণ করিল, সে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, এবং

প্রতিশক্তি প্রয়োগে তাহাকে বাধা দিতে লাগিল। উদয়েশ্বর রমণীর আসন্ন বিপদ বুঝিয়া সেই দিকে অশ্বচালনা করিয়া দিয়া তাহার অসি উত্তোলন করিল, পুরুষ জড়ের ন্যায় অচল হইয়া দাঁড়াইল। উদয়েশ্বর দেখিল— পুরুষ সর্দ্দার পাঞ্জাসিং, রমণী চন্দ্রা।

চন্দ্রা চাহিয়া দেখিল, তাহার রক্ষাকারী অশ্বারোহী পুরুষ তাহাদের কালা ও বোবা ভৃত্য।

চন্দ্রা, কত দিন তাহাকে দেখে নাই, আজ আবার এই বিপদকালে তাহাকে কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইতে—এবং সর্দ্দারের পাশব-অত্যাচার-কবল হইতে রক্ষা করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইল। কৃতজ্ঞ-স্বরে বলিল—"তুমিই আমাদের বাড়ী ছল করিয়া প্রবেশ করিয়া, আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ—তুমিই আজ আবার আমাকে রক্ষা করিয়া আমার ধর্ম্ম বাঁচাইলে,—আমি তোমাকে এত দিন কেবলই অভিশাপে ডুবাইয়াছি—কিন্তু নিজের প্রায়শ্চিত্ত নিজেই সাধন করিয়াছ—আমার ধর্ম্ম তুমি রাখিয়াছ—ধর্ম্ম তোমায় রক্ষা করুন।"

"ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝি না—ধর্ম্ম আমার কিছুই করিতে পারিবে না। তুমি আমার সঙ্গে ঐ ঝরণার নিকটে চল।"—এই কথা বলিয়া উদয়েশ্বর তাহার দানবীশক্তিসম্পন্ন অশ্বকে ঝরণার দিকে চালনা করিল—ঝরণা অধিক দূরে ছিল না, উদয়েশ্বরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চন্দ্রাও সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল। উদয়েশ্বর অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া চন্দ্রার কাছে দাঁড়াইল। চন্দ্রা বলিল,—"এত দিন তোমায় দেখিনি, তুমি কোথায় গিয়াছিলে?"

উ। আমি দেশে গিয়াছিলাম,—বাঙ্গালা দেশে আমার বাড়ী। কেন, আমায় কি তুমি খুঁজিতে?

চ। আমার উপর যখন উহারা অত্যন্ত অত্যাচার করিত, তখন

তোমারই উপরে রাগ হইত ; কেন না, তুমিই আমার এ যন্ত্রণার মূল। কিন্তু তোমায় দেখিতে পাইতাম না।

উ। (মৃদু হাসিয়া) দেখিতে পাইলে কি করিতে?

চ। তোমার পায়ে ধরিয়া বলিতাম, আমাকে আমার বাড়ী রাখিয়া এস।

উ। আজ—তোমাকে তোমার বাড়ী রাখিয়া আসিব।

চ। সর্দ্দার বাধা দিবে।

উ। না।

চ। তোমার সঙ্গে বুঝি সর্দ্দারের কোন গুরু শিষ্য সম্বন্ধ আছে?

উ। কে গুরু, কে শিষ্য?

চ। সর্দ্দার গুরু, তুমি শিষ্য ;—অথবা সর্দ্দার পিতা, তুমি পুত্র, অথবা ঐরূপ কোন সম্বন্ধ আছে কি?

উ। না। সে বিবেচনা আসিল কেন?

চ। তোমাকে দেখিয়া মোহগ্রস্ত পশু একেবারে লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া গেল।

উ। লজ্জায় নহে, ভয়ে।

চ। তোমাকে দেখিয়া?

উ। হঁা।

চ। তুমি কে?

উ। আমি এক জন বাঙ্গালী।

চ। মিছে কথা।

উ। মিছে নহে চন্দ্রা, সত্য। আমার ক্ষমতা অসীম,—অমন শত সর্দ্দার আমার আজ্ঞায় স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল হয়।

চ। তবে তোমার পায়ে পড়ি আমাকে আমার বাড়ী পাঠাও।

উ। কেবল তোমাকে বাড়ী পাঠাইব না,—এই সমস্ত পাষণ্ডগণকে ধৃত করিয়া বর্ম্মাধিপতির দরবারে পাঠাইয়া দিব। উহাদের অত্যাচারের কথা বলিয়া দিব।

চ। তোমার কি উহারা কোন অনিষ্ট করিয়াছে? আগে ত তুমি উহাদের দলের লোক ছিলে?

উ। হাঁ, ছিলাম—আমার প্রতি ঘোর অত্যাচার করিয়াছে, আমি তাহার প্রতিশোধ লইতে আসিয়াছি।

চ। তবে অমন কাজ করিও না,—যে দলে ছিলে, যে দলের গুপ্ত কার্য্য তোমাকে বিশ্বাস করিয়া দেখাইয়াছে—এখন তাদের সহিত মনোবাদ হইয়াছে বলিয়া, সে গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিয়া দিও না—তাতে আরও অধর্ম্ম হয়,—দল ছাড়িয়া চলিয়া যাও; আর যদি সে সকল কাজকে এখন পাপাচার বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে, তথাপি তাহাদিগকে ধরাইয়া দিও না—তাহাতেও অধর্ম্ম হবে। তাদের পাপ পূর্ণ হ'লে ভগবান্ তার সাজা দিবেন।"

উদয়েশ্বর হাসিয়া বলিল,—"আবার ধর্ম্মের কথা! ওসকল কথা আমি আদৌ ভালবাসি না। আমি যাহা করিব, তাহা একটি ক্ষুদ্র বালিকার কথায় বদ্ধ থাকিবে না,—রোমাণী কোথায় জান?"

চ। জানি,—রোমাণী বোধ হয় আড্ডায় গিয়াছে। সেই পিশাচীই আমাকে ডাকিয়া এদিকে আনিয়া, তাহার পিতার হস্তে দিয়া গিয়াছে!"

উ। আমি জগতে অনেক পিশাচ-মূর্ত্তি রমণী দেখিয়াছি, কিন্তু এমনতর রাক্ষসী আমি আর কখন দেখি নাই,—আজি তাহাকে সমুচিত শিক্ষা প্রদান করিব।

চ। সে, তোমার কি করিয়াছে?

উ। যাহা করিয়াছে—তাহা বলিব না। তাহার দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে। চল, আমার সঙ্গে আড্ডার মধ্যে চল।

চ। তোমার পায়ে ধরিয়া বলিতেছি, সাধ করিয়া সাপের গর্ত্তে নামিয়া প'ড়ো না,—যদি তোমার পলাইবার পথ থাকে,—তোমার ঘোড়া ভাল হয়, দু'জনে পালাই। আমাদের দেশে চল, তোমাকে বাবা অনেক পুরস্কার দেবেন।

উ। তুমি আমায় তা হ'লে বিবাহ করিবে?

চ। না, না;—সে কথা আমি বলিতে পারিব না।

উ। কেন?

চ। তোমরা একদেশী, আমরা এক দেশী,—বাবা বিবাহ দেবেন না।

উ। তোমাদের দেশে ত এমন হয়?

চ। ছোট লোকদের মধ্যে হয়।

উ। আমি তোমায় বিবাহ করিতে চাহি না,—কেবল ছলনা করিলাম। আমার আসা- প্রতিহিংসা সাধন করিতে,—রোমাণীর পাপের দর্পিত বাহু দুইটি ভগ্ন করিতে। তোমার ভয় নাই,—আমার সঙ্গে চল।

চ। এক দিন তোমাকে পাপের মেরুদণ্ড বলিয়া ভাবিয়াছিলাম, আজ যেন পুণ্যের শীতল ছায়া জ্ঞান হইতেছে,—ঈশ্বর তোমার সহায় হউন।

উ। তুমি আমায় পাগল করিয়া তুলিলে যে,—অত বাজে কথা বকিও না। এখন চল।

চ। তোমার ঘোড়া?

উ। ঘোড়া ঐস্থানেই বাঁধা থাক।

চ। ঘোড়াটাকে খুব মজবুত আর দ্রুতগামী বলিয়া বোধ হইতেছে, কেহ যদি খুলিয়া লইয়া যায়, তখন আর পলাইতেও পারিবে না। “তোমার কোন ভয় নাই, এস।”—এই কথা বলিয়া চন্দ্রার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া, উদয়েশ্বর আড্ডার পথে চলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রভাত-প্রফুল্ল একরাশি সুগন্ধি ফুল লইয়া রোমাণী একটা পাষাণ-বেদীকার উপরে বসিয়া মালা গাঁথিতেছিল। বালারুণ-কিরণ তাহার মুখের উপর, আলুলায়িত চুলরাশির উপর পড়িয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল।

চন্দ্রা, দূর হইতে তাহাকে দেখিতে পাইয়াই বলিল,—"ঐ দেখ, রোমাণী ঐ পাষাণ বেদীকার উপরে বসিয়া ফুলের মালা গাঁথিতেছে।"

উদয়েশ্বর চাহিয়া দেখিল। বলিল,—"পিশাচী কি অপরূপ রূপ লইয়াই জন্মিয়াছিল। প্রভাত-সূর্য্য-কর যেন প্রাভাত-ফুল্ল নলিনীর উপরে পড়িয়া খেলা করিতেছে।"

চন্দ্রা উদয়েশ্বরের মুখের দিকে বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া বলিল,—"তুমি কি রোমাণীকে ভালবাস? আর সেই ভালবাসায় প্রতারিত হইয়া, উহার উপরে রাগ করিয়াছ?"

উদয়েশ্বর চন্দ্রার চোখমুখের অবস্থা দেখিয়া, মৃদু হাসিয়া বলিল,—"যদি বলি, হাঁ।"

চন্দ্রা বলিল,—"তুমি আজ আমার যে উপকার করিয়াছ, আমি তোমার পায়ে ধরিয়া বলি—কালসাপকে বরং ভাল বাসিও,—তবুও রোমাণীকে ভালবাসিও না।"

উ। কেন?

চ। কেন! কেন তা কি তোমাকে বলিয়া দিতে হইবে? তুমি কি উহাকে চেন নাই?

উ। তবে কাহাকে ভালবাসিব ?

চ। তোমার দেশীয় কোন ভদ্র মহিলাকে।

উ। আর যদি তোমাকে ভালবাসি ?

চ। তা'ও বাসিও না।

উ। কেন ?

চ। একদেশী লোক না হইলে, একরূপ মনের মিল হয় না। ছোট কাল থেকে, তাদের আচার-ব্যবহারে—চাল্ চলনে সব বিভিন্ন ;—ভালবাসা দাঁড়ায় না।

এমন সময় রোমাণীর দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল। সে তখন অধিক দূরে ছিল না। উদয়েশ্বরকে চন্দ্রার হাত ধরিয়া নির্ভয় ও গর্ব্বিত ভাবে আসিতে দেখিয়া সে, অত্যন্ত বিস্মিত হইল। যে উদয়েশ্বরকে সে গভীর পর্ব্বত-গহ্বরে ফেলিয়া দিয়াছে,—এত দীর্ঘ দিনের পরে, সে আবার ফিরিয়া আসিল কি প্রকারে ? মুখের ভাবে—মুখের প্রসন্নতাতে বর্ত্তমানে উহাকে দাম্ভিক বলিয়াই বোধ হইতেছে। চন্দ্রাকে কোথায় পাইল,—চন্দ্রাকে ত সে তাহার পিতার কাছে দিয়া আসিয়াছিল,—চন্দ্রা-রও মুখে স্ফূর্ত্তি—ব্যাপার কি ? কিন্তু সে অধিকক্ষণ চিন্তা করিবার সময় পাইল না ;—উদয়েশ্বর চন্দ্রার হাত ধরিয়া শীঘ্রই তাহার নিকটস্থ হইল।

কুটীলা রমণী তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"উদয়েশ্বর—অথবা প্রাণেশ্বর ! তুমি এতদিন কোথায় ছিলে ?"

এত নৈকট্য দেখাইবার কারণ এই যে, উদয়েশ্বরের অবস্থা তাহার সানুকূল বলিয়াই জ্ঞান হইতেছিল,—আসল কথা বাহির করা এবং সুবিধা হইলে নিজের স্বার্থ সাধন করিয়া লওয়া।

উদয়েশ্বর বিরক্তির বিকট হাসি হাসিয়া বলিল,—"প্রিয়তমে ! তোমার সুমধুর গলাধাক্কা খাইয়া যে গভীর গর্ত্তে পড়িয়াছিলাম, 'তাহাতে

এতটা দীর্ঘ বিরহ-বেদনা তোমার কোমল প্রাণে দিয়াছি—ক্ষমা করিও, চারুবদনে!”

কৃত্রিম অঙ্গভঙ্গি করিতে রোমাণী অত্যন্ত সুদক্ষা ছিল। সে এমন অঙ্গভঙ্গি করিয়া কথা কহিতে আরম্ভ করিল যে উদয়েশ্বরের হৃদ-প্রত্যয় হয়,—সে কোন দোষের দোষী নহে—প্রত্যুত উদয়েশ্বরের বিরহে একান্ত কাতরা। এই যে, প্রভাতে ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিতেছিল,—এ মালা তাহারই উদ্দেশ্যে ঐ ঝরণার জলে ভাসাইয়া দিত,—নিত্যই সে এমন করিয়া থাকে।

কিন্তু উদয়েশ্বর সে কথায়—সে অঙ্গভঙ্গীতে ভুলিল না। সে, দৃঢ় স্বরে বলিল,—“রোমাণী; তুমি রাক্ষসী। তোমাকে আমি প্রাণ ভরিয়াই ভাল বাসিয়াছিলাম,—তোমার প্রীতির জন্য—তোমাকে লাভ করিবার জন্য জয়সিংহের বাড়ী চাকর হইয়াছিলাম,—বিশ্বাসের স্থলে অবিশ্বাসী হইয়া, তোমার পিতাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম,—আর এই সরলা রমণীকে তোমার বাপের দুষ্পূর পাপ-বাসনায় আহুতি দিবার জন্য বাহির করিয়া লইয়া আসিয়াছিলাম,—কেন এ সকল করিয়াছিলাম,—জান? শুধু তোমার ঐ পাপ রূপরাশির জন্যে। তার প্রতিদান তুমি ভালই দিয়াছ,—আমার দ্বারা কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইয়া, আমাকে মুখের কথায় ছলনা করিয়া, পাহাড়ের শৃঙ্গে লইয়া গিয়া গভীর গহ্বরে ফেলিয়া দিয়াছিলে। পরমায়ুঃ থাকিতে কেহই মারিতে পারে না, তাই বাঁচিয়া গিয়াছি,—আজি তোমার সাক্ষাৎ কৃতান্ত হইয়া এখানে আসিয়াছি,—যে হস্ত দ্বারা আমার প্রাণ বিনাশের আয়োজন করিয়াছিলে—যে হাতে করিয়া শত শত লোককে সাপের বিষ—কুকুরের বিষ দিয়া বিনাশ করিতেছ, সেই হস্ত আজি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া প্রতিহিংসার নিবৃত্তি করিব।”

চন্দ্রা তাড়াতাড়ি আপন হস্ত দ্বারা উদয়েশ্বরের হস্ত চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—"অমন কাজ করিও না। নারীহত্যা মহাপাপ। রমণী শত অপরাধ করিলেও ক্ষমার যোগ্য

আহতা ফণিনীর ন্যায় রোমাণী গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া বলিল,—"চন্দ্রা, চন্দ্রা;—তোর আর ক্ষমার কথা বলিয়া বড়াই করিতে হইবে না! গোপনে গোপনে বুঝি, ঐ বাঙ্গালী কুকুরটার সঙ্গে গুপ্ত প্রণয় করা হয়েছে?—এই দেখ্,—কুকুরের প্রাণ কেমন করিয়া নাশ করি।"

এই কথা বলিয়া রোমাণী তাহার অঙ্গুলীস্থিত বিষগর্ভ অঙ্গুরী লইয়া উদয়েশ্বর দিকে ছুটিয়া আসিতেছিল। যে কোন প্রকারে একবার উদয়েশ্বরের সঙ্গে সে অঙ্গুরী স্পর্শ করিয়া একটু টানিতে পারিলেই মুহূর্ত্তে জীবনান্ত হইত। উদয়েশ্বরেরও তাহা অবগত ছিল; সে আর তাহাকে অগ্রসর হইতে দিল না,—একবার তাহার দানবী-শক্তি সম্পন্ন খড়্গ উত্তোলন করিল,—রোমাণীর গতি স্থগিত হইয়া গেল,—তার-পরে উদয়েশ্বর রোমাণীর দুই বাহুতে ও দুই পদে সেই খড়্গ স্পর্শ করাইয়া দিল,—রোমাণী মাটিতে পড়িয়া গেল,—তাহার হস্ত পদ উভয়ই অবশ হইল—পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর ন্যায় তাহার হাত পা অসাড় অবশ হইয়া মাটিতে লুঠিতে লাগিল।

উদয়েশ্বর বলিল,—"রোমাণী; কেমন, সাধ পূরিয়াছে? এই পর্য্যন্তই জীবনের অত্যাচার সাঙ্গ হইল,—যত দিন বাঁচিবে, এই প্রকার ভূমি-শয্যায় পড়িয়া ছটফট করিও।"

রোমাণী বলিল,—"তোমায় চিনিয়াছি, উদয়েশ্বর! আমিই তোমাকে এ শক্তি লাভের পথ করিয়া দিয়াছি। আমিও যে সাধনায় জীবনের গতি চালিত করিতেছিলাম, তুমিও সেই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছ। আমি সাধক ছিলাম,—তুমি সিদ্ধি লাভ করিয়াছ।

আমি স্থূল জগতে ছিলাম,—তুমি সূক্ষ্ম শক্তি পাইয়াছ, স্থূলের চেয়ে সূক্ষ্মের প্রতাপ ঢের বেশী! কিন্তু পরিণামে এইরূপ অসাড়—আর যন্ত্রণার বিকট দংশন! আমি স্থূলে ছিলাম,—তাই স্থূল দেহ অসাড় হইল,—তোমার সূক্ষ্ম দেহ এইরূপ অসাড় হইবে,—হায়! উদয়েশ্বর; জগতে যন্ত্রণার ভাগী আর কেহ হয় না! যার জন্য যতই কর,—আমার মত কষ্ট পাইবে! সূক্ষ্মের কষ্ট আরও অধিক!"

চন্দ্রা, সে সকল কথার কোন অর্থই বুঝিল না। উদয়েশ্বর বুঝিল,—তাহার প্রাণ চমকিয়া উঠিতেছিল। চন্দ্রা বলিল,—"রোমাণী কি বলিতেছে?"

উদয়েশ্বর দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—"যাতনায় প্রলাপ বকিতেছে।"

দূর হইতে একজন রোমাণীর অবস্থা দেখিতেছিল,—সে সহসা রোমাণীকে মাটিতে পড়িয়া যাইতে দেখিল,—তাহা দেখিয়া সে স্থির করিয়া লইল, রোমাণীকে উদয়েশ্বর মারিয়া ফেলিয়া দিয়াছে—খড়্গোত্তলন করিতেও দেখিয়াছিল। সে, ছুটিয়া আড্ডায় চলিয়া গেল, এবং খড়্গসিংয়ের সাক্ষাৎ পাইয়া, যতদূর বুঝিতে পারিয়াছিল, তাহা নিবেদন করিল।

খড়্গসিং সংবাদ পাইবামাত্র তাহাদের সাঙ্কেতিক বাদ্যযন্ত্রে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিল, সে বুঝিয়া লইয়াছিল, চন্দ্রার উদ্ধারকারী সৈন্যদল আসিতে পারে, এবং তাহারাই চন্দ্রাকে উদ্ধার করিয়া লইয়াছে। চন্দ্রা রোমাণীর সঙ্গে ছিল;—রোমাণী তাহাতে বাধা দিতে গিয়া আহত হইয়াছে সন্দেহ নাই। তাই সে, তাহাদের সাঙ্কেতিক বাদ্য যন্ত্রে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিল। সে শব্দ পাইয়া বালক বৃদ্ধ যুবা প্রভৃতি সকল পুরুষই শড়কী, বল্লম, ঢাল, তরবারি, কুলীশ, পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র লইয়া খড়্গসিংয়ের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

খড়্গসিং তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গেল। সেই ভীষণ কালান্তক যম-মূর্ত্তি সকলকে বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্রে ভূষিত হইয়া ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া চন্দ্রা কাঁপিতে আরম্ভ করিল। উদয়েশ্বর তাহা দেখিয়া বলিল,—"চন্দ্রা স্থির হও—তোমার কোন ভয় নাই। আমি এখনই উহাদিগকে দমন করিয়া দিব।"

চন্দ্রা কোন কথা কহিতে পারিল না, সে বাত্যান্দোলিতা বেতসীবৎ কাঁপিতে লাগিল।

উদয়েশ্বর চন্দ্রাকে বলিল,—তোমার কোন ভয় নাই একটু অপেক্ষা কর। আমি এখনই পাষণ্ডদিগকে নিরস্ত করিয়া আসিতেছি। উহাদিগকে আরও অগ্রসর হইতে দিলে, তুমি আরও ভয় পাইবে।"

কিন্তু ততক্ষণ তাহারা নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল। উদয়েশ্বরের মস্তক লক্ষ্য করিয়া অনেকগুলি শড়কী ও বল্লম নিক্ষিপ্ত হইল। উদয়েশ্বর খড়্গোত্তোলন করিবামাত্র সে অস্ত্ররাশির গতিরোধ হইল,—তখন সে ছুটিয়া অগ্রসর হইয়া, তাহার দানবীশক্তি-সম্পন্ন খড়্গ চালনা করিতে করিতে সেই দলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। সকলেরই হাতের অস্ত্র খসিয়া পড়িল, সকলেই কম্পিত কলেবরে জড়বৎ দাঁড়াইয়া থাকিল।

উদয়েশ্বর খড়্গসিংয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"খড়্গসিং আমায় কি চিনিতে পার?"

খড়্গসিং বলিল,—আগে চিনিতাম না, আজি চিনিয়াছি।"

উ। আগে চিনিতে না কেন? আমিত তোমাদের এখানে অনেক দিন ছিলাম।

খ। তখন জানিতাম, তুমি স্বদেশ-তাড়িত হীন দরিদ্র বাঙ্গালী।

উ। আর আ'জ?

খ। আ'জ জানিলাম, তুমি পিশাচ-সিদ্ধ মহা ক্ষমতাশালী ব্যক্তি।

উ। চুপ চুপ;—এ তথ্য জানিলে কি প্রকারে?

খ। আমরাও ঐ সাধনায় প্রবৃত্ত আছি,—আমাদের যিনি গুরু, তিনি সূক্ষ্মসাধনা জানেন না; তাই আমরা বাহ্য পিশাচ। এই পাহাড়েই গুপ্ত ভাবে অনেক সন্ন্যাসী আছেন, যাঁরা সূক্ষ্ম সাধনা জানেন,—তোমার বোধ হয়, সেইরূপ কোন সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়া থাকিবে।

উ। আমি সে সকল কথার আলোচনা করিতে চাহি না। এক্ষণে আমি চন্দ্রাকে উহার বাড়ীতে পাঠাইতে চাই।

খ। তুমি যে সাধনায় সিদ্ধ,—তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিবার সাধ্য কাহারও নাই।

উ। আমি তোমাদিগকে ধরাইয়া দিতাম, কিন্তু রোমাণী জড়বৎ হইয়াছে,—সেই পূর্ণ সয়তান! যদি তোমরা প্রতিজ্ঞা কর, নেগ্রেইসে গিয়া চন্দ্রার বাপকে আর জ্বালাতন করিবে না, তবে তোমাদিগকে ক্ষমা করিতে পারি,—এই পর্ব্বতে থাকিয়া তোমরা জীবন যাত্রা যাপন কর।

খ। তাহাই হইবে।

তখন উদয়েশ্বর ফিরিয়া গিয়া চন্দ্রার হাত ধরিল। চন্দ্রা প্রায় জ্ঞানশূন্য অবস্থাতেই দাঁড়াইয়া ছিল,—উদয়েশ্বরের স্পর্শে তাহার জ্ঞান হইল। বলিল,—“তুমি মানুষ, না দেবতা?”

উ। সে সেব কিছু নয়, চল তোমায় তোমাদের বাড়ীতে রাখিয়া আসিব।

উ। তোমার অনুগ্রহে আমি যদি বাপ মাকে দেখিতে পাই।

উদয়েশ্বর চন্দ্রার হাত ধরিয়া যে ঝরণার নিকট হইতে লইয়া গিয়াছিল, তথায় ফিরিয়া গেল, এবং অশ্ববল্গা খুলিয়া লইয়া, উদয়েশ্বর

তাহাতে আরোহণ করিল, চন্দ্রাকেও তাহাতে তুলিয়া লইয়া অশ্ব ছাড়িয়া দিল।

তৎপর দিবসই উদয়েশ্বর নোগ্রেইসে পঁহুছিয়া চন্দ্রাকে তাহাদের বাড়ীর নিকটে নামাইয়া দিয়া ফিরিয়া গেল;—জয়সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চন্দ্রা অনেক অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু উদয়েশ্বর সে অনুরোধ রক্ষা করে নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তারপরে মালতীর কথা কিছুই বলা হয় নাই। সে অনেক কথা। অল্পের মধ্যে কথাগুলার যতদূর সম্ভব আভাষ দেওয়া কর্ত্তব্য বোধে, এই স্থলে তাহা প্রকটিত করিয়া দেওয়া গেল।

নর-পিশাচের কৌটিল্য-জাল-বিজড়িতা সরলা মালতী তাহার সর্ব্বস্ব লিখিয়া দিয়া, সেই শীতল রায়ের গৃহেই আশ্রয় লইল। শীতল রায় জগন্নাথ চৌধুরীর আত্মীয় বন্ধুগণের নিকটে প্রচার করিয়া দিল যে, পলায়িত উদয়েশ্বর এক রাত্রে আসিয়া, ধন সম্পত্তির সহিত মালতীকে লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। যাইবার সময় যাহা না লইয়া যাইতে পারিয়াছিল—যথা কর্জ্জ দেওয়া টাকা, বাড়ী-ঘর-দুয়ার প্রভৃতি—তাহা দয়া করিয়া, পুরাতন ভৃত্য বলিয়া আমাকে দান করিয়া গিয়াছেন। তাহার কথায় অনেকে বিশ্বাস করিল,—শীতলরায়ও মালতীর লিখিত দলিল প্রদর্শন করিল,—তারপরে ক্রমে ক্রমে বাড়ী-ঘর-দুয়ার বিক্রয় করিয়া ফেলিল, এবং কর্জ্জ দেওয়া টাকার কতক বা অর্দ্ধেক লইয়া, কতক বা সিকি লইয়া নিষ্পত্তি করিল, এবং তাহাদিগের দেয় দলিল-পত্র ফিরাইয়া দিল।

এই সমুদয় কার্য্য যত দিন সম্পন্ন করিতে না পারিয়াছিল, তত দিন ধূর্ত্ত শীতলরায় মালতীর উপরে কোন প্রকার অসদ্ভাবের লক্ষণ প্রদর্শন করে নাই। যখন সমস্ত কার্য্য সুচারু রূপে সমাধা হইয়া গেল, তখন এক দিন সন্ধ্যার পরে শীতল রায়, যে গৃহে বসিয়া মালতী তাহার অদৃষ্টের কথা ভাবিয়া অবসন্ন হইতেছিল, তথায় গিয়া উপস্থিত হইল। মালতী চমকিয়া উঠিয়া বলিল,—"নিঃশব্দে এখানে কেন আসিলে?"

মৃদু হাসিয়া শীতল রায় বলিল,—"যে জন্য আসিয়াছি তাহা বলিতেছি, আগে একটু বসি।"

দর্পিতা সিংহীর ন্যায় গ্রীবা বাঁকাইয়া মালতী বলিল,—"বসিবে! এখানে কেন বসিবে? আমাকে তোমার বাড়ীর বাহিরে—এই উদ্যান গৃহে একাকিনী বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছ। এখানে তুমি মধ্যে মধ্যে এরূপভাবে কেন আইস? তোমার ভাব দেখিয়া দিন দিন আমার মনে নানা প্রকার সন্দেহ জন্মিতেছে।"

শী। কিসের সন্দেহ সুন্দরী?

মা। ও কি প্রকার সম্বোধন শীতল রায়? তোমার কি স্মরণ নাই, তুমি আমার বাবার ভৃত্য—আমি তোমার প্রভুকন্যা?

শী। সে দিন এখন নাই—সে সম্বন্ধও এখন নাই।

মা। তোমার মনে কি আছে জানি না। তুমি কি অবিশ্বাসী হইবে?

শী। অবিশ্বাসী! কখনই না,—আমি তোমাকে চিরকাল বুকে করিয়া রাখিব! শোন মালতি, আমি তোমার রূপের আগুনে বড় জ্বলিতেছি—তুমি আমার হও। যত দিন এ দেহে প্রাণ থাকিবে, আমি ততদিন তোমার সেবা করিব।

নিদ্রিত মানুষের পদতলে কালসর্পে দংশন করিলে, সে যেমন জাগিয়া পড়িয়া হঠাৎ আকুলিত হইয়া উঠে এবং কি করিবে, কোথায় যাইবে, তাহার স্থির করিতে পারে না, মালতীর অবস্থাও সেই প্রকার হইল।

সে বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার লোহিত গণ্ডস্থল, আরও লোহিত হইল। চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত ও সমীরণান্দোলিত পুষ্পপল্লবের ন্যায় তাহার অধরোষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল।

শীতলরায় গৃহস্থিত আলোক-সাহায্যে সে মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত

হইল। দাঁড়াইয়াছিল, পার্শ্বের একটা কাষ্ঠাসনের উপরে বসিয়া পড়িল। অনেকক্ষণ উভয়েই নীরবে রহিল। তদনন্তর শীতল রায়ই প্রথমে কথা কহিল। বলিল,—"শোন মালতি, তুমি এরূপ করিবে,—তুমি আমার প্রস্তাব এইরূপে প্রত্যাখ্যান করিবে,—তাহা আমি আগেই জানিতাম। জানিতাম বলিয়াই এত ষড়যন্ত্র করিয়াছি। এখন তোমার অত গর্ব্ব সাজিবে না,—আমার প্রস্তাবে সম্মত না হইলে, তোমার আর উপায়ান্তর নাই।"

মালতী ঘামিতেছিল। তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। এত দিন সে যে সন্দেহ করিয়া আসিতেছিল, আজি তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিল। বুঝিতে পারিল, শীতলরায় তাহাকে ছলনা করিয়া তাহার পিতৃ-পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তি অপহরণ করিয়া লইয়াছে,—তারপরে, এখন তাহার সতীত্ব পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে। ক্ষোভে ক্রোধে ঘৃণায় লজ্জায় তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। সে আবার বসিয়া পড়িল।

শীতলরায় বলিল,—"মালতী, ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ। আমা ভিন্ন তোমার আর গতি নাই,—আমাকে চটাইও না; আমি তোমাকে পরম সুখে রাখিব। তোমার যত ধন রত্ন ছিল, তাহার চতুর্গুণ করিয়া দিব।"

মালতীর চক্ষু দিয়া আগুনের ঝলক বহিয়া গেল। সে দমে দমে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে বলিল,—"কৃতঘ্ন, এখনও রাত্রি দিন হয়, এখনও চন্দ্র সূর্য্যের উদয় অস্ত আছে,—তুই চাকর হইয়া এমন সর্ব্বনাশ করিলি?"

শী। রাগ ক'রনা বিধুমুখী। রাগ করিলে কোন ফল হবে না। আমি তোমার কিছু সর্ব্বনাশ করিনি বাক্সের টাকা বাক্সেই আছে, আমাকে সুখী কর—আমার হও তোমার টাকা, আর তার সঙ্গে সঙ্গে

আমার এত কালের সঞ্চিত টাকা—সবই তোমার চরণ তলে ঢালিয়া দিব,—শীতল তোমারই গোলাম হবে!

মা। দেবতা আছেন, ধর্ম্ম আছেন,—আমাকে যতই কটু বাক্য বলিবে, তোমার জন্য ততই নরকের দ্বার খোলা হবে।

শী। ও সকল বাজে কথা ছাড়,—এখন আসল কথার কি তাই বল।

মা। কি আসল কথা?

শী। তুমি আমার হও।

মা। তোমার মাথায় বাজ পড়ুক—তুমি অধঃপাতে যাও। হায়, আমাকে কি এই জন্য এত ছলনা করিয়া, আমার বাবার সমস্ত সম্পত্তি লুঠিয়া লইয়া, আমাকে বন্দিনী করিয়াছ? শোন, শীতলরায়,—সতীর একমাত্র পতিই দেবতা—পতিই নারায়ণ। নারায়ণ-চরণ-চিন্তনে আমায় বাধা দিওনা,—আমার সর্ব্বস্ব ফাঁকি দিয়া লইয়াছ—লও। তাহার বিনিময়ে দিনান্তে এক মুঠা অন্ন দিও—তাই খাইয়া—সারা দিন রাত্রি স্বামী দেবতার সেই চরণ চিন্তা করিব। এখানে আসিয়া আর আমাকে জ্বালাতন করিও না।

শী। তোমার পতিদেবতা পলাতক,—ইহ জীবনে আর কখনও গৌড়ে ফিরিয়া আসিতে পারিবে না,—আসিলেও মুহূর্ত্ত ইহলোকে থাকিতেছে না। সে আশায় জলাঞ্জলি দাও,—আমিই এখন তোমার একমাত্র গতি ও পতি,—আমাকে লইয়াই সুখে ঘরকন্না কর।

মালতীর সর্ব্বাঙ্গে যেন বিষের জ্বালা জ্বলিয়া উঠিল। সে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। বসিয়াছিল, আবার উঠিয়া দাঁড়াইল। উত্তেজিত স্বরে বলিল,—"দূর হ পিশাচ। তোরও স্ত্রী আছে—তোরও মেয়ে আছে, তাহাদিগকে যদি কেউ এমন ক'রে অপমান করে, তবে

তাদের মনে কি কষ্ট হয়, পিশাচ? তোর পায়ে ধরি,—এখান হ'তে বাহির হ।"

সে মূর্ত্তি দেখিয়া শীতল রায় অন্তরে অন্তরে কাঁপিল। কিন্তু পাপের বাসনায় তাহার হৃদয় জ্বলিতেছিল,—সে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, —"মালতী ভুলিয়া যাও। সেই পলায়িত ব্যক্তিকে ভুলিয়া যাও। তোমার রূপ আছে—তাই তোমার গালাগালিও মিষ্ট লাগিতেছে। তাকে আর কখনও পাবে না—আমায় কৃপা কর।"

মালতী গর্ব্বিতকণ্ঠে দৃঢ়স্বরে বলিল,—"কাকে পাব না? যাকে হৃদয়ের সিংহাসনে রাখিয়া নিত্য ধ্যান করিতেছি? সাধনায় দেবতা মিলে না, তোকে কে বলিল মূর্খ?"

শী। জীবন থাকিতে নয়।

মা। না হয় পরকালে।

শী। হা হা, পরকালে—এমন লোকের মেয়ে হয়েও ঐ বাজে কথা বিশ্বাস কর? বাজে কথায় বিশ্বাস ক'রে এমন সোণার যৌবন শুকিয়ে ফে'ল না।

ঘৃণায় লজ্জায় ভয়ে ক্ষোভে ক্রোধে মালতী চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু মস্তকে একটা লৌহদণ্ডের ভীষণ আঘাত লাগায় মানসিক অবসাদ-ক্লিষ্ট দেহ আরও অবসন্ন হইয়া পড়িল। মালতী মূর্চ্ছিত হইয়া মেঝের উপরে পড়িয়া গেল,—মস্তকের চর্ম্ম কাটিয়া রক্তধারা বহিতে লাগিল। অবস্থা দেখিয়া, এক দাসীকে ডাকিয়া তাহার উপরে মালতীর শুশ্রূষার ভার দিয়া নর পিশাচ শীতলরায় তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

তারপরে আরও কত দিন শীতলরায় তাহার পাপ প্রস্তাব করিয়া দেখিয়াছে—শত প্রলোভনে মালতীকে ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছে,—

কিন্তু কিছুতেই সতীকে পথভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। প্রতিদিনই সে গালি খাইয়া ফিরিয়া গিয়াছে।

তখন ব্যর্থ অনুরাগ ক্রোধে পরিণত হইল। কামনার অপূরণেই দুর্জ্জয় রিপু ক্রোধের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শীতলরায় তখন ক্রোধের বশীভূত হইয়া, মালতীকে বিবিধ প্রকারে যন্ত্রণা প্রদান করিতে লাগিল।

মালতী বুক পাতিয়া সে সকল যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। তাহার অন্য কোন উপায় ছিল না,—শীতলরায়ের নিয়োজিত দাসী ভিন্ন অন্য মানবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সাধ্য ছিল না। আহারাভাবে শীর্ণ দেহ, বস্ত্রাভাবে চীর ও মলিন বসন পরিধান—আর শত সহস্র বাক্য-জ্বালা সহ্য করিয়া বন্দিনী অবস্থায় মালতী দিনের পর দিন কাটাইয়া দিতে লাগিল। এত জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে—এত অভাবের মধ্যে—ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া সে সারা দিবস রজনী কেবল পতির মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া কাটাইয়া দিত।

যখন শীতলরায় মালতীকে কোন প্রকারেই বশীভূত করিতে পারিল না, তখন তাহার মনে আর এক চিন্তার উদয় হইল। সে চিন্তা এই যে, মালতী যদি কোন প্রকারে পলায়ন করিতে পারে, তবে সমস্ত বিষয় তাহার কোন পিতৃবন্ধুর নিকট জানাইতে পারে, তাহা হইলে শীতলরায়ের সর্ব্বনাশ হইবে। তাই সেই ধূর্ত্ত চূড়ামণি তাহার উদ্যানের মধ্যে এক গুপ্ত গৃহে লইয়া মালতীকে বন্দিনী করিল,—এবং সমস্ত দিনের পরে যখন সমস্ত লোক নিদ্রা যাইত, তখন যে দাসী নিযুক্ত ছিল, সে তাহাকে বাহির করাইয়া বাগানের পুষ্করিণী হইতে স্নান করাইয়া লইয়া গিয়া আবার গুপ্তগৃহে পুরিত এবং তখনই এক মুঠা কদন্ন ও একটু ব্যঞ্জন আহারার্থে প্রদান করিত।

সুখ-পুষ্টা মালতী এইরূপে দিন কাটাইতেছিল, এবং যখন ক্ষুধা তৃষ্ণায় বড় কাতর হইয়া পড়িত, তখন কেবল স্বামী দেবতাকে ডাকিয়া ডাকিয়া কাঁদিয়া বলিত,—"প্রাণেশ্বর, ডাকিয়া লও, আর সহ্য হয় না।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

উদয়েশ্বর চন্দ্রাকে তাহার বাড়ী পঁহুছাইয়া দিয়াই প্রস্থান করিয়াছিল। চন্দ্রা তাহাকে অনেক করিয়া বলিয়াছিল যে, একবার তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যায়, কিন্তু উদয়েশ্বর তাহার অনুরোধ রক্ষা করে নাই।

উদয়েশ্বর তাহার দানবীশক্তি সম্পন্ন অশ্বারোহণে অতি শীঘ্রই গৌড়ে উপস্থিত হইয়াছিল।

কয়েক দিনের ভ্রমণে তাহার শরীর একটু ক্লান্ত হইয়াছিল। বহুমূল্য দ্রব্যসম্ভারে সুসজ্জিত, সুখ সমীরণ পরিসেবিত দ্বিতলের বৈঠকখানায় একটা খট্টার উপরে অর্দ্ধ শয়নাবস্থায় উদয়েশ্বর জাহানারার রূপ চিন্তা করিতেছিল, এমন সময় এক ভৃত্য আসিয়া বলিল,—"বাদশাহের সেনাপতি কালাপাহাড় আপনার দর্শনাভিলাষে নীচেয় অপেক্ষা করিতেছেন।"

তাহাকে উপরে আসিবার অনুমতি প্রদান করিয়া, উদয়েশ্বর পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল।

অতি অল্পক্ষণ পরেই কালাপাহাড় আসিয়া অভিবাদন করিল।

উদয়েশ্বর মৃদু হাসিয়া স্বাগত প্রশ্নাদির পরে, তাহাকে বসিতে অনুরোধ করিল।

কালাপাহাড় আসনে উপবেশন পূর্ব্বক বলিল,—"মহাশয়, আমি আপনার আদেশে উড়িষ্যায় গিয়া প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়াছি, এবং সমস্ত যুদ্ধেই জয়লাভ করিতে পারিয়াছি,—জানি না, এত শক্তি আমার কোথা হইতে আসিল! কিন্তু আপনার যাইবার

কথা ছিল, আপনি যান নাই,—তাহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি।”

মৃদু হাসিয়া উদয়েশ্বর বলিল,—“আমি যাই নাই, কিন্তু তোমাতে শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলাম। নতুবা তুমি কখনই অতিরিক্ত বলশালী হইতে পারিতে না।”

কা। আপনি ঠিক বলিয়াছেন, কিন্তু আপনি এখানে থাকিয়া কি প্রকারে সেখানে শক্তি সঞ্চার করিতে পারিলেন? আপনি কি কোন গুণ জ্ঞান জানেন?—অথবা আপনি কোন সিদ্ধপুরুষ?

উ। সে সকল কথা তোমার শুনিয়া কাজ নাই,—আমি তাহা বলিতেও প্রস্তুত নহি। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি—আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি, তুমি আমার আদেশ পালন করিয়াছ কি?

কা। দেবমন্দির এবং দেববিগ্রহ ভাঙ্গিয়া দেওয়া?

উ। হাঁ?

কা। হাঁ,—সাধ্যানুসারে তাহা করিয়াছি।

উ। বেশ করিয়াছ? আর কিছু বলিবার আছে কি?

কা। আছে;—কি প্রকারে আমি আপনার ন্যায় শক্তিশালী হইতে পারি, তাহা দয়া করিয়া আমাকে বলিয়া দিন।

উ। সে আশা বৃথা,—তাহা হইবার নহে।

কা। তবে আপনার দ্বারা যেটুকু শক্তি আমাতে সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহা যাহাতে চিরদিন অক্ষুন্ন থাকে, তাহা করিতে হইবে।

উ। ভাল তাহাই হইবে। কিন্তু তুমি দেবমন্দির ও দেব-বিগ্রহ দেখিলেই চূর্ণ করিও। যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ড বা দেবার্চ্চনা দেখিলেই তাহা সাধ্যানুসারে বিনষ্ট করিও।

কা। যে আজ্ঞা। তবে এখন বিদায় হই?

উ। আচ্ছা,—কিন্তু মধ্যে মধ্যে আমার নিকটে আসিও।

"আপনার আদেশ শিরোধার্য্য"—এই কথা বলিয়া কালাপাহাড় চলিয়া গেল।

উদয়েশ্বর উঠিয়া বসিল। তাহার মনে হইল, আমি এতদূর ক্ষমতাশালী হইয়াও একটি ক্ষুদ্র রমণীর করুণাভিখারী হইয়া অপূর্ণ বাসনার আগুণে দগ্ধ হইতেছি! আর কেন,—যথেষ্ট হইয়াছে। আমার দানবী-শক্তিতে তাহাকে টানিয়া লইব। কাহারও সাধ্য নাই যে, আমার কার্য্যের বিরুদ্ধে যায়। তবে একটা কথা এই যে, সে যদি হাসি মুখে তাহার প্রণয় প্রদান না করে, তবে কি আনন্দ হায়, সে আশা আমার দুরাশা! জাহানারা—নানা ছলে নানা কৌশলে কেবল আমাকে মুগ্ধ রাখিবার চেষ্টা করে। তেমন প্রাণ-ভরা ভালবাসার আশা তাহার নিকটে নাই। তেমন অযাচিত ভালবাসা মালতীর ছিল,—হঠাৎ উদয়েশ্বরের প্রাণের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। এই দীর্ঘ দিনের মধ্যে—এই গৌড়নগরে অবস্থান করিয়াও মালতীর সন্ধান করা হয় নাই। সে আছে কি মরিয়াছে,—সে এখনও তেমনই তরঙ্গ হীন ভালবাসা লইয়া উদয়েশ্বরের জন্য বসিয়া আছে কি না, তেমনই উদয়েশ্বরের একবিন্দু করুণার জন্য তাহার সমস্ত প্রাণখানি পাতিয়া রাখিয়াছে কি না,—একবার সন্ধান করিয়া দেখিলে হয়। কিন্তু মালতীর ভালবাসায় যেন মাদকতা নাই—উত্তেজনা নাই। জাহানারার রূপে জাহানারার প্রেমে বুঝি আকুল-উত্তেজনা—বাসনা-কামনা পরিপূর্ণ আছে। যেমন সাগরের তরঙ্গে, আর ক্ষুদ্র নদীর জলোচ্ছ্বাসে প্রভেদ—তেমনি জাহা-নারার প্রেমে, আর মালতীর প্রেমে প্রভেদ। কিন্তু মালতী একান্তে ভালবাসিত,—এখনও যদি সেইরূপ থাকে—তবে এখানে আনিয়া

রাখিতে হানি কি ? জাহানারা—অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা-গগনের ফুল্ল চন্দ্রিকা কেবল দেখিবার, কেবল উপভোগ করিবার জিনিষ ;—আর মালতী মর্ত্ত্যের শীতলপাটী—পাতিয়া শয়ন করিতে দোষ কি ?

মালতীর অনুসন্ধান করা উদয়েশ্বরের কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান হইল। সেই দিন হইতেই মালতীর অনুসন্ধান কার্য্য আরম্ভ হইল।

উদয়েশ্বর লোকদ্বারা মালতীর সন্ধান লইল। সে লোক যাহা সন্ধান করিয়া আসিল,—তাহা শুনিয়া উদয়েশ্বর কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সে লোক বলিল—"মালতীর আত্মীয় স্বজনের নিকটে শ্রুত হইলাম, পলায়িত উদয়েশ্বর একদিন রাত্রে আসিয়া তাহাকে লইয়া গিয়াছেন।"

উদয়েশ্বর ভাবিল, তবে কি, সে কাহারও সহিত পলাইয়া গিয়া ঐরূপ প্রকাশ করিয়াছে—কিন্তু বুদ্ধিবান্ উদয়েশ্বর মালতীর সহিত কয়দিন বসবাস করিয়া বুঝিয়া লইয়াছিল, মালতীর হৃদয়ে যথেষ্ট বল আছে,—সে, সহসা কাহাকেও আত্মদান করিবে না, বা পাপপথে যাইবে না। তবে কি, সে কাহারও দ্বারা প্রতারিতা হইয়া অকূলে ভাসিয়াছে ! হইতে পারে কোন অসচ্চরিত্র ব্যক্তি তাহাকে বলিয়া থাকিবে, উদয়েশ্বর অমুক স্থানে আছে—তোমাকে তথায় যাইবার জন্য বলিয়াছি,—ধন রত্ন লইয়া তাহার সহিত মিলিত হও।" সরলা রমণী তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বিপদে পড়িয়াছে।

উদয়েশ্বরের মনে হইল, শীতলরায় জগন্নাথচৌধুরীর প্রধান কর্ম্মচারী ছিল, তাহাকে ডাকাইলে এ বিষয়ের অনেক তথ্য অবগত হওয়া যাইবে !

উদয়েশ্বর তদ্দণ্ডেই শীতলরায়কে ডাকিবার জন্য একজন পদাতিক প্রেরণ করিল।

শীতলরায় অনেক দিন হইতেই শুনিয়াছে যে, উদয়েশ্বর বিপুল ধনশালী ও ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি হইয়া গৌড়নগরে ফিরিয়া আসিয়াছে, এবং বাদশাহ তাহাকে পূর্ব্বের আদিষ্ট দণ্ড দেওয়া দূরে থাকুক, তাহাকে যথোচিত সম্মান ও খাতির করিতেছেন। তখন হইতেই তাহার পাপ কলুষিত প্রাণ সর্ব্বদার জন্য উদ্বিগ্ন ও ভীত ছিল—কিসে শীঘ্র শীঘ্র মালতী মৃত্যু-মুখে নিপতিত হয়, এই চিন্তাই তাহার সর্ব্বদা হইত,—কেন না, মালতী মরিলে তাহার সকল বিপদ দূরীভূত হয়,—মালতী ভিন্ন তাহার কৃতকর্ম্মের সাক্ষ্য দিতে আর কেহ নাই।

শীতলরায় তাহার বৈঠকখানায় বসিয়াছিল, এমন সময় উদয়েশ্বরের প্রেরিত পদাতিক আসিয়া তাহাকে বলিল,—"মহারাজা উদয়েশ্বর আপনাকে ডাকিয়াছেন, এখনই যাইতে হইবে।"

গৌড়েশ্বর হোসেনশাহ উদয়েশ্বরকে সম্মান সহকারে মহারাজা উপাধি প্রদান করিয়াছেন। উদয়েশ্বরের মহারাজোচিত জমিদারি প্রভৃতি না থাকিলেও অগাধ ধন-সম্পত্তি ছিল। সম্মানও যথেষ্ট হইয়াছিল,—ধনের সম্মান এজগতের সর্ব্বত্র।

শীতলরায় চমকিয়া উঠিল। তাহার দেহের শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্ত ছুটিয়া ছুটিয়া বহিয়া গেল। কাণের কাছে যেন মরণের অমঙ্গল আহ্বান ধ্বনিত হইল। শীতলরায়ের মনে হইল, এতদিন পরে উদয়েশ্বর বুঝি সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়াছে,—তাই শীতলরায়ের মুণ্ডটা ছিঁড়িয়া দিবার জন্য ডাকিয়াছে।

শীতলরায় শুষ্ককণ্ঠে বলিল,—"শোন পিয়াদা মশায়; আমার বড় পেটের অসুখ হ'য়েছে—আ'জ আমার যাবার কোন উপায় নাই। কাল' যে কোন সময় যাব।"

পদাতিক বলিল,—"আ'জই লইয়া যাইবার হুকুম আছে।"

তখন শীতলরায় বাক্স খুলিয়া পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া পদাতিকের হাতে দিয়া বলিল,—তোমরা বড় লোকের চাকর, তোমাদের মান রাখতে হয়,—সে সব আমি জানি। এই নিয়ে যাও—কাল' আমি যাব।"

পদাতিক ভাবিল, আজই লইয়া যাইবার অবশ্য হুকুম নাই,—কেবল ডাকিবার আদেশ আছে মাত্র, অতএব যথা লাভ! কিন্তু কায়দা ছাড়া কর্ত্তব্য নহে বিবেচনায় পদাতিক বলিল,—"আপনি ভদ্রলোক, বিশেষ অসুখ করেছে, তাই রেখে গেলাম, কাল' না গেলে কিন্তু গোলযোগ হবে।"

শীতলরায় শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল,—"ওগো, সে জন্য চিন্তা নাই। আমিত পাগল নই যে, ভুলে যাব!"

তখন দীর্ঘ গুম্ফে মোড়া দিতে দিতে পদাতিক চলিয়া গেল।

পদাতিক চলিয়া গেল, কিন্তু শীতলরায়ের হৃৎকম্প বিদূরিত হইল না। সে নিতান্ত ব্যাকুল হৃদয়ে উপস্থিত বিপদ হইতে কিসে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তাহারই চিন্তা করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া স্থির করিল, মালতীকে সংহার না করিলে, আর কোন উপায়ই নাই,—মালতী মরিলে আর কোন ভয় নাই। আমি অস্বীকার করিলেই কোন প্রমাণ হইবে না। তখন সে মনে মনে যুক্তি করিল, মালতীকে নিহত করিয়া এই রাত্রেই কালিন্দীর জলে ভাসাইতে হইবে। তার জন্য না হয়, হাজার খানেক টাকা ব্যয় হইবে। কাহার মৃতদেহ জানিতে দেওয়া হইবে না,—তবে টাকা দিয়া হাঘরেদের দ্বারা দেহ কালিন্দীর জলে ভাসাইতে হইবে। ইহা নিশ্চয় যে, আমার উদ্যান বা গুপ্তগৃহ তাহাদিগকে দেখান হইবে না,—মালতীকে হত্যা করিয়া তাহার মৃতদেহ বাগান হইতে বাহির করিয়া, অন্যত্রে রাখিয়া তবে হাঘরদের ডাকিতে হইবে। দাসীর সাহায্যে আমিই

দেহটা টানিয়া বাহিরে লইতে পারিব,—মালতীর দেহে আর আছে কি, শুকাইয়া হাড় সার হইয়া গিয়াছে।

পিশাচ শীতলরায় বিলম্ব করা কর্ত্তব্য বোধ করিল না, একখানি দ্বিধার ছোরা লইয়া উদ্যানে চলিয়া গেল। দাসীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মালতী কি করিতেছে?"

দাসী বলিল,—"মালতী ঘুমাইতেছে। সন্ধ্যার সময়ই সে আ'জ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।"

শী। তুমি সেখান হইতে কতক্ষণ বাহিরে আসিয়াছ?

দা। এই মাত্র আসিতেছি।

শীতলরায় উপযুক্ত সময় বুঝিয়া গুপ্তগৃহে প্রবেশ করিল। গৃহমধ্যে একটা মৃৎপ্রদীপ তাহার ক্ষীণ কিরণ বিস্তার করিয়া, আপন মনে আপনি জ্বলিতেছিল। মালতী একখানা বংশ-খট্টার উপরে শুইয়া ঘুমাইতেছিল,—তাহার শরীর শীর্ণ, মুখ ম্লান,—যেন ছিন্ন বৃন্ত বিশুষ্ক কুসুম কোরক।

নিষ্ঠুর শীতলরায় একবার দীর্ণ ম্লান সৌন্দর্য্য দেখিল, তারপরে নিদ্রিতা রমণীর বক্ষভেদার্থ ছোরা তুলিল,—ঠিক এই সময়ে নিদ্রিতা মালতী হাসিয়া উঠিল,—হাসি, স্বপ্ন দর্শনে। কি জানি কেন নিষ্ঠুর শীতলরায়ের হস্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল,—সে ছোরা বিদ্ধ করিতে সক্ষম হইল না,—এক দৃষ্টে মালতীর নিদ্রিত মূর্ত্তি চাহিয়া দেখিতে লাগিল। মালতীর ঠোঁট মুখ তখনও সঞ্চালিত হইতেছিল,—মালতী তখন এক অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করিতেছিল।

সে স্বপ্নে দেখিতেছিল, ফুল্ল জ্যোৎস্নামাখা এক নূতন দেশ। তেমন জ্যোৎস্না সে আর কখনও দেখে নাই,—সেই প্রফুল্ল জ্যোৎস্না নিন্দিত দিব্য-কান্তি বিশিষ্টা এক রমণী মূর্ত্তি তাহার নিকটে আসিয়া বলিল,—"মা, মালতী! আমাকে কি চিনিতে পার?" মালতী সবিস্ময়ে বলিল,—

"না মা, আমিত তোমাকে কখনও দেখি নাই।" জ্যোতির্ম্ময়ী বলিলেন,—"আমার নাম সাবিত্রী—আমি সতীকুলের দেবী। তুমি সতী, তাই তোমাকে দেখা দিতে আসিয়াছি,—তুমি মন্ত্র গ্রহণ কর। এই মন্ত্র বলে মরা স্বামীকে বাঁচান যায়, নরকার্ণবে নিপতিত স্বামীকে উদ্ধার করা যায়,—এই মন্ত্রের নাম স্বামী-প্রেম। আত্মবলি ইহার বীজ মন্ত্র। সাবিত্রী-হৃদয় জপ্য বিষয়—সাবিত্রী-হৃদয় শোন—* * এই মন্ত্র জপ করিও। সমস্ত শক্তি অতিক্রম করিয়া পূতলোক প্রাপ্ত হইবে। স্বামীকে কোলে পাইবে।"

মালতী সে পবিত্র দেশে গিয়া পবিত্র মন্ত্র প্রাপ্তে আনন্দে হাসিয়া ফেলিল,—তারপরে কত দৃশ্য দেখিতেছিল, কত আনন্দ উপভোগ করিতেছিল, সাবিত্রীর সহিত কত গল্প করিতেছিল।

শীতলরায় অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া ছোরা হস্তে ফিরিয়া গেল। যে নিষ্ঠুর কার্য্য সম্পাদন করিতে আসিয়াছিল, তাহা পারিল না, হৃদয়ের উত্তেজনা-রক্ত-নাগিনী কে জানে কোন্ অজানা মন্ত্রের বলে নতশির হইয়া পড়িল।

শীতলরায় চলিয়া যাইবার কিয়ৎক্ষণ পরেই মালতীর নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল,—স্বপ্নের কথা তাহার মনে আসিল—প্রাণের ভিতর দুর্ দুর্ করিতে লাগিল। স্বপ্নপ্রাপ্ত মন্ত্রটি স্মরণ করিল,—তাহা সুন্দর রূপেই মনে আছে। দশবার সে মন্ত্র জপ করিয়া কান্দিতে কান্দিতে ডাকিল,—"মা! অভাগিনীকে দেখা দিয়া কোথা গেলে মা? সতী-রাণী, স্বামী-চরণ কবে পাব মা?"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শীতলরায় মালতীর নিকট হইতে ফিরিয়া গিয়া, সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যাইতে পারে নাই,—তাহার হৃদয়ের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া পড়িতেছিল। তাহার কৃতকর্ম্মের সমুচিত দণ্ড যেন ভীষণ মূর্ত্তিতে তাহার চক্ষুর উপরে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছিল। সে কি করিবে, কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে, এই বিপদ-সাগর হইতে ত্রাণ পাইবে, তাহা সে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিল না। মালতীকে নিহত করিতে পারিলেই যেন তাহার সকল আপদ চুকিয়া যাইত,—কিন্তু তাহার বক্ষের উপরে শাণিত ছোরা তুলিয়াও আবার ফিরিয়া পড়িতে হইল কেন,—তাহা শীতলরায় বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই,—এখন সে বুঝিতেছে, তাহার হৃদয়ের দারুণ দুর্ব্বলতা অথবা তাহার নির্ব্বুদ্ধিতা সেই শুভ কার্য্যে বিঘ্ন প্রদান করিয়াছে। এক এক বার মনে হইতেছিল, আবার যাই না কেন,—ছোরা এখনও নিকটে আছে,—তাহার দুর্ব্বল বক্ষে বিদ্ধ করিয়া দিয়া সকল বিপদের অবসান করি। কিন্তু সাহসে কুলাইতেছিল না,—মনে হইতেছিল, সেখানে যেন কেমন একটা পাপের প্রতিফল দিবার মহাশক্তি জাগরিত আছে।

পরদিন শীতলরায় উদয়েশ্বরের নিকটে যাইতে পারিল না। ইচ্ছা করিয়াও যাইতে পারিল না,—তাহার মনে হইতে লাগিল, সেখানে গমন করিলেই উদয়েশ্বরের কটীস্থ তরবারিতে তাহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইয়া যাইবে। হায়! সে মরিলে তাহার স্ত্রী-পুত্রদিগের মুখের দিকে কে চাহিবে? মালতীর অপ্সরা-রূপের মোহ যাহাদিগকে ভুলাইয়া দিয়াছিল, আজি আসন্ন বিপদ চিন্তাকালে তাহাদেরই মুখগুলি, তাহাদেরই

স্নেহ-করুণ বাহুগুলি, তাহাদের কৃতকর্ম্মগুলি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হইয়া বড় বাঁধন বাঁধিতে লাগিল।

শীতলরায় আসিল না দেখিয়া উদয়েশ্বর ভাবিল তাহারই ষড়যন্ত্রে হয় ত মালতী পথের 'কাঙ্গালিনী হইয়াছে,—যে দোষী—যে পাপী সে ভীত। শীতলরায় ভয়েই আসে নাই। তখন শীতলরায়কে নিতান্ত প্রয়োজন জ্ঞান করিয়া উদয়েশ্বর গৌড়েশ্বরকে এক পত্র লিখিল। তাহাতে লিখিয়া দিল,—"শীতলরায়কে আমার অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে, তাহাকে ডাকিতে পাঠানোতেও সে আইসে নাই, অনুগ্রহ করিয়া ফৌজদারি পদাতিক দ্বারা তাহাকে ধৃত করিয়া আমার নিকটে পাঠাইয়া দিবেন।"

উদয়েশ্বরের পত্র পাইবামাত্রে গৌড়েশ্বর ফৌজদারসাহেবকে আদেশ করিলেন,—"এই মুহূর্ত্তেই শীতলরায়কে ধৃত করিয়া মহারাজা উদয়েশ্বরের সমীপে পাঠাইয়া দাও।"

ফৌজদারসাহেবের তর্জ্জন গর্জ্জন ও অগ্নি-আদেশে উত্তেজিত হইয়া কয়েকজন পদাতিক শীতলরায়ের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল, এবং যথোচিত অসদ্ব্যবহারের সহিত তাহাকে ধৃত করিয়া উদশ্বয়েশ্বরের নিকটে পঁহুছাইয়া দিল।

তখন বেলা দ্বিপ্রহর। দ্বিপ্রহরের রৌদ্র তীক্ষ্ণতর তেজে পৃথিবীর অঙ্গ দহন করিতেছিল। জীবকুল ছায়াতলে বিশ্রাম কামনায় অনাচ্ছাদিত স্থান পরিত্যাগ করিয়াছিল।

সুবিস্তৃত প্রাসাদের একটী প্রকোষ্ঠে উদয়েশ্বর ও শীতলরায়। উদয়েশ্বর একখানি কার্পেটের আসনাবৃত কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট,—সম্মুখে একখানি খালি কাষ্ঠাসনে শীতলরায় উপবিষ্ট। উদয়েশ্বর বলিল,—"আমি তোমাকে ডাকাইয়াছিলাম, আইস নাই কেন?"

কম্পিত বক্ষ চাপিয়া শীতলরায় বলিল,—"আজ্ঞে হুজুর, আমার অসুখ সারে নাই বলিয়া আসিতে পারি নাই। গরীবের ত্রুটী মার্জ্জনা করুন।

উ। আমাকে কি তুমি চিনিতে পারিতেছ?

শী। আজ্ঞে চিনিতে পারিতেছি বৈ কি,—আপনি আমার অন্নদাতা পিতা জগন্নাথ চৌধুরী মহাশয়ের জামাতা।

উ। আমার উপরে ফাঁসির আদেশ হইলে, আমি কারাগার হইতে পলায়ন করি,—কারাগার হইতেই সংবাদ পাইয়াছিলাম, তার আগেই আমার শ্বশুর আত্মহত্যা করেন,—কিন্তু আমার স্ত্রীর সংবাদ তুমি কিছু জান কি?

শী। হ্যাঁ—হ্যাঁ—তিনি ত—তাঁহাকে ত আপনিই সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

উদয়েশ্বর শীতলরায়ের মুখের দিকে চাহিয়াছিল,—প্রতিকথা বলিবার সময় তাহার মুখের ভঙ্গি দর্শন করিয়া উদয়েশ্বর বুঝিতেছিল, সে ভয়ে ভয়ে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলিতেছে,—এবং এক গোপন কথা বড় ভয়ে লুকাইয়া রাখিবার জন্য অস্বাভাবিক চেষ্টা করিতেছে। তাহার ভাব ভঙ্গিতে উদয়েশ্বর বুঝিতে পারিল,—মালতীর অন্তর্ধানের ঘটনার সহিত শীতলরায়ের গাঢ় সম্বন্ধ নিহিত আছে।

উদয়েশ্বর তখন ছলনার পন্থা অনুসরণ করিল। ক্রোধ-রক্তেক্ষণে বলিল,—"শোন শীতলরায়, শুনিতে আমার কিছুই বাকি নাই। আমার স্ত্রীর উপর তুমি যে রূপে অত্যাচার করিয়াছ, আমি তাহার প্রতিশোধ লইব। তোমার স্ত্রী-পুত্রগণকে আনাইয়া তোমার সম্মুখে একটি একটি করিয়া বলিদান দিব,—তারপর কুকুরের দ্বারা জীবন্তে তোমার দেহ খাওয়াইব! আমি যাহা আদেশ করিব, তাহার বিরুদ্ধে কথা কহিবার শক্তি কাহারও নাই।"

শীতলরায় কাঁপিতেছিল। কি বলিবে, তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না,—তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। দোষীর হৃদয়ের বল থাকে না, যে কথা সে সর্ব্বপ্রকারে গোপন করিয়া যাইবে স্থির করিয়া রাখে, সময়ে—সে কথা বলিয়া ফেলিতে পারিলে যেন বাঁচে এমনই ভাব হয়। শীতলরায়ের মনের অবস্থাও তখন সেই প্রকার হইল, সে আর হৃদয়ের কথা চাপিয়া রাখিতে পারিল না,—উত্তেজিত ভাবে কম্পিত কণ্ঠে বলিল—"প্রভু, উদয়েশ্বর; আমাকে ক্ষমা কর। তোমার স্ত্রী সতী—সতীকে আমি অশেষবিধ প্রকারে লাঞ্ছনা দিয়াছি—আমার পাপের বিমোচন নাই, কিন্তু এখনও তোমার স্ত্রী আমার বাড়ীতে আবদ্ধ আছেন। তিনি আমার মা, তিনি সর্ব্বপ্রকারে শুচি ও দেবী তুলা তুমি তাহাকে গ্রহণ কর,—আমার মহাপাতকের যে দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা হয়, তাহাই দাও—কিন্তু আমার স্ত্রী-পুত্রগণ কোন দোষে দোষী নহে,—তাহাদিগকে কিছু বলিও না।"

উদয়েশ্বর বলিল,—"তোর পাপের যে দণ্ড দিতে হয় তাহা দিব, কিন্তু এখনই পাল্কী লইয়া গিয়া মালতীকে আমার বাড়ী লইয়া আয়।"

শীতলরায় উঠিয়া দাঁড়াইল। উদয়েশ্বর একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া পাল্কী লইয়া শীতলরায়ের সঙ্গে যাইতে আদেশ করিলেন, এবং শীতল রায় কোথাও না পলায়ন করে, এই জন্য দুই জন প্রহরীর জিম্মা করিয়া দেওয়া হইল।

বেলা তৃতীয় প্রহরের পরে মালতীর শিবিকা আসিয়া প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল,—দুইজন দাসী আসিয়া সেই শীর্ণ প্রতিমাকে যত্নে তুলিয়া বাটীর মধ্যে লইয়া গেল। যদিও শীতলরায় সমস্ত কথা মালতীর নিকট বলিয়াছিল,—যদিও শীতলরায়ের নিকটে মালতী শুনিয়াছিল, তাহার স্বামী উদয়েশ্বর এখন গৌড়নগরের মধ্যে অদ্বিতীয়

ধনী, এবং তাঁহারই নিকটে লইয়া যাইতেছে,—কিন্তু পাপাত্মার কথা মালতী বিশ্বাস করিতে পারে নাই। সে ভাবিয়াছিল, নীচাশয় আবার কোন্ নূতন চক্রজালের সৃষ্টি করিয়াছে,—আবার কোন্ নূতন অত্যাচারের যন্ত্রে পেষনার্থ তাহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছে।

প্রাসাদে প্রবিষ্ট হইয়া মালতী, তাহার ক্ষীণ কণ্ঠে এক দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল—"এ বাড়ী কাহার?"

দাসী অভিবাদন করিয়া বলিল,—"মহারাজা উদয়েশ্বরের।"

মহারাজা উদয়েশ্বরের! উদয়েশ্বর তাহার হৃদয়েশ্বর বা উপাস্য দেবতা;—কিন্তু ইনি কি তিনিই। না, অন্য কাহারও নিকটে ছলনা করিয়া ধূর্ত্ত—লইয়া আসিয়াছে। কিন্তু মহারাজা হউন, বাদশা হউন,—সতীর নিকটে সকলেই তুচ্ছ—সকলেই সন্তান। পতিই দেবতা

মালতীর আসিবার সাধ্য ছিল না,—সে শয্যার উপরে ঢলিয়া পড়িতেছিল,—ঠিক্ সেই সময়ে এক দাসী বলিল,—"মহারাজা আসিতেছেন।"

কম্পিত হৃদয়ে মালতী আবার উঠিয়া বসিল। উদয়েশ্বর গৃহে প্রবেশ করিল। মালতীর চিরারাধ্য ধ্যেয় মূর্ত্তি গৃহাগত দেখিয়া সে উদ্বেলিত, উচ্ছ্বসিত ও আকুলিত হইয়া ছুটিয়া উদয়েশ্বরের চরণ-তলে লুঠিয়া পড়িল। বলিল,—"প্রাণেশ্বর, হৃদয়-দেবতা; তুমি?"

আর কথা কহিতে পারিল না। প্রবল উত্তেজনায় অত্যধিক রক্ত-সঞ্চালনে সে মূর্চ্ছিত হইয়া উদয়েশ্বরের চরণ-তলে ঢলিয়া পড়িল।

উদয়েশ্বরের দানবীশক্তি কম্পিত হইল। সে দৈবশক্তির স্পর্শে উদয়েশ্বর আনন্দ বোধ করিল না,—কিন্তু বুঝিতে পারিল মালতী নিষ্পাপ। মালতী দেবী।

দাসী ব্যজনী ব্যজন করিল, একজন পুষ্পবাসিত জলসিঞ্চন করিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরেই মালতীর জ্ঞান হইল, সে উঠিয়া বসিল। প্রথমে সে কিছুই বুঝিতে পারে নাই,—জাগিয়াও ভাবিতেছিল, সে বুঝি স্বপ্ন দেখিতেছে! সে মনে মনে সে দিবসের স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র জপ করিল। উদয়েশ্বর দশহস্ত দূরে সরিয়া গেল। মালতী বুঝিল, স্বপ্ন নহে; সত্য। সত্যই সে, তাহার স্বামী-দেবতার নিকটে উপস্থিত রহিয়াছে। সত্যই তাহার আশার বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। সে দুর্ব্বল আঁখি উন্মীলিত করিয়া বলিল,—"নাথ, বহুদিন পরে দেখা পাইয়াছি,—অনেক কষ্টে দেখা পাইয়াছি,—চাহিয়া দেখ, আমার শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—বোধ হয়, পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি বলে তোমার চরণ দর্শন পাবার জন্যেই এই ভগ্ন দেহে—এত কষ্ট পাইয়া এখনও প্রাণ আছে। যদি দেখা পাইয়াছি—দূরে যে'ও না, সরে এস—বহু দিনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া লই।"

উদয়েশ্বর তখন মালতীর নিকটস্থ হইল। একটু আদর করিয়া, একটু স্নেহ করিয়া বলিল,—"মালতী, বড় কষ্ট পাইয়াছ? শাতলরায়কে আমি উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিব। এক্ষণে আমি অতুল ধনশালী, তুমি সুখে স্বচ্ছন্দে বসতি কর।"

মালতীর চক্ষু পূরিয়া আনন্দের অশ্রু সঞ্চিত হইল। গদগদ কণ্ঠে বলিল,—"আমি ধন চাহি না, অন্য সুখ চাহিনা,—তোমার চরণসেবা করিতে পারিলেই আমি অতুল সুখে সুখী হইব। মা সাবিত্রী দেবী আমাকে মন্ত্র দিয়াছেন,—মায়ের কৃপাতেই—আবার তোমাকে প্রাপ্ত হইলাম।"

উ। সাবিত্রী কে?

মা। পুরাণে শুনিয়াছি—তিনি সৃষ্টি স্থিতি পালনের মহাশক্তি—

তিনি জগতের সৃষ্টিকারিণী বীজ—তিনি নারী-হৃদয়ের পরম মঙ্গলময়ী দেবী—তিনি মহাশক্তি।

উ। তিনি কি তোমায় দেখা দিয়াছিলেন?

মা। স্বপ্নে দেখাদিয়া ছিলেন।

উ। ছি ছি,—অমূলক চিন্তাময় স্বপ্নকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস কর?

মা। আমাকে যে মন্ত্র তিনি দান করিয়াছেন, এখনও তাহা আমার মনে আছে। তিনিই স্বপ্নে বলিয়াছিলেন—শীঘ্রই স্বামী দর্শন পাইবে,—অতএব স্বপ্ন কেন সত্য হইবে না, নাথ?

উ। মিছে কথা,—পুরাণ, মনুষ্য প্রণীত কাব্য গ্রন্থ মাত্র।

মা। কাব্যেও সত্য আছে। জগৎ ভাবময়—কবিতায় ভাব—ভাব জনার্দ্দন।

উ। ও সকল কথায় কাজ নাই,—এখন যাতে তোমার শরীর সারে, তার চেষ্টা করিতে হইবে।

মা। শরীর তোমার,—প্রয়োজন হয়, সারিয়া লও।

উ। এই বাড়ী-ঘর-দুয়ার আমার—সুতরাং তুমিও ইহার অধিকারিণী। দাস-দাসী ধন-রত্ন প্রভৃতিতে আমার এই পুরী পরিপূর্ণ আছে। তুমি যথা ইচ্ছা ইহার ব্যবহার করিতে পার।

মা। বলিয়াছি ত, দাসী কিছু চাহে না,—চাহে কেবল তোমার চরণ সেবা করিতে।

উদয়েশ্বর তখন তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বহির্ব্বাটীতে গমন করিল। সেখানে প্রহরীগণের জিম্মায় শীতলরায় অবস্থিতি করিতেছিল। উদয়েশ্বর তাহাকে ডাকিয়া বলিল,—শীতলরায়, তুমি যে কার্য্য করিয়াছ, তাহার উপযুক্ত দণ্ড কি, তুমিই বিচার করিয়া বল,—আমি তোমাকে সেই দণ্ডই প্রদান করিব।”

শীতলরায় কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল,—"আপনার শ্বশুরের যে সকল অর্থ আমি অপহরণ করিয়াছি, তাহা আপনাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি,—আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।"

উদয়েশ্বর গর্জ্জন করিয়া বলিল,—"নরাধম! অর্থের অভাব আমার নাই, অর্থ আমি চাহি না, কিন্তু তোকে এমন দণ্ড দিতে চাহি যাহাতে তুই অর্থ থাকিতেও তাহা ভোগ করিতে পারিবি না,—স্ত্রী-পুত্র থাকিতেও তাহাদিগকে লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন-কাল অতিবাহিত করিতে পারিবি না,—এই তোর সেই দণ্ড গ্রহণ কর।"

উদয়েশ্বর উঠিয়া সজোরে শীতলরায়ের বক্ষে এক পদাঘাত করিল,—থর থর কাঁপিতে কাঁপিতে শীতলরায় ভূ-পৃষ্ঠে পড়িয়া গেল। তাহার আর উঠিবার শক্তি নাই,—সমস্ত দেহ জড়বৎ অচল। কেবল দৃষ্টিশক্তি আর জীবনীশক্তি বিদ্যমান থাকিল।

শীতলরায় বুঝিল, তাহার সমস্ত শরীর অসাড় হইয়া গিয়াছে। সে হাহাকার করিয়া কান্দিয়া উঠিল। কান্দিতে কান্দিতে বলিল,—"আমায় কি করিলে? ইহা হইতে আমাকে কেন কাটিয়া ফেলিলে না?"

উদয়েশ্বর সে কথার কোন উত্তর প্রদান করিল না। ভৃত্যকে আদেশ করিল, "যে কোন যানে তুলিয়া এই পশুকে ইহার বাড়ী রাখিয়া আয়।"

ভৃত্য আদেশ পালন করিল।

শীতলরায়ের দুরবস্থা দেখিয়া, তাহার স্ত্রী-পুত্রগণ কান্দিতে লাগিল। শীতলরায়ের উঠিয়া বসিবারও শক্তি ছিল না,—সার্ব্বাঙ্গিক জড়তা ও বৃশ্চিক দংশনের বেদনা লইয়া হতভাগ্য শীতলরায় মরণ-যন্ত্রণায় দিন কাটাইতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

স্বামী-সন্দর্শনে পরম সুখী হইয়া এবং যথোচিত শুশ্রূষার ফলে অল্প দিনের মধ্যেই মালতী সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইল,—তাহার দেহে নব বর্ণ ও লাবণ্য ফিরিয়া আসিল।

মালতী ভাবিতেছিল, সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ—ইহাই সংসার-লিপি! বুঝি তাহার জীবনের দুঃখ-মেঘ অপনোদিত হইয়া সুখ-সূর্য্য উদিত হইয়াছে! কিন্তু কয়েক দিন পরে বুঝিল, তাহার সে ধারণাটা ভুল।

কেন না, স্বামীর সুখেই স্ত্রীলোকের সুখ। স্বামীর হাসি মুখ দেখিলেই রমণীর হাসি আসে;—রমণী ত দর্পণস্থ স্বামীর প্রতিবিম্ব। কিন্তু তাহার স্বামী যেন সর্ব্বদাই নিরানন্দ, সর্ব্বদাই অশান্তির আগুনে বিদগ্ধ। চিত্ত-প্রসন্নতা তাহার কখনই নাই,—এত ধনের অধীশ্বর হইয়া, এত সম্মান-প্রভুত্বের অধিপতি হইয়াও তাহার প্রাণে শান্তি নাই,—তবে মালতীর সুখ হইবে কেমন করিয়া? চাঁদের হাসি না ফুটিলে যামিনী কবে হাসিয়া থাকে?

আরও এক বিচিত্র বার্ত্তা;—উদয়েশ্বর মালতীর নিকটে আসিলেই যেন সমধিক উন্মনা ও চঞ্চল হইয়া পড়ে;—মালতীর নিকটে সে, দু'দণ্ডও স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। মালতী বিবেচনা করে, তাহার স্বামী তাহাকে ভাল বাসেন না বলিয়াই তাহার নিকটে থাকিয়া সুখী হন না। তার জন্য মালতী দুঃখিত নহে,—যদি তিনি তাহাকে ভাল বাসিতে না পারেন, ভাল বাসিয়া কাজ নাই,—সে ভাল বাসিয়া

পূজা করিয়া আনন্দিত। কিন্তু অভিমান হয়,—দুঃখ হয়,—যাহাতে উদয়েশ্বর ভাল বাসিতে পারেন,—সুখী হইতে পারেন, এমন রূপ গুণ বিধাতা কেন তাহাকে দেন নাই?—তাহাকে লইয়া—তাঁহাকে পাইয়া যদি উদয়েশ্বর সুখী হইতে পারিতেন, তবেইত মালতীর নারীজন্ম গ্রহণ করা সার্থক হইত।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মালতী একটা কক্ষমধ্যে বসিয়া প্রাগুক্ত বিষয়ের চিন্তা করিতে ছিল, এবং সম্মুখে এক খানি প্রলয়কালের শূলপাণি মহাকালের চিত্র পড়িয়াছিল। সহসা সেই গৃহে উদয়েশ্বর আসিয়া প্রবেশ করিল। মালতী সর্ব্ব প্রকারেই স্বামীকে সুখী করিবার চেষ্টা করিত,—সে উঠিয়া হাসিমুখে স্বামীর হস্ত চাপিয়া ধরিয়া নিজাসনে আনিয়া বসাইল। উদয়েশ্বর মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"একা সিয়া বসিয়া কি করিতেছিলে?"

"রমণী অন্তঃপুরাবদ্ধা। স্বামী-দেবতা বাহিরের কাজে ব্যস্ত থাকিলে, সে গৃহে বসিয়া তাঁহারই চরণ ধ্যান করিয়া কাটায়।" মালতী এই কথা বলিলে, উদয়েশ্বর বলিল,—"একা বসিয়া বসিয়া কি হইতেছিল?"

"আর কি হবে, এই মাত্র রাঁধুনীঠাকুরাণীকে রাঁধিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আসিয়া, বসিয়া বসিয়া এই ছবিখানার ভীষণ-সৌন্দর্য্য—প্রলয়ে-সংহার মূর্ত্তি দেখিতেছিলাম।"—এই কথা বলিয়া পার্শ্বস্থ মহাকালের চিত্রখানি টানিয়া স্বামীর সম্মুখে রাখিয়া বলিল,—"দেখ কেমন সুন্দর চিত্র।"

চিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র উদয়েশ্বরের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল; শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল; সে চীৎকার করিয়া লাফ দিয়া উঠিয়া পড়িল এবং ছুটিয়া গৃহের বাহির হইল।

মালতী বিস্মিত ও ব্যস্ত হইয়া স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইল।

উদয়েশ্বর বাহিরের ছাদে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল,—তাহার চোক মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘাম বাহির হইতেছিল।

মালতী তাহার হাত ধরিয়া সেখানে বসাইল, এবং চীৎকার করিয়া দাসীকে ডাকিয়া জল ও ব্যজনী আনিতে বলিল,—জল ও ব্যজনী আনিয়া পঁহুছিলে, সে উদয়েশ্বরের চোখে মুখে জল সিঞ্চন করিয়া নিজ হস্তে বাতাস করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে উদয়েশ্বর প্রকৃতিস্থ হইল। বলিল,—"মালতী তুমি ঘরে যাও, বাহিরে আমার কাজ আছে চলিলাম।"

মালতী বাধা দিয়া বলিল,—"যেতে দিব না। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। আমি তোমায় দুইটি কথা শুধাইব,—আমার বড় ভয় হইয়াছে।"

উ। কি শুধাইবে মালতী? বাহিরে এখন আমার অনেক কাজ আছে,—যাহা শুধাইবার থাকে, অন্য সময়ে শুধাইও।

মা। তোমার পায়ে পড়ি, আমার কথা কয়টির সত্য উত্তর দিয়া যাও,—কাজ আজীবনই করিতে হইবে,—মানুষের কাজ অফুরন্ত, সে কখনও ফুরাইবার নয়।

উ। তোমার কি কথা?

মা। কথা অনেক। আজ' কয়টি কথার উত্তর চাই। তুমি চিত্র খানি দেখিয়া অমন করিলে কেন?

উ। না না, তাতে কিছু হয় নাই,—মধ্যে মধ্যে আমার এমন হয়, চিকিৎসকেরা বলে, ইহা স্নায়ুর পীড়া।

মা। কত দিন অন্তর হয়?

উ। ঠিক নাই,—হঠাৎ হ'য়ে পড়ে। যাক্, এই কথা, না আর কিছু আছে?

মা। হাঁ, আরও আছে। যদি উহা রোগ, তবে আরোগ্যের চেষ্টা

কেন করিতেছ না? কৈ, তোমাকেত এক দিনও অষুদ-বিষুদ খাইতে দেখিনি,—যদি রোগ, তবে পুষিয়া রাখিতেছ কেন?

উ। তুমি এ বাড়ীতে আসিবার পূর্ব্বে অনেক ঔষধ সেবন করিয়া দেখিয়াছি,—কিছুতেই কিছু হয় নাই।

মা। তবে এক কাজ করিব?

উ। কি?

মা। কোন ভাল পুরোহিত আনাইয়া রোগ শান্তির জন্য স্বস্ত্যয়ন করাই।

মালতীর মুখের দিকে বক্র দৃষ্টিতে চাহিয়া উদয়েশ্বর শুষ্ক হাসি হাসিয়া উঠিল। বলিল,—"মেয়ে মানুষের বুদ্ধিই ঐরূপ। শান্তি-স্বস্ত্যয়নে আবার রোগ সারে! ব্রাহ্মণদের উদরান্ন সংগ্রহের উহা একটা পন্থা মাত্র।"

মালতী ম্লানমুখে বলিল,—"না, না, দৈবের চেয়ে আর বল নাই, দৈববলে সব হয়।"

উ। আর কোন কথা থাকে ত বল,—ও সকল বাজে কথা ছাড়িয়া দাও।

মা। বাজে কথা নয়,—রোগ সারিবার কি?

উ। পশ্চিম যাব ভাবছি।

মা। যদি তা'তে রোগ সারে, তাই চল। আমি তোমার সেবা করিবার জন্য সঙ্গে যাইব।

উ। তার এখনও কিছু বিলম্ব আছে,—সংসারের অনেকগুলি কাজ আছে, সারিয়া যাইব।

মা। আর এক কথা।

উ। কি কথা বলিয়া ফেল।

মা। তোমাকে সর্ব্বদাই বিমর্ষ দেখি কেন? তোমার প্রাণ অমন
াান্তিহারা কেন?

উ। অদ্ভুত কথা,—অদ্ভুত প্রশ্ন! এ প্রশ্নের উত্তর নাই। আর
দি কোন কথা থাকে বল?

মা। তুমি আগে কোন্ এক ভাগ্যবতীকে ভালবাসিতে,—এখনও
কি তাহার বিষয় চিন্তা কর?

উ। যদি বলি হাঁ করি।

মা। আমি বলি, তাকে খুঁজিয়া আন। তাহাকে পাইলে যদি
তামার শান্তি হয়, সুখ হয়,—তাহাকে আন।

উ। এক দিন তোমাদের বাড়ীর উদ্যানে বেড়াইতে বেড়াইতে
লিয়াছিলে,—তুমি আমায় ভালবাসিবে, আর আমি তোমায় ভাল
াসিব, ইহা ভিন্ন অন্যকে ভালবাসিতে নাই,—আজি আবার এ
বস্থা কেন?

মা। লোকে দুষ্ক্রিয়া করে—যাহা করিতে নাই তাহা করে,—যে
ষ্ক্রিয়া করে, তাহাকে লোকে সদুপদেশ দেয়,—যখন সদুপদেশে ফল
য় না, তখন আর কি করিবে?

উ। তবে আমাকে এখন দুষ্ক্রিয়ায় মজিতে বলিতেছ?

মা। তুমি যাহা করিবে, তাহা দুষ্ক্রিয়া কি সুক্রিয়া, জানি না,—
মি যাহাতে সুখী হইবে,—আমার তাহাতেই শান্তি। যদি তাহাকে
ত দিন চেষ্টা করিয়াও ভুলিতে না পারিয়া থাক, তবে তোমার দোষ
ক? চেষ্টায় সিদ্ধ না হইলে, উপায় কি?

উ। তাহাকে ঘরে আনিতে বল?

মা। উপায় থাকিলে, তাহাই কর।

উ। সে মুসলমান।

মালতী শিহরিয়া উঠিল। উদয়েশ্বর পুনরপি বলিল,—"মুসলমানের সহিত তুমি এক বাড়ীতে বসবাস করিতে পারিবে ?

ক্ষীণকণ্ঠে মালতী বলিল,—"এক বাড়ীতে থাকিতে আপত্তি নাই। তবে—একত্রে থাকিতে পারিব না।"

উ। কেন ?

মা। শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে ?

উ। শাস্ত্র ?—উহা ব্রাহ্মণদের স্বার্থপরতার প্রলাপ বাক্য।

মা। আমার একটা অনুরোধ রক্ষা কর,—শাস্ত্রে বিশ্বাস কর, ধর্ম্মে বিশ্বাস কর, দেবতায় বিশ্বাস কর,—ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ কর,—পূজা আহ্নিক কর,—তোমার মনে শান্তি ও সুখ আসিবে। তুমি পুরুষ মানুষ সব বোঝ,—আমি রমণী অল্পবুদ্ধি. তোমাকে কি বুঝাইতে পারি ?—কিন্তু পৃথিবীর যে দেশেই যে জাতি আছে, তাদের সকলেরই দেশে শাস্ত্র আছে. ধর্ম্মমত আছে,—উপাসনা আছে, আরাধনা আছে,—তারা সকলেই ত মানিয়া চলে—আপন আপন ধর্ম্ম সকলেই যাজন করে। উহা মিথ্যা হইলে—কবির কল্পনা হইলে, জগৎ যুড়িয়া চলিত না,— তোমার পায়ে ধরি, ধর্ম্ম কর্ম্ম কর। তোমার টাকা আছে—ধন-রত্ন আছে—দাস দাসী আছে,—তুমি কর্ম্ম কর, ধর্ম্ম কর।

উদয়েশ্বরের প্রাণে যেন অশান্তির অগ্নি-শিখা জ্বলিয়া উঠিল। সে মনে মনে বলিল, হায়! মালতী; তুমি জান না, আমার আর সে পথে যাইবার সাধ্য নাই। আমি সব বুঝি—কিন্তু ও নাম আর মুখে আনিবার সাধ্য নাই। দানবী-শক্তি পরিচালনে ও শুভ শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছি। ইচ্ছা হইলেও কার্য্য-শক্তি আর নাই। প্রকাশ্যে বলিল,— "ও সকলের কিছুই আমি শুনিতে চাহি না। আর কোন কথা আছে ?"

উদয়েশ্বরের ম্লান মুখ দেখিয়া বুদ্ধিমতী মালতী বুঝিতে পারিল,

আমার স্বামী কি অশুভ শক্তির আকর্ষণে পড়িয়া গিয়াছেন,—প্রাণে ইচ্ছা আছে, কিন্তু কার্য্য-করণ ক্ষমতা নাই। মালতী যেন স্পষ্ট বুঝিতে পারিল তাহার স্বামীকে কোন অপদেবতায় পাইয়াছে,—সেই জন্যই তাহার স্বামী ধর্ম্মাচরণ করিতে পারেন না। তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল,—জানু পাতিয়া স্বামীর চরণ তলে বসিয়া করুণকণ্ঠে বলিল,—"প্রভু, স্বামী; তুমি দেবতা, আমি তোমার দাসী,—ধর্ম্মাচরণ করিবে, আমি তোমার সহায়তা করিব—তাই স্ত্রী সহধর্ম্মিণী। সেই সহধর্ম্মাচরণের বলে আমরা পরলোকে দু'য়ে মিশিয়া এক হইব। আমার কথা রাখ, ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হও।—দেবতা আছেন, ধর্ম্ম আছেন, পরলোক আছে স্বর্গ আছে, কর্ম্মফল আছে।"

উদয়েশ্বরের চক্ষু দিয়া পৈশাচিক অনলের ঝলক বহিয়া গেল। সে আর সেখানে অবস্থান করিতে সক্ষম হইল না। ত্বরিত গতিতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

মালতী স্বামীর অবস্থা দেখিয়া বড়ই কাতর হইল। সে যুক্তকরে গলদশ্রু লোচনে উর্দ্ধদিকে চাহিয়া কাতর কণ্ঠে ডাকিয়া বলিল,—"মা, সাবিত্রী! আমার স্বামীকে সুমতি দাও। আমার স্বামীর ধর্ম্মে মতি হোক,—স্বামীস্ত্রীতে এক হইয়া তোমার পবিত্র গাথা গান করি।

দশম পরিচ্ছেদ

উদয়েশ্বর বহিঃপ্রকোষ্ঠে গমন করিয়া একখানা খট্টার উপরে শুইয়া পড়িল। তাহার প্রাণে তখন অশান্তির অশুভ অনল লক্ লক্ জিহ্বা বিস্তার করিয়াছিল! সে অন্তরে অন্তরে জ্বলিতে জ্বলিতে মনে মনে বলিতে লাগিল,—মালতীর কথিত সুপথে যাইবার উপায় নাই। হৃদয়কে বিলাইয়া দিয়াছি—এ হৃদয়ে আর ধর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত হইবে না। পিশাচকে আত্মদান করিয়াছি,—পিশাচ আমার সঙ্গে কত খাটিতেছে আমাকে বড় লোক করিয়াছে, আমাকে অসাধারণ ক্ষমতাশালী করিয়াছে —কিন্তু এততেও শান্তি নাই। ক্ষুদ্র রমণী মালতীর নিকটে আমি যেন ক্ষুদ্র মশা,—সে যেন অনন্ত শক্তিশালিনী। হায়, আমি কি সর্ব্বনাশই করিয়াছি। যদি হৃদয় পিশাচের পদে বলি না দিতাম, তবে মালতীর সঙ্গে ধর্ম্মাচরণে সুখী হইতে পারিতাম। ধনে সুখ নাই, ক্ষমতায় সুখ নাই—সুখ শান্তিতে। শান্তি বুঝি ধর্ম্ম ভিন্ন নাই। কিন্তু ধর্ম্ম? উঃ! ধর্ম্ম কি অগ্নিময়,—ধর্ম্ম কি ভীষণতাময়!

উদয়েশ্বরের মনে হইল, যাহার জন্য আমার এত অধঃপতন, যাহাকে পাইবার জন্য আমার পিশাচ-পদে আত্মবলি, যাহার রূপ উপভোগের জন্য দীর্ঘ দিবস নরকবাসের প্রতিজ্ঞা,—কামনার আগুনে বিদগ্ধ হইবার শপথ—তাহাকে পাইলাম কৈ? জাহানারা—জাহানারাকে পাইবার আশাতেই আমার এত,—কিন্তু তাহাকে পাইলাম না।

উদয়েশ্বর তখন উত্তেজনায় উঠিয়া বসিল। মনে মনে ভাবিল, আমার

অলৌকিক শক্তি রহিয়াছে,—আমি ইচ্ছা করিলে মহা প্রলয়ের গতি নিরুদ্ধ করিয়া দিতে পারি,—আমি কেন জাহানারার কৃপার ভিখারী। আজিই সেখানে যাইব,—আজিই তাহার চরণ ধরিয়া সাধিয়া দেখিব। যদি আমার না হয়,—তখন আমার অদম্য-শক্তি প্রয়োগে তাহাকে ধরিয়া আনিয়া, আমার করিয়া লইব।

বল প্রকাশে প্রাণ পাওয়া যায় না, ভালবাসা মিলে না, তাই তার পোষমানা প্রাণীর মত পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া থাকি,—কিন্তু আমি কি ভ্রান্ত। প্রাণ লইয়া কি করিব? ভালবাসা লইয়া কি ধুইয়া খাইব,—চাই, তাহার রূপ। রূপের উপভোগই আকাঙ্ক্ষা।

পৈশাচিকশক্তি-চালিত, উদয়েশ্বর পিশাচ-বুদ্ধিতে এই সিদ্ধান্ত করিয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া অশ্বসজ্জা করিতে আদেশ প্রদান করিল।

তারপরে অশ্বারোহণ করিয়া উদয়েশ্বর সাতকানিয়ার বাগানাভিমুখে চলিয়া গেল।

দানবীশক্তি পরিচালিত অশ্ব রাত্রি ছয় দণ্ডের মধ্যে সাতকানিয়ার বাগানে জাহানারার আশ্রম সান্নিধ্যে উপস্থিত হইল। উদয়েশ্বর অশ্বকে বিশ্রামার্থ ছাড়িয়া দিয়া, জাহানারার কুটীরে প্রবেশ করিল।

সে দিন জাহানারার নিকটে সফিনা ছিল। উভয়ে প্রাঙ্গনে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল। সহসা উদয়েশ্বরকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া সফিনা বলিল—"একি উদয়েশ্বর কোথা হইতে? কত দীর্ঘ দিন তোমাকে দেখি নাই,—আর দেখা হইবে, সে আশাও কোন দিন করি নাই।"

উদয়েশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিল,—"বাঁচিয়া থাকিলে সাক্ষাৎ হয়। আমি এখন ভাল আছি।"

স। কোথায় আছ?

উ। গৌড়নগরে।

স। বাদসাহ আর কোন গোলযোগ ঘটায় নাই ত?

উ। সে সাধ্য নাই,—আমি এখন অতুল ধনশালী ও ক্ষমতাপন্ন। বাদশাহ এখন আমার বন্ধু,—বাদশাহ আমাকে সসম্মানে মহারাজা উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

স। তা বেশ্। তোমার স্ত্রী কোথায়?

উ। কে মালতী?

স। হ্যাঁ।

উ। আমার বাড়ীতে।

স। আনন্দিত হইলাম।

জাহানারা মৃদু হাসিয়া বলিল,—"লোকটাকে ব'সতে দিয়ে, তারপরে প্রশ্নগুলার ভার দেওয়া কর্ত্তব্য নয় কি?

সফিনা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া, মৃদু হাসিয়া আসন আনিবার জন্য তাড়াতাড়ি উঠিয়া যাইতেছিল, জাহানারা বলিল,—চল সকলে ঘরের মধ্যে যাই। এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই।"

তখন তিনজনে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। গৃহখানি সুন্দরভাবে সুসজ্জিত,—মেঝেয় একখানা কম্বলাসনের উপরে একটি শিশু নিদ্রা যাইতেছিল। উদয়েশ্বরকে পৃথক্ একখানা আসন দিয়া জাহানারা ও সফিনা সেই ঘুমন্ত শিশুর শয্যায় উপবেশন করিল।

উদয়েশ্বর জাহানারার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"শিশুটি কে?"

জাহানারা মৃদু হাসিয়া বলিল,—"আমার ছেলে।"

সে যে ভাবে কথাটা বলিল, তাহাতে যে কোন প্রকার রহস্য আছে, তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না। কথার ভাবে তাহারই শিশু বলিয়

বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইতে হয়, কিন্তু উদয়েশ্বর অবশ্য সে কথা বিশ্বাস করিল না। বলিল,—"সত্য বল, ছেলেটি কে?

জা। কেন, বিশ্বাস হইল না?

উ। কি বিশ্বাস হবে?

জা। আমার ছেলে বলিয়া?

উ। তুমি যে অবিবাহিতা!

জা। তুমি জান না, আমি খসম কাড়িয়াছি।

উ। তুমি রহস্যপ্রিয়া।

জা। তাই জন্যে কি খসমটা উড়িয়া যাইবে?

উ। যাক্, বাজে কথা রাখ,—ছেলেটি কার বল?

সফিনা বলিল,—"কেন আশার উচ্ছ্বাসে আঘাত কর, ছেলেটি আমার, উদয়েশ্বর।"

উ। বেশ ছেলে, বেঁচে থাক্। কিন্তু একটা কথা,—তোমরা যোগধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছ,—যোগীদের নাকি সন্তানাদি হয় না?

স। সকলেই কি সংস্কার নিরোধ করিতে পারে? যতদিন আহার নিদ্রা প্রভৃতি থাকে, ততদিন সন্তানও হয় বৈ কি,—জাহানারাকে বিবাহ কর, তোমারও সন্তান হবে।

উ। তুমি আমার চিরহিতার্থী,—জাহানারাকে ব'লে শীঘ্র মিলন করিয়ে দাও।

স। তুমি আর একদিন এসেছিলে, তাও জাহানারার নিকটে শুনিয়াছি; জাহানারাকে কি তুমি খুব ভালবাস?

উ। সেকথা আর কত দিন বলিব?

জাহানারা বলিল,—"শোন উদয়েশ্বর; আমার আশা তুমি ছাড়িয়া

দাও। মালতীকে লইয়া ঘর-সংসার কর গে। আমি যোগিনী, যোগধর্ম্ম সাধন করিয়াই জীবন কাটাইব।"

উদয়েশ্বর কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া কি ভাবিল, তারপরে বলিল,—"জাহানারা; বহু দিন ধরিয়া তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়াইতেছি। তুমিও মধ্যে মধ্যে আশা দিয়া আমাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতেছ,—কিন্তু আর পারি না। তোমার রূপে আমায় পাগল করিয়া ফেলিয়াছে,—আজি স্পষ্ট শুনিতে চাহি, তুমি আমার হবে কি না?"

জাহানারা মৃদু গম্ভীর স্বরে বলিল,—"তবে সত্য কথা বলি শোন, আমি তোমারি ছিলাম, তুমিও আমারই ছিলে দীর্ঘ দিন তোমাতে আমাতে ঘুরিয়াছি,—কিন্তু কেহ ভুলিয়া কখনও ধর্ম্মপথে বিচরণ করি নাই,—ধর্ম্মের নামও মুখে আনি নাই,—সে কত অতীত জন্মের কথা। তারপরে, তুমি আমাকে ভাবিয়াছ, আমার জন্য কাঁদিয়াছ—মনে মনে আমাকে ডাকিয়াছ, আমিও কাঁদিয়াছি, তোমার বাসনায় তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছি,—মাঝখানে এক ব্যবধান ছিল, সে মালতী। মালতীর ভালবাসায় আর আমার ভালবাসার পার্থক্য ছিল, তাই দুইয়ে মিলন হয় নাই, আমি কাঁদিয়াই ছুটিয়াছি। তোমার পশ্চাতে আরও কতকগুলি অনুতপ্ত আত্মা আছে,—তারা সবাই নিম্নস্তরের মানুষ,—অনবরত তোমার আত্মাকে নিম্নের দিকে টানিতেছে,—তোমার ঊর্দ্ধগতি অসম্ভব। কর্ম্মফলই বল, আর অদৃষ্টই বল—শুভযোগে সদ্‌গুরুর দর্শন পাইয়া যোগ সাধনারূপ পুরুষকারের আশ্রয় লইয়াছি,—তোমাকে ছাড়িতেই বাসনা—আর আমাকে পাইবে না। আমার আশা করিও না।"

উদয়েশ্বর হাঁ করিয়া, প্রহেলিকার ন্যায় জটিলসমস্যাপূর্ণ জাহানারার কথাগুলি শুনিতেছিল, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। যখন

'আমাকে পাইবে না' এই অতি নিষ্ঠুর কথা তাহার কর্ণে গেল. তখন উদয়েশ্বর বলিল,—"আমি তোমার হেঁয়ালি কিছু মাত্র বুঝিতে পারিলাম না, তবে এই মাত্র বুঝিলাম. তুমি আমাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহ. কিন্তু জাহানারা, এত যদি মনে ছিল, তবে আমাকে লব্ধ আশ্বাসে মুগ্ধ করিয়া আমার সব দিক্ নষ্ট করিলে কেন ?

জা। কি আশ্বাস দিয়াছিলাম ?

উ। মনে আছে জাহানারা, তোমাকে দেখিয়া যখন বড় মজিয়া পড়ি, তখন তোমায় পাইবার আশা নাই ভাবিয়া গৌড়নগর পরিত্যাগের উদ্যোগ করিতেছিলাম,—সেই সময় তুমি আমার সেই দীনভবনে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলে. "আমিও তোমায় ভালবাসি,—অর্থ সংগ্রহ কর, বিবাহ হইবে।"

জা। সে কথা বলিয়া তোমাকে লব্ধ আশ্বাসে মুগ্ধ করিয়াছিলাম না,—প্রাণের কথাই বলিয়াছিলাম।

উ। তবে এখন পিছাইয়া পড়িতেছ কেন ? তোমারই আদেশে আমি মালতীকে বিবাহ করি,—অর্থের জন্য—জমিদারির জন্য আমার সে বিবাহ করা। কিন্তু অদৃষ্ট-তাড়নে বিপরীত ফল ফলিল, আমি নির্ব্বাসিত হইয়া পড়িলাম। তারপরে তোমার জন্য বিপুল ধন সঞ্চয় করিয়াছি,—দেশব্যাপী সম্ভ্রম অর্জ্জন করিয়াছি,—এখন তুমি আমার না হইবে কেন ? আগে ভালবাসিতে এখন কি ভুলিয়া গিয়াছ ?

জা। ভুলি নাই, উদয়েশ্বর। ভালবাসিলে কি আর ভোলা যায় ? ভুলিবার চেষ্টা করিয়াই যোগ-সাধনা করিতেছি। যখন তোমাকে দেখিয়াছিলাম, তখন প্রাণের আকুল ক্রন্দন নিভে নাই, কেবল পুরুষ-কারের বলে তাহাকে বাঁধিতেছিলাম,—এখন তার চেয়ে আর একটু

উন্নতি করিতে পারিয়াছি,—এখন আর আমাকে জ্বালাইও না। আর আমার পাকা ধুঁটি কাঁচাইবার চেষ্টায় ফিরিও না।

উ। এইমাত্র বলিতেছিলে, ভুলিবার জন্য যে অবস্থার প্রয়োজন, তাহা তোমার হইয়াছে,—তবে আমি আসিলে তোমার কি ক্ষতি হইবে?

জা। জীবের জন্মজন্মের সংস্কার সূক্ষ্মতম অবস্থায় চিত্তে লীন থাকে। সময় ও অবস্থা পাইলে কার্য্য করিতে থাকে। তুমি বোধ হয়, যে সকল খাল-বিল নৈদাঘী রৌদ্রে শুষ্ক হইয়া যায়, তাহা দেখিয়া থাকিবে,—এক বৎসর যদি জল না হয়, তবে বিশুষ্ক হইয়া পড়িয়া থাকে—কৃষকেরা কত শস্য বুনিয়া লয়.—কিন্তু তাহার কুমুদ-কহ্লার প্রভৃতির বীজ সকল গুপ্তভাবে কোথায় থাকে, কেহ বলিতে পারে না,—আবার যে বৎসর জলে খাল-বিল পূর্ণ হয়, সেই বার দেখিবে, শত শত কুমুদ-কহ্লারে জলরাশি শোভা ধারণ করিয়াছে। এ জগতে সমুদয় কার্য্য একই নিয়মে সম্পাদিত হয়,—নিয়মের ব্যতিক্রম বা বিশৃঙ্খলা কোথাও না। তোমার অনুরাগ-বীজ আমি তেমনি নৈদাঘী-রৌদ্রে শুকাইয়া রাখিতেছি, কিন্তু তুমি যদি দর্শন-জলে ভিজাইয়া দাও, তবে সে বীজ কি অঙ্কুরিত না হইয়া থাকিতে পারে?

উ। জাহানারা; তোমায় না পাইলে আমি কিছুতেই সুখী হইব না। তোমার রূপ বুকে লইয়া মরিবার জন্যই আমার সৃষ্টি হইয়াছে,—ইহাই বুঝি আমার মনুষ্য জন্মের হেতুভূত কারণ। তুমি সাধনায় উন্নত হইয়া থাকিবে, কিন্তু তোমার অনুগত—আকাঙ্ক্ষিত উদয়েশ্বরের প্রতি করুণ-নয়নে চাহিয়া দেখ, তাহার সমস্ত বৃত্তি তোমারই অভিমুখী,—তোমার জন্য আমি আশা-ভরসা সকলই পরিত্যাগ করিয়াছি। আমাকে কাঁদাইও না,—আমাকে ঠেলিও না;—দয়া কর, জাহানারা।

উদয়েশ্বরের চক্ষু দিয়া সংক্ষুব্ধ ফণিনীর নিশ্বাসের ন্যায় বিষের আগুন ঝলসিয়া যাইতেছিল। সফিনা সে চক্ষু দেখিয়া ভয় পাইল,—জাহানারার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—উদয়েশ্বরের প্রাণে যেন কোন্ অজানা শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, যথার্থই উদয়েশ্বর তোমার জন্য পাগল।”

জাহানারা ঔদাস্যের পরিশুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল,—“পাগল! পাগল এখন। কিন্তু আমাকে পাগল করিয়া কাঁদাইয়া মারিয়াছে,—উহারই জন্য পাপে মজিয়াছিলাম, কিন্তু আমার আকুল-আহ্বানে ফিরিয়াও চাহে নাই,—চাহিলে এত দীর্ঘ জন্ম কষ্ট পাইয়া ঘুরিতে হইত না।”

উদয়েশ্বর বলিল,—“তুমি যাহা বলিতেছ, তাহার একটি কথাও আমি বুঝিতে পারিতেছি না। জন্ম-জন্মান্তর' বলিয়া গর্জ্জিয়া মরিতেছ,—ঐ মিথ্যা কথাগুলা তুমি কাহার নিকট শুনিয়াছ,—সব মিথ্যা, সব জুয়াচুরি!”

ক্রুদ্ধা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া জাহানারা বলিল,—“তোমার নিকট মিথ্যা হইবে বৈ কি! যে বিশ্বাসঘাতক,—হে নারী হত্যা-কারক,—যে অধর্ম্মী, অবিবেকী তাহার নিকট জন্মান্তর মিথ্যা, পাপপুণ্য মিথ্যা, কর্ম্মফল মিথ্যা, স্বর্গ নরক মিথ্যা,—কিন্তু মিথ্যা কিছু নয় উদয়েশ্বর! জানিতে পারা যায় না, বুঝিতে পারা যায় না, তাই মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান হয়। ভূস্তরে সোণা আছে, না জানিতে পারিলে, সে মাটী, মাটী ভিন্ন আর কি? কিন্তু খনি-বিদ্যা-বিশারদ জানিতে পারেন, কোথায় কি রত্ন নিহিত আছে।”

উ। কে তোমাকে এই সকল অদ্ভুত প্রহেলিকার কাহিনী শুনাইয়া দিল জাহানারা?

জা। শুনাইয়া দিবে কেন, দেখাইয়া দিয়াছেন।

উ। তবে সে কোন যাদুকর। যাদু মন্ত্র প্রভাবে ঐরূপ বিভীষিকা দেখাইয়া থাকিবে।

জা। যাদু মন্ত্র মান? যদি মন্ত্রের প্রভাব স্বীকার কর, যদি শক্তির তত্ত্ব মান্য কর—তবে এ সকলই বা অস্বীকার কর কোন্ হিসাবে?

উ। ভাল, একবার স্পষ্ট করিয়া বল দেখি, সেই যাদুকর তোমাকে কি ভেল্কা দেখাইয়াছে?

জা। জন্ম জন্মান্তর হইতে তোমায় আমায় যে সম্বন্ধ, তাহাই দেখাইয়াছে।

উ। কি প্রকারে?

জা। মহাকাশ জগতে ব্যাপ্ত,—কিন্তু সেই মহাকাশের তলে এই গৃহখানি বাঁধিয়া ইহার মধ্যের আকাশকে গৃহাকাশ বলা যায়, আবার গৃহের মধ্যে ঐ ঘট রহিয়াছে—ঘটের মধ্যস্থ আকাশকে ঘটাকাশ বলা যায়,—ঘটাকাশ, গৃহাকাশ, মহাকাশ,—জড়ের বাধনে পৃথক, কিন্তু জড় অপসরণ কর,—ঘটের ব্যবধান, গৃহের ব্যবধান সরাইয়া লও—সব আকাশ এক হইয়া যাইবে। জন্মজন্মের তুমি আমি, জন্মজন্মের জড়ের আবরণের পৃথক,—জড়ের আবরণ কোন প্রকারে সরাইতে পারিলে, শত সহস্র জন্মের ব্যবধান অপসারিত হয়,—সকল জন্মের সংবাদ এক জন্মেই পাওয়া যায়। * যিনি আমাকে তাহা দেখাইয়াছেন, তিনি যোগী,—যোগের দ্বারাই সে কার্য্য সমাধা করিয়াছেন।

* জড় হইতে আত্মাকে ইহ জীবনেই পৃথক করিতে পারা যায়। এক যোগের দ্বারা, অপর মেস্‌মেরিজম ও হিপ্‌নটিজম নামক পাশ্চাত্য বিদ্যাদ্বারা। তখন আত্মা সমস্ত দৃশ্য দর্শনে সক্ষম হয়েন। যোগের দ্বারা যাহা হয়, তাহা উন্নত, আর মেস্‌মেরিজম প্রভৃতি দ্বারা যাহা হয় তাহা অবনত। কেমন করিয়া তাহা করিতে হয়, তাহা মৎ প্রণীত "জন্মান্তর রহস্য" ও "যোগ-সাধন-রহস্য" নামক পুস্তকে লিখিত হইয়াছে।

উ। ভাল, যাদুকর না হয় যোগীই হইলেন,—তুমি কি দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ,—আমাকে বলিতে কোন আপত্তি আছে কি ?

জা। কিছুই না।

উ। সকিনা এখানে উপস্থিত আছে বলিয়া কোন আপত্তি আছে কি ?

জা। সকিনা আমার প্রাণতুল্য সহচরী—সকিনা আমার যোগ-সাধনের সমসাধিকা,—সকিনার নিকট আমার কোন বিষয়ই গোপন নাই। বিশেষতঃ আমাদের গুরুদেব যখন এই তথ্যের আবিষ্কার করেন, তখন তাঁহার অনেকগুলি শিষ্য ও শিষ্যা সেখানে উপস্থিত ছিল। সকিনা তাহাদিগের মধ্যে একজন। সকিনা সবই শুনিয়াছে।

উ। তবে বল, সেই কাহিনী কি ?

জা। এখনও কাহিনী বলিয়া উপহাস করিতেছ ?

উ। যাদুবিদ্যায় আমার কোনকালেই আস্থা নাই।

জা। যোগ কি যাদুবিদ্যা ?

উ। যোগ ও যাদু যেন যমজ ভ্রাতা !

জা। তবে যাহা মিথ্যা, যাহা কাল্পনিক, যাহা যাদুকরের ভেল্কী—সে কাহিনী শুনিয়া তুমি কি করিবে ?

উ। তোমার মুখে সে কাহিনী শুনিয়াও তৃপ্ত হইব,—আর কি প্রকারে তোমাকে ভীত-চকিত করিয়া আমার বুকছাড়া করিবার পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারিব।

জা। উদয়েশ্বর, আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি আমার পাছে পাছে ফেরা সরল সহজ সে উদয়েশ্বর আর নাই,—কোন্ এক প্রবল শক্তিতে দৃঢ় ও অধিষ্ঠিত হইয়াছে। যাহা হোক্, শোন,—

উ। হাঁ, বল।

জা। তুমি কি বিশ্বাস কর যে, মানুষ মানুষকে যে ভালবাসে, তাহা জন্মজন্মান্তরের স্মৃতি?

উ। না।

জা। কেন?

উ। জন্মান্তর মানিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।

জা। তুমি জান কি, কোন পুরুষ হয়ত বিম্বাধরী তুল্য পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া, বিগতযৌবনা প্রেতিনীর নিকট পোষমানা প্রাণীর মত পড়িয়া থাকে,—কেন থাকে, বল দেখি?

উ। বোধ হয়, ঝোঁক!

জা। এই ঝোঁক কার?

উ। মনের।

জা। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইলেই তাহা মনের হয়, হউক মনের। কিন্তু তোমার হয় না, তার এ ঝোঁক হয় কেন, বল দেখি? আমাকে শত শত লোকে দেখিতেছে, তোমার মত আমার উপরে এ আকুল ঝোঁক কাহারও হইয়াছে কি? এই ঝোঁক জন্মজন্মান্তরের স্মৃতি। কত যুগ-যুগান্তর হইতে কত স্ত্রীপুরুষের আত্মা ভালবাসার আকর্ষণে পরস্পর আকর্ষিত হইয়া এমন মিলিয়া রহিয়াছে যে, এক অন্তর্বিচ্ছিন্ন গোলকের দুইটি তুল্যার্দ্ধের ন্যায় না মিশিয়া তাহারা থাকিতে পারে না। কিন্তু সকল জন্মেই যে, সকলে মিলিতে পায়, তাও নয়। কে কোথায় পড়ে, তাহার কি ঠিকানা আছে! কিন্তু না মিলিতে পাইলে, অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কোন জন্মে তাহাদের দেখা শুনা হইলেই মুহূর্ত্তমধ্যে সেই যুগান্তরাগত পুরাতন প্রীতি তাহাদিগকে যুড়িয়া এক করিয়া দেয়। বিবাহ তাই বিধাতার নির্ব্বন্ধ;—কিন্তু সকল আকর্ষণের ফল বিবাহ নহে,—বীজ

যেমন বৃক্ষও তদ্রূপ। যেমন আকর্ষণ,—যেমন প্রীতি, তদ্রূপ মিলন। তোমার আমার মিলনে তাই ভয়।

উ। ও সকল কথা ছাড়িয়া দাও। জানি আমি, তুমি বুদ্ধিমতী ও পণ্ডিতা,—অনেক গোছান কথা মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছ, পরিপাটীরূপে বলিতেও পার। এখন যে কাহিনী বলিতেছিলে, তাই বল, শোনা যাক্।

জা। বোধ হইতেছে, তুমি বিশ্বাস করিবে না। হয়ত গত জন্মের পুরাতত্ত্ব বিশ্বাস করিবার শক্তিও তোমার নাই। যাই হোক্, বারে বারে যখন শুধাইতেছ—তখন বলি শোন,—

কত দীর্ঘ জন্ম আগে তোমায় আমায় প্রীতি জন্মে। সে প্রীতি প্রাণে জাগান ছিল,—সংস্কাররূপে পরিণত হইয়াছিল; হঠাৎ একজন্ম উভয়ের বাল্যকালে সন্দর্শন ঘটে। তখন তোমার বয়স দশ এগার বৎসর, আর আমার বয়স সাত আট বৎসর। সে জন্মে আমি আমার মাতৃ-ক্রোড়ে মাতুলালয়ে প্রতিপালিতা হইতাম,—তুমিও সেখানে সর্ব্বদাই আসিতে। সেই বাল্যকালে তোমায় দেখিলেই আমি আকুলিত হইয়া স্থির নয়নে তোমার দিকে চাহিয়া থাকিতাম,—তুমিও প্রীতির আকর্ষণে আমার দিকে আকর্ষিত হইতে,—বাল্য-সখিত্ব উভয়ের মধ্যে ছিল। তারপর কৈশোর আসিল,—অনুরাগও বর্দ্ধিত হইল। কিন্তু তোমায় আমায় বিবাহ হইল না,—তেমন ভাব ছিল না; আমারও বিবাহ হইল,—তুমি স্ত্রী পাইলে, আমিও স্বামী পাইলাম,—কিন্তু জন্মান্তরের স্মৃতির আকর্ষণ, প্রীতির টানে পড়িয়া উভয়ে উভয়ের বিরহে ব্যাকুল হইলাম। মুহূর্ত্তে দেখা পাইলে উভয়ে স্বর্গ হাতে পাইতাম,—উভয়ের দর্শনে উভয়ের যে সুখ, যে আনন্দ ছিল,—জগতে তেমন সুখ, তেমন আনন্দ বুঝি আর কিছুতেই ছিল না। ক্রমে যৌবন আসিল,—যৌবনের ইন্দ্রিয়-প্রাবল্যে সেই আকর্ষণ অসহ্য হইল,—তোমায় আমায়

অবৈধ মিলন ঘটিল। সে মিলনে কত সুখ—কত আনন্দ ছিল, তাহা তুমিও জানিতে, আমিও জানিতাম। আকাশে চাঁদ উঠিলে তোমার মুখ মনে পড়িত, মলয় সঞ্চারণে তোমারই স্পর্শ অনুভূত হইত, কোকিল ডাকিলে তোমারই কণ্ঠ স্মরণ হইত। সর্ব্বদা দেখা পাইবার সম্ভাবনা ছিল না,—বিভিন্ন গ্রামে বাড়ী। যখন বড় আকুল হইতাম, তোমায় পত্র লিখিতাম,—কত কথা, কত কান্না, কত দুঃখ যে, সে পত্রে নিহিত করিতাম, তাহা জানাইবার কথা নহে। সব পত্র তোমার হাতেও পঁহুছাইত না, কোনখানা বা তোমাকে পাঠাইয়া দিতাম, কোন খানা বা লিখিয়া পড়িয়া আবার ছিঁড়িয়া ফেলিতাম। তুমিও আমাকে পত্র লিখিতে,—সে পত্র আমি ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারিতাম না,—পাঠ করিয়া তাড়া বাঁধিয়া বাক্সে তুলিয়া রাখিতাম। বড় মন খারাপ হইলে, সেই পঠিত পত্র আবার বাহির করিয়া লইয়া পাঠ করিতাম। আবার তুলিয়া রাখিতাম। এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া গেল,—কিন্তু পাপ গোপন থাকিবার নহে, প্রকাশ হইয়া পড়িল। আমার আত্মীয় স্বজন আমাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দিলেন।

আমার সে জন্মের স্বামী আমার বাপের বাড়ী একবার আসিয়াছিলেন,—কোন্ একজন দুষ্ট লোক কথাটা তাঁহার কাণে তুলিয়া দিয়াছিল,—তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছিলেন কি না, জানি না। কিন্তু তাহাতেই তাঁর প্রাণে ঘুন ধরিয়াছিল,—তিনি আমাকে যেন স্নেহ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না,—না দেখিলেও আমার কোন ক্ষতি ছিল না,—আমি তোমারই ধ্যানে মগ্ন থাকিতাম। কিন্তু এক দিন আমার বাক্স খুলিতে স্বামী তোমার হাতের লেখা ইষ্টকবচের ন্যায় সংরক্ষিত তোমার প্রেমপূর্ণ লিপিগুলি দেখিতে পাইলেন।

তখন তাড়না, গালাগালি, নির্য্যাতন প্রভৃতি চলিতে লাগিল,—এমন

কি আমি ব্যভিচারিণী বলিয়া গৃহ প্রবেশও নিষিদ্ধ হইল,—একটা অব্যবহার্য্য গৃহে একাকী রাত্রে পড়িয়া থাকিতাম!

এ যাতনাতেও সুখী হইতাম। মনে ভাবিতাম, এই জনশূন্য গৃহে প্রাণ ভরিয়া তোমায় ভাবিতে পাইব,—কিন্তু আহারাভাবে বড় কষ্ট পাইতে লাগিলাম। কোন দিন কদন্ন চারিটি দিত, কোন দিনও না। তখন মাতাকে পত্র লিখিলাম,—তিনি পত্রের উত্তর দিলেন না। স্বামীর পত্রে তিনি সমস্ত জানিতে পারিয়া হয়ত ভাবিলেন, এ সময়ে লইয়া আসিলে জন্মের মত স্বামীর ত্যজ্যা হইবে। কোন দিকে কূল না দেখিয়া তোমাকে পত্র লিখিলাম। প্রথমে লিখি নাই, তাহার কারণ এই যে, তুমি আমার দুঃখ—আমার নির্য্যাতন শুনিয়া কষ্ট পাইবে। কিন্তু যখন কেহই আশ্রয় দিল না,—কেহই আমার দুঃখের দুঃখী হইল না,—যখন যন্ত্রণা অসহ্য হইল, তখন তোমাকে পত্র লিখিলাম,—লিখিলাম, "আমায় লইয়া যাইবে।" পর পর চারি পাঁচ খানা পত্র পাঠাইলাম,—যেখানে থাকিয়া যেমন ভাবে লইয়া যাইবে, তাহাও লিখিলাম—আমি প্রতিদিন পত্র লিখিতাম,—আর আশা করিতাম, আজি রাত্রি সে লিখিত স্থানে আসিয়া আমাকে দেখা দিবে,—আমি কষ্ট পাইতেছি—আমাকে লইতে ডাকিতেছে—সে কি না আসিয়া থাকিতে পারে!—সেই মুগ্ধ লুব্ধ অনর্থক আশ্বাসে—অন্ধ বিশ্বাসে, উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে, ভগ্ন নীড় বিহঙ্গীর মত দ্বারে দাঁড়াইয়া তোমার অপেক্ষা করিতাম। বসন ছিন্ন মলিন, দেহ শীর্ণ বিকল, পবন-চালিত রুক্ষ-লুলিত কুন্তল—তথাপি ভালবাসার সুরভি কুঙ্কুমরঞ্জিত হৃদয় লইয়া তোমার পথ পানে চাহিয়া মনে মনে গাহিতাম—"আমি সোহাগ সলিলে দুলিতা নলিনী, আসিবে সোহাগে—লইতে বুকে।" কিন্তু তুমি আসিলে না। তখনও ভাবিতাম সে আমার হয়ত বাড়ী নাই,—হয়ত আমার অকুশল-লিপি

পায় নাই,—কিন্তু ভ্রম ভাঙ্গিল, সাধক সংবাদ পাইলাম,—তুমি বাড়ী আছ, আমার পত্রও পাইয়াছ—কিন্তু আর একখানা মুখ বুকে করিয়া সুখে দিন কাটাইতেছ। সমাজের ভয়ে—স্বার্থ বিনাশের ভয়ে আমাকে—আমার প্রাণ জড়ান ভালবাসাকে উপেক্ষা করিয়াছ। জগৎ শূন্য দেখিলাম,—অত্যাচার অসহ্য বোধ হইল,—তখন অহিফেন-বিষ গলাধঃকরণ করিয়া জড়দেহ বলি দিলাম।

হায়! দেহের শেষ হইল,—জ্বালার অবসান হইল। তোমার জন্য বিদেহী অবস্থাতেও কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিতে লাগিলাম। তোমার অনুসন্ধান করিলাম, জানিতে পারিলাম, তুমি আমার ধ্যান ভোল নাই—তবে স্ত্রীর সহিত মিলিয়া দাম্পত্যধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছ। পিপাসা আমার রূপে,—সহচারিত্ব স্ত্রীর সহিত। আমার আকুল পিপাসায় আরও দুই একবার দুই একটি প্রীতিঝরা ফুল বুকে তুলিয়াছ,—আবার পদদলিত করিয়াছ।

আমি অপমানের—প্রত্যাখ্যানের চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু পারি নাই। তোমার স্ত্রীর পুণ্যশক্তি প্রখরা,—সেই তোমার সহধর্ম্মিণী এবারে মালতী। মালতী তোমাকে জন্মে জন্মে ধর্ম্মের অঞ্চলে ঢাকিয়া লইয়া ফিরিতেছে। তুমি বহুবল্লভ,—বহু আত্মা তোমার অনিষ্ট করিবার জন্য ফিরিয়া থাকে,—তুমি অনেকের অনিষ্ট করিয়াছ,—জগতে যেমন দান, তেমন প্রাপ্তি।

উদয়েশ্বর হৃদয়ের কোন অতীতের লুকান কাহিনী জাগিয়া বসিতে-ছিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎ ছুটিয়া ছুটিয়া খেলিতেছিল। অতীতের কাহিনীর কাছে ভবিষ্যতের যন্ত্রণাময় জীবন আসিয়া যোট পাকাইয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে আকুল উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছিল।

জাহানারার কথা শেষ হইল, জলমগ্ন ব্যক্তির ন্যায় হাঁপাইতে

হাঁপাইতে উদয়েশ্বর বলিল,—“যে গল্পটা সাজাইয়াছে, সে ঔপন্যাসিক বটে। যদি তুমি উহাতে বিশ্বাস করিয়া থাক, তবে জাহানারা বুঝিয়া দেখ, তোমাতে আমাতে জন্ম-জন্মান্তরের ভালবাসার সম্বন্ধ রহিয়াছে,—আমাকে প্রত্যাখ্যান করিও না। আমার হও।”

জা। আবার! আবার সেইরূপ জ্বালাইবে।

উ। এবার প্রতিজ্ঞা করিতেছি,—যত দিন এ দেহে জীবন থাকিবে, তত দিন আমি তোমার।

জা। তারপর?

উ। তারপর আবার কি?

জা। মরণের পর পারে?

উ। সেখানে কি আছে,—কিছু নাই। দেহের সঙ্গে সকলেরই বিনাশ।

জা। তা নয় উদয়েশ্বর,—পরকাল আছে, আত্মা আছে,—পাপ পুণ্যের ফলাফল আছে।

উ। যদি থাকে ভালই।

জা। আমায় সঙ্গে নেবে? আমার হবে?

উ। না।

জা। কেন?

উ। যদি থাকে,—আমার সঙ্গে গেলে কষ্ট পাইবে।

জাহানারা দেখিল, কথাটা বলিতে উদয়েশ্বরের মরমের বেদনা মুখে যেন ফুটিয়া পড়িল, বলিল,—“কেন, তোমার সঙ্গে গেলে কষ্ট পাইব কেন?”

উ। যদি পরকাল থাকে, সেখানে আমার সুবিধা হইবে না। আমি পরকাল মানি না—ধর্ম্ম মানি না।

জা। তার উপায় আছে।

উ। কি?

জা। মালতী!

উ। মালতী কি?

জা। তুমি আজ' যাও—আগামী পূর্ণিমার দিন আসিও, সমস্ত বিষয় ঠিক হইবে।

উ। আর পারি না জাহানারা,—তোমার আকাঙ্ক্ষার আগুনে দগ্ধ হইতেছি। আজ' যা হয়, একটা করিয়া যাব।

জা। উদয়েশ্বর, ব্যভিচারিণী আমি, নরকের আগুনে অনেক পুড়িয়াছি,—তোমার সঙ্গে মিশিয়া আর পুড়িতে অভিলাষ নাই। তুমিও নারকী—আমিও পাপী। আর না,—যোগাভ্যাস করিতেছি—জন্ম জন্ম সাধনা করিয়া সংস্কারের বীজ দগ্ধ করিয়া যদি ভক্তিপথ পাই,—আমায় আর মজাইও না। আমি এখন নূতন ব্রতী—ব্রত ভঙ্গ করিও না।

উ। তুমি নূতন ব্রতী কি,—তুমি যোগবলে অনেক অদ্ভুত ও অলৌকিক কার্য্য সাধন করিতে শিখিয়াছ।

জা। কার্য্য করা এক, আত্মার উন্নতি করা আর। যে সকল অদ্ভুত কার্য্য আমাদ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে,—সে সকল ঐশ্বর্য্য বা বিভূতি। বিভূতি লাভ সহজ—অভ্যাসে সকলেই লাভ করিতে পারে। কিন্তু সংস্কারের বিনাশ করা আর ভক্তিপথের পথিক হওয়া বহু জন্মের সাধনার ফল।

উ। যাক্, আমি ওসকল কথার কিছুই শুনিতে চাহি না। আর অপেক্ষা করিতে পারিব না,—আজি যা হয় একটা শেষ করিয়া যাইব।

জা। তুমি কি শেষ করিয়া যাইবে উদয়েশ্বর? আজি যাও,—

আমাকে বিবেচনা করিতে সময় দাও,—আগামী পূর্ণিমার দিন এই সময় আসিও।

উদয়েশ্বর জাহানারার সে কথায় সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। রূপের অনল তাহাকে দগ্ধ করিয়া তুলিতেছিল,—সে আত্মহারা হইল। মনে ভাবিল, আমার নিকট দানবীশক্তির অমিত বল সঞ্চিত আছে,—ক্ষুদ্র রমণী জাহানারা কোন্ ছার! আমি তাহাকে বুকে করিয়া লইয়া যাই,—তারপর সে নিশ্চয়ই আমার হইবে।

উদয়েশ্বর উঠিয়া দাঁড়াইল। মনে মনে পিশাচকে স্মরণ করিল,—তারপরে জাহানারাকে ধৃত করিতে ধাবমান হইল,—কিন্তু জাহানারার নিকটে গিয়া তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে সক্ষম হইল না। উদয়েশ্বরের জ্ঞান হইল,—ভীমবেগে আগুনের রাশি প্রজ্বলিত হইতেছে,—তাহার উত্তাপে উদয়েশ্বরের মর্ম্মস্থল পর্যান্ত জ্বলিয়া উঠিল। সে পিছাইয়া পড়িল। জাহানারা হাসিয়া বলিল,—"আমাকে স্পর্শ করিতে আসিতেছিলে উদয়েশ্বর? অন্য হইলে এতক্ষণ ভস্ম হইয়া যাইত—প্রাণের টানে এখনও তোমাকে ভাবি বলিয়া জীবন্ত আছ। আজি যাও,—পূর্ণিমার দিন আসিও।"

বিনা বাক্য ব্যয়ে উদয়েশ্বর গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তখনও তাহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছিল। উদয়েশ্বর ক্ষোভে, লজ্জায় এতটুকু হইয়া গিয়াছিল। সে মনে মনে ভাবিতেছিল,—পৈশাচশক্তিতে মুল্লুক জয় করিলাম, অস্ত্রধারী পুরুষগণকে মুহূর্ত্তে জড় করিলাম,—রোমাণী, শীতলরায় প্রভৃতিকে স্থাণুর ন্যায় অচল করিলাম, আর ক্ষুদ্র জাহানারার নিকটস্থ হইতে পারিলাম না। হায়, পিশাচশক্তি,—তুমি দেবশক্তির—যোগশক্তির নিকটে এত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র? পিশাচ। পিশাচ! তোমার শক্তি তুমি ফিরাইয়া লও,—আমায় অব্যাহতি

দাও,—আমি মালতীর নিকট বসিয়া ধর্ম্মাচরণ করি। কিন্তু কেহ উত্তর দিল না। জাহানারার গৃহ হইতে বাতাসে মিশিয়া মধুর স্বরের সঙ্গে গানের স্রোত ভাসিয়া আসিতেছিল। উদয়েশ্বর শুনিল, কোন্ অতীতের মরণ-সঙ্গীত সমীরণে মিশিয়া তাহার কাণের ভিতরদিয়া মরমে প্রবেশ করিতেছে। গীত হইতেছিল,—

আমি সোহাগ-সলিলে দুলিত নলিনী
আসিবে সোহাগে লইতে বুকে,
আমি ডেকেছি ভাসিত প্রণয়-সলিলে
মরালে যাপিত জীবন সুখে।
লুলিত কুন্তলে মুছায়ে চরণ
লইত মরণে তাহারি শরণ
জীবনে মরণে হৃদয় রমণ
যাপিব জীবন বিনাশি দুঃখে।
পুষ্পিত পরাণ সুরভি মাখা,
নয়নের কোণে সুধার দেখা
সারাটি পরাণে সে ছবি আঁকা
মুছিবে না তাহা মরণ-মুখে।

যেন কোন্ বিদেহী আত্মা, তাহার বহুদিনের কামনা-বাসনার সঙ্গীত গাহিয়া উদয়েশ্বরকে উত্তেজিত করিতেছিল। উদয়েশ্বর সে গান শুনিয়া বড় বিষণ্ণ হইয়া পড়িতেছিল। তাহার সম্মুখে যেন মরণ-দুন্দুভি বাজিয়া বাজিয়া নরকের পথ দেখাইয়া দিতেছিল।

উদয়েশ্বরের সর্ব্বাঙ্গ দিয়া বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরিতেছিল। সে অশ্ব খুঁজিয়া লইয়া তাহাতে আরোহণ করিল। দানবী-শক্তি সম্পন্ন অশ্ব তীর বেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল। উদয়েশ্বর, যে উৎসাহ, যে উদ্যম

লইয়া সাতকানিয়ার বাগানে আসিয়াছিল,—তাহা বিসর্জ্জন দিয়া আশাভগ্ন ভয়-দীর্ণ বুক লইয়া গৌড়নগরে চলিয়া গেল।

—— ——

একাদশ পরিচ্ছেদ

উদয়েশ্বর রাত্রির অবসান কালে গৌড়নগরে নিজালয়ে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহার সমস্ত মুখমণ্ডলে ম্লান পাণ্ডুর চিন্তার রেখা অঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার প্রাণের অশান্তির আগুন চক্ষু দিয়া বহির্গত হইতেছিল।

উদয়েশ্বর কাহারও সহিত কথা কহিল না,—কিন্তু আহারও করিতে পারিল না। সে এক নিভৃত কক্ষে শয়ন করিয়া চিন্তার বৃশ্চিক দংশনে দহ্যমান হইতে লাগিল। অশান্তির নিরয়-বহ্নি শতবাহু সৃজন করিয়া তাহার সমস্ত বৃত্তিকে বিধ্বংস করিতে আরম্ভ করিল।

উদয়েশ্বর শয্যায় গড়াগড়ি দিতে দিতে প্রাণের অন্তস্তলস্থ অগ্নি নিশ্বা-সের সহিত ডাকিয়া ডাকিয়া বলিতে লাগিল,—পিশাচ! আর অশান্তির আগুনে পুড়িতে পারি না। আমায় ধন দিয়াছ, ক্ষমতা দিয়াছ—কিন্তু সে অকিঞ্চিৎকর। জাহানারার ক্ষুদ্র দৈবশক্তির নিকট আমার প্রখরা পিশাচ-শক্তি কিছুই নহে। তবে এ আত্মদানের প্রয়োজন কি ছিল,—নরক বুকে করিবার আবশ্যকতা কি হইয়াছিল? লহ পিশাচ! তোমার সমস্ত ধন সম্পত্তি—সমস্ত ক্ষমতা ফিরাইয়া লহ,—আমি যাহা ছিলাম, তাহাই হই,—আমার চেয়ে ভিখারীরাও সুখী। তাহারা স্বাধীন প্রাণে সারা দিবস ভিক্ষা করিয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য লইয়া শান্তিময় প্রাণে দিবসের অবসানকালে গৃহে ফিরিয়া আসে। তারপরে সুখ শান্তিতে ধর্ম্মের চিন্তায় রজনী যাপন করিয়া থাকে। আর হতভাগ্য

আমি ?—আমি দেবতার নাম, ধর্ম্মের নাম মুখেও আনিতে পারি না,—শান্তি আমার নাই। এস পিশাচ! তোমার শক্তি তুমি ফিরাইয়া লও।

সহসা সমস্ত গৃহে এক সবুজ বর্ণের প্রোজ্জ্বল আলোক জ্বলিয়া উঠিল। সিক্ত মৃত গন্ধে সমস্ত গৃহ পূর্ণ হইয়া গেল! গৃহের প্রতি ভিত্তিতে একরূপ করাল কঙ্কালিত হাসি যেন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। উদয়েশ্বর চমকিয়া, লাফ দিয়া শয্যার উপরে উঠিয়া বসিল,—বিস্ময়-চকিত রক্ত নয়নে চাহিয়া দেখিল,—সম্মুখে কৃতান্তোপম মূর্ত্তিতে পিশাচ দণ্ডায়মান। শত অশান্তির নরক-অগ্নিতে তাহার চক্ষু-গোলক ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল।

সভয়ে চীৎকার করিয়া উদয়েশ্বর বলিল,—"পিশাচ! পিশাচ! তুমি কত দিন আসিয়াছ—তোমায় কত দিন দেখিয়াছি,—এমন অশান্ত মূর্ত্তি—এমন করাল সংহার মূর্ত্তি আরত কখনও দেখি নাই। আমায় রক্ষা কর,—আমায় পরিত্যাগ কর।"

মরণ-দুন্দুভির অমঙ্গল বাদ্যের ন্যায় গম্ভীর স্বরে পিশাচ বলিল,—"মানব! লোভে পড়িয়া আমার দাস হইয়াছ। আপন শক্তি পিশাচ শক্তিতে পরিণত করিয়াছ,—এখন কি বলিয়া ফিরিতে চাহ? আগে ভাব নাই,—পৈশাচিক শক্তিতে সুখ নাই। আর উদ্ধার পাবে না,—সময় হইয়া আসিয়াছে, এই দেখ আমার হাতে পিশাচশক্তির নরক-শৃঙ্খল। শাস্ত্রকারেরা ইহাকে হেয় বাসনার বন্ধনও বলিয়া থাকে,—আর দিন নাই;—আগামী আশ্বিনের প্রেতপক্ষে এই শৃঙ্খল পরাইয়া তোমাকে নরকের দেশে লইয়া যাইব।"

উদয়েশ্বর প্রাণের মধ্যে শত সর্পের দংশন জ্বালা অনুভব করিতে লাগিল। কাতরে,—বিনয়ে বলিল,—"পিশাচ! তোমার কি ক্ষমা

নাই? তোমার কি দয়া মায়া নাই? আগামী আশ্বিনের প্রেতপক্ষে,—সে আর ক'দিন! কি সর্ব্বনাশ! হায়! আমার উপায় কি?"

খল খল হাসিয়া পিশাচ বলিল,—"পিশাচের দয়া মায়া! মানুষকে নরকের পথে লইবার জন্যই আমরা জগতে ঘুরিয়া থাকি। আমরা নরকের সহচর। মানুষ বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন,—পশু হইতে, মানুষ তাই মানুষ। আমারই মানুষের সেই বিবেক বুদ্ধিকে বিনষ্ট করিয়া নরকের পথে—অশান্তির রথে তুলিয়া লই। মানুষ যখন ক্ষুদ্র পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান আরম্ভ করে, তখন তাহাদের বিবেক তাহাতে আঘাত করিতে থাকে,—নিষেধ করিতে থাকে,—আর আমরা তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মানুষকে প্রবোধ দিয়া বলি,—দোষ কি? এতে আর এমন পাপ কি? মানুষ যখন কথার ছলে—কাজের ছলে—লোককে প্রতারণা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার মঙ্গল বৃত্তি বিবেক বলিয়া থাকে—পাপে মজিও না, জাল জুয়াচুরিতে মহাপাতক! আমরা অমনি ডাকিয়া বলি, এতে আর এমন কি পাপ হয়,—জুয়াচোর নয় কে? গুরু বল, পুরোহিত বল, হাকিম বল, জমিদার বল—সকলেই জুয়াচোর। পরদার গমনাভিলাষী পুরুষের, স্বামীচরণ-পরিত্যাগাভিলাষিনী রমণীর বিবেক জলাঞ্জলির আমরাই প্রধান সহায় হইয়া থাকি।"

উদয়েশ্বর সংক্ষুব্ধ স্বরে বলিল,—আমার কি তবে কোন উপায়েই নাই? হায়! আমি কেন মরিতে পিশাচ সাধনা করিতে গিয়াছিলাম।"

মেঘ-মন্দ্র স্বরে পিশাচ বলিল,—"তুমি কি সাধ করিয়া সে পথে গিয়াছিলে? তোমার জন্ম-জন্মান্তরের আসক্তি তোমাকে সে পথে লইয়া গিয়াছিল। এই সৌরমণ্ডলে বা মর্ত্ত্যলোকে, পিতৃলোকে ও স্বর্গলোকে দুইয়ের সত্ত্বা বিদ্যমান,—এক পুরুষ, অপর প্রকৃতি। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অনাদি;—দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি বিকার এবং সুখ দুঃখাদি গুণ

সমুদয় প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভুত হইয়াছে। প্রকৃতির অপর মূর্ত্তি মায়া। মায়া জীবকে বাঁধিবার চেষ্টায় নিরতা,—এই যে সকল দৃশ্য দর্শন করিতেছ, স্পর্শ করিতেছ, আঘ্রাণ করিতেছ, পান করিতেছ—এক কথায় যাহা কিছু তোমার ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইতেছে,—সে সকলই প্রকৃতির বন্ধন মূর্ত্তি। কিন্তু একই যুবতী যেমন পিতার চক্ষে স্নেহের মূর্ত্তি, পতির চক্ষে বিলাসের মূর্ত্তি এবং শৃগালের চক্ষে উপাদেয় ভোজ্য মূর্ত্তি,—তেমনি এই জড়াত্মিকা প্রকৃতিও সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণশালী ব্যক্তির নিকট পৃথক পৃথক মূর্ত্তি। প্রকৃতির এই সমুদয় পদার্থ দিয়া বিধাতা রমণী মূর্ত্তি গঠন করিয়াছেন—পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, বিধাতা সৃষ্টি কার্য্যে পুরুষকে বাঁধিতে না পারিয়া রমণীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। রমণীতে প্রকৃতির বন্ধন শৃঙ্খল সুবিন্যস্ত—প্রকৃতি রসের আশ্রয়। পুরুষ কাম সম্পন্ন হইলে অভিলাষী হয়,—মূঢ় মানব! তুমি জন্ম জন্ম হইতে যেখানে রমণী দেখিয়াছ, সেই স্থানেই আকুল আকাঙ্খা লইয়া হৃদয় পাতিয়াছ,—তোমার আত্মা তাই বহু স্থানের আকর্ষণ-আগুনে—প্রকৃতির কঠোর শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়াছে। আর জাহানারা,—জাহানারা তোমার কালরূপিনী,—জাহানারার আসক্তি লইয়া মরিয়াছিলে,—সে আসক্তির বন্ধন কোথায় যাইবে?"

অশ্রুপূর্ণ লোচনে উদয়েশ্বর বলিল,—"মরণের পরেও কি আসক্তি, বাসনা, কর্ম্মফল সঙ্গে যায়?"

পি। যায়,—বাতাস যেমন ফুলের গন্ধ লইয়া চলিয়া যায়, আত্মাও তদ্রূপ দেহত্যাগ কালে ও গ্রহণ কালে সমস্ত ইন্দ্রিয় ও কর্ম্মফল আদির সূক্ষ্মাংশ লইয়া যায়।"

উ। জাহানারাকে কি পাইব না? কৈ তোমার শক্তিতে ত তাঁহার শক্তিকে পরাভূত করিতে পারিল না?

পি। তা পারিবে কেন? সে দৈবীশক্তি সম্পন্ন। শীতলরায়,

রোমাণী,—রাজসৈন্য—তারা পৈশাচিক বৃত্তি বিশিষ্ট—সেখানে পৈশাচিক বলশালী তুমি,—তোমার, জয়। কিন্তু দৈবীশক্তির নিকটে পৈশাচ শক্তি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র,—তুচ্ছাদপি তুচ্ছ। ইহলোকে দৈব ও অসুর এই দুই প্রকার ভূত সৃষ্টি হইয়াছে। দৈব লোকের কাজ পরোপকার, আত্ম চিন্তন, ত্যাগ, এবং ভক্তিতে ভগবানের আরাধনা। আর অসুর স্বভাব লোক সকল ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তির বিষয় অবগত নয়,—তাহাদিগের শৌচ নাই, আচার নাই, ও সত্য নাই। তাহারা জগৎকে অসত্য, স্বাভাবিক, ঈশ্বর শূন্য, স্ত্রীপুরুষ-সম্ভূত ও কামজনিত কহে। তাহারা ঐ প্রকার অজ্ঞানকে জ্ঞান মনে করিয়া, মলিন চিত্ত উগ্রকর্ম্মা ও অহঙ্কারী হইয়া জগতের অনিষ্ট করিবার জন্য সমুদ্ভূত হয়। দম্ভ, অভিমান, মদ, অশুচিব্রত ও দুষ্পূরণীয় কামনার বশবর্ত্তী হয়। তাহাদের ধনপিপাসা, মানপিপাসা যশোপিপাসার নিবৃত্তি নাই। আমরণ অপরিমেয় চিন্তাকে আশ্রয় করিয়া কামোপভোগকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করে। শত শত আশেপাশে বদ্ধ ও বাসনার আগুন বুকে করিয়া দিবারাত্রি ছুটাছুটি ও অন্যায় পূর্ব্বক অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করে।

তুমি ঐজন্য পিশাচ-সাধনা করিয়াছ,—পিশাচ সাধনা না করিলে কাহারই ঐ দুষ্পূরণীয় বাসনার পূরণ হয় না। তুমি মন্ত্র পাঠে সাধনা করিয়াছ—অনেকে কার্য্য দ্বারা, প্রবৃত্তি দ্বারা পিশাচভজনা করিতেছ। ফল একই,—এই ভীষণ শৃঙ্খল বন্ধন,—এই দীর্ঘ দীর্ঘ যুগ অনল-যন্ত্রণা।

উ। তুমি বলিতেছিলে, রমণীর আকর্ষণে জীবের বাসনা-বন্ধন; তবে কি রমণীর দিকে আসক্তির নয়ন ফিরাইতে নাই?

পি। মূঢ় মানব! আসক্তি সর্ব্বত্রই পরিত্যজ্য। তবে রমণী পুরুষকে সুখী করিবার—উন্নত করিবার, রস প্রদান করিবার একমাত্র

উপযোগিনী। ঘৃত বল, বর্ণ ও আয়ুঃ প্রদানকারী হইলেও তাহার অপব্যবহারে জীবন নষ্ট হয়। প্রকৃতি রূপিণী রমণীর সাধনাতেও তেমনি সংযত হওয়া চাই। রমণী শুষ্ককণ্ঠে জলিত আত্মার অমৃত ধারা. রমণী মরুভূখণ্ডের জলপাদপ,—রমণীর জন্যই পুরুষের বন্ধন, রমণীর জন্যই পুরুষের মুক্তি। রমণী পুরুষকে পতিরূপে বক্ষে ধারণ করতঃ রসদানে তৃপ্ত করিয়া পুনরায় প্রসব করে। কিন্তু রসাশ্রিত হওয়া চাই,—জড়ের দিকে গেলেই সর্ব্বনাশ।

উ। রস আর জড় কি?

পি। রস রমণীর সত্ত্বা, জড় রমণীর রূপ। একান্তে একটি রমণীর রসে মজিলেই উন্নতি—জন্ম জন্ম সেই-ই সহচারিণী, সেই-ই সহধর্ম্মিণী—সেই-ই জায়া,—সেই-ই মায়া। আর চোখের নেশায় রূপের বাঁধন,—মহা ভয়ঙ্কর,—নরকের কারণ। তাই মহাজনগণ রমণীকে নরকের দ্বার বলিয়াছেন।

উ। তুমি যদি এত জান,—তবে মানুষকে নরকের পথে লইয়া যাও কেন?

পি। যাহার যে শক্তি, সে, সেই কার্য্যই করিয়া থাকে। জলে পিপাসা নিবারণ হয়, আবার মানুষ তাতেই ডুবিয়া মরে। আগুনে সকল কার্য্য সুসিদ্ধ হয়,—আবার মানুষ আগুনে পুড়ে।

উ। দয়া কর,—আমায় ক্ষমা কর,—আমাকে ধর্ম্মপথে যাইতে দাও।

পি। অসাধ্য।

উ। তবে আমার কি গতি হবে?

পি। আমি বলিতে পারিব না,—তোমার পার্শ্বে, ঐ গৃহভিত্তিতে সোণার অক্ষরে কি লেখা আছে, পাঠ কর।

উদয়েশ্বর স্তব্ধ নেত্রে দেওয়াল-গাত্রে দৃষ্টিক্ষেপ করিল,—দেখিল তরল হৈমাক্ষরে জ্বলন্ত ভাষায় লেখা আছে———

আত্ম সম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমান মদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি। *
মাম প্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥

উদয়েশ্বর ক্ষিপ্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"পিশাচ! পিশাচ! আমায় রক্ষা কর। আমায় দয়া কর,—আমায় কৃপা কর।"

পিশাচ খল খল করিয়া হাসিতে হাসিতে অন্তর্দ্ধান হইল। উদয়েশ্বর আবার গৃহ-ভিত্তিতে দৃষ্টিক্ষেপ করিল,—কিছু মাত্র দেখিতে পাইল না,—গৃহ পূর্ব্ববৎ পার্থিব আলোকে উদ্ভাসিত। এবং বাহির হইতে সমীর গবাক্ষপথে ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে আগমন করিতেছিল।

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান বলিতেছেন —আপনা আপনি সম্মানিত অহঙ্কৃত ও ধন মান মদে প্রমত্ত হইয়া দম্ভ সহকারে অবিধিপূর্ব্বক নাম মাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও অসূয়া আশ্রয় করিয়া আপনার ও পরের দেহে আত্মায় দ্বেষ করে। আমি সেই সমস্ত দ্বেষপরবশ ক্রূর স্বভাব অশুভকারী নরাধমকে নিরন্তর সংসারে আসুর যোনিমধ্যে নিক্ষেপ করি। হে কৌন্তেয়! তাহারা অসুর যোনি প্রাপ্ত হইয়া আমাকে লাভ করিতে পারে না, সুতরাং অধমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

উদয়েশ্বর প্রচণ্ডবেগে শয্যার উপরে পড়িয়া গেল, এবং গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিল। বড় গুমটে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেলে যেমন ধরণী শীতল হয়, তেমনই এই ক্রন্দনের পর তাহার হৃদয়ের ভার যেন একটু লঘু হইল,—বুক ফাটা যাতনা যেন একটু সহনীয় হইয়া আসিল! তখন সে আপনার কৃত কর্ম্মের কথা ভাবিতে লাগিল। ভাবনার কুল নাই, কিনারা নাই,—তাহার উপায় কি,—কত দীর্ঘ দিন সে নরক-যন্ত্রণা সহ্য করিবে! হায় হায়! সে কি করিয়াছে!

উদয়েশ্বর ভাবিয়া ভাবিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িল। যেমন বন্যার জল ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে শেষে যখন নদীগর্ভ ছাপাইয়া কুলে উঠে, তখন তাহার বেগ প্রশমিত হয়, তেমনিই মানসিক উদ্বেগ বা যাতনা ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে যখন সমগ্র হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলে, তখন তাহার তীব্রতম যাতনাদায়ক অবস্থার অবসান হয়। কসিতে কসিতে বীণার তার ছিন্ন হইলে তাহাতে তীব্রস্বর দূরে থাক, আর কোন স্বরই বাজে না।

স্নেহশীলা জননীর মত নিদ্রা ধীরে ধীরে উদয়েশ্বরের চিন্তা-কুঞ্চিত ভ্রূমধ্য হইতে চিন্তার রেখা অপসারিত করিয়া দিল। উদয়েশ্বর নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পর দিবস যখন উদয়েশ্বরের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন অনেকখানি বেলা হইয়া পড়িয়াছিল। সমস্ত বাড়ীতে সূর্য্যকর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, এবং দাসদাসীগণ আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত ছিল।

একরাত্রির চিন্তায়—একরাত্রির ভাবনায়,—একরাত্রের অনলদহনে উদয়েশ্বর একেবারে যেন শুকাইয়া গিয়াছে। তাহার চক্ষুর্দ্দয় কোটরগত, জবাফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ। মস্তকের চুলরাশি ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত। তখনও উদয়েশ্বরের প্রাণ চমকিয়া চমকিয়া উঠিতেছিল,—জাগরণে সমস্ত প্রাণ যুড়িয়া আবার অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিল। উদয়েশ্বর বাটীর মধ্যে মালতীর নিকটে গমন করিল; কিন্তু হায়! তাহার শান্তি কোথাও নাই।

মালতী তখন স্নান করিয়া সাবিত্রী-উপাসনা করিতে বসিয়াছিল। মালতী তখন করযোড়ে সাবিত্রীদেবীর নিকটে স্বামীর মঙ্গল কামনা করিতেছিল,—সহসা সেখানে উদয়েশ্বর উপস্থিত হইয়া, দৈবকার্য্য নিরতা পত্নীকে দেখিয়া ভয় পাইয়া দ্রুতপদে ফিরিয়া যাইতেছিল, কিন্তু মালতী স্বামীকে দেখিতে পাইল,—সেও উঠিয়া বাহির হইয়া, দ্রুতগমনে ছুটিয়া গিয়া স্বামীর হাত চাপিয়া ধরিল। উদয়েশ্বর যন্ত্রণার স্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"ছাড় মালতী, শীঘ্র ছাড়,—তোমার হাত কি আগুন—ছাড় ম'লাম, ম'লাম—জ্বলে ম'লাম।"

ধাঁ করিয়া হস্ত পরিত্যাগ করিয়া, মালতী অতিমাত্র ব্যস্ত ও আশঙ্কিত হইয়া শুষ্ককণ্ঠে উদয়েশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"তোমার কি হ'য়েছে নাথ?" আমার হাত আগুন কেন? আমি সাবিত্রী

মাতার উপাসনা করিতেছিলাম,—হায় নাথ, তোমার উপরে পিশাচের দৃষ্টি পড়ে নাই ত?"

ঝটিকাচালিত বৃক্ষের ন্যায় কাঁপিয়া উঠিয়া গগনভেদী ভীষণ চীৎকার পূর্ব্বক উদয়েশ্বর বলিল,—"সেই মুখ—সেই মরণের মুখ—সেই চিতার আগুনে গড়া চোখ—পিশাচ, পিশাচ—রক্ষা কর মালতী!"

মালতী দেখিল, তাহার স্বামী থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। মালতী পাগলের ন্যায় হইয়া দাসীদিগকে ডাকিল। তাহারা আসিলে, মালতী বলিল,—"আমার দেবতা,—তোমাদের প্রভু, হঠাৎ পীড়িত হইয়াছেন,—সেবা কর চোখে মুখে জল দাও—বাতাস কর—বিছানা আনিয়া, তাহাতে বসাও।"

উদয়েশ্বর একটু প্রকৃতিস্থ হইল। বলিল—"না না, কিছুই করিতে হইবে না। আমার বায়ুরোগ হইয়াছে,—স্নায়ুর পীড়া হইতে এই রোগ জন্মে!"

মালতী আঁচলে চক্ষুর জল মুছিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল,—তোমার যে রোগই হোক্, একটা স্বস্ত্যয়ন করাইতে হইবে।"

দৃঢ় স্বরে উদয়েশ্বর বলিল,—"যদি স্বস্ত্যয়ন কর, সেই দিনই আমার মৃত্যু হইবে।"

মালতীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। বলিল,—"সে কি কথা প্রভু?"

উ। সেই সত্য কথা,—আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, আমার জন্য কোন কাজ করিও না।

মা। লক্ষণ আমার নিকট শুভ বলিয়া জ্ঞান হইতেছে না। হয়ত বা যে মাগীকে তুমি ভালবাস—সে কি গুণ করিয়াছে।

উ। যথার্থ বলিয়াছ মালতী,—সে-ই গুণ করিয়াছে। হায় হায়! সে-ই আমাকে খাইয়াছে। সে-ই আমার সোণার দেহ চুরমার

করিয়াছে। যে দিন তাহার প্রথমানুসন্ধানে গমন করি,—সেই দিন স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম, আমার অদৃষ্ট-তন্তু লইয়া সে আর তুমি টানা-টানি করিতেছ—বাকি আমার উৎপত্তি শক্তির হাতে,—সেই দিনই স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম,—জাহানারা আমার দেহ চূর্ণ বিচূর্ণ করিবে। উপদেশ পাইয়াছিলাম, পুরুষকার অবলম্বন করিলে, পারিবে না, আমি তা করি নাই,—তাই এই দুর্গতি।

মালতীর নীলপদ্মের ন্যায় নয়নদ্বয় বিস্ফারিত হইল, কাতর স্বরে বলিল,—"স্বামী, প্রভু—তুমি যে জন্মান্তর, কর্ম্মফল ও ভগবান মানিতে না? এখন কি সে সকলে বিশ্বাস করিতেছ?"

দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উদয়েশ্বর বলিল,—"দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে মালতী—আর অবিশ্বাসের সময় নাই। ঐ—ঐ—ঐ দেখ, আজন্মের নরক-শৃঙ্খল।"

মালতী স্বামীর অবস্থা দেখিয়া প্রাণ কাঁদান কথা শুনিয়া, কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"ওগো, কি হবে! তোমার অবস্থা এমন কেন হ'ল—দাসী তুই শীঘ্র এক জন হাকিম ডেকে আন।"

গম্ভীর স্বরে উদয়েশ্বর বলিল,—"হাকিম! হাকিম কেন? হাকিমের বাবারও সাধ্য নাই, আমার এ রোগ আরাম করে।"

মালতী বলিল,—তবে কি হবে? মা সাবিত্রী, মা দুর্গা, মা কালী,—তোমায় রক্ষা করুন।"

উদয়েশ্বর বক্র চাহনিতে মালতীর মুখের দিকে চাহিয়া দ্রুতপদে সেখান হইতে বাহির হইয়া গেল। মালতী বাধা দিতে যাইতেছিল, কিন্তু ততক্ষণ উদয়েশ্বর অনেক দূর চলিয়া গিয়াছিল।

স্বামীর অবস্থা দেখিয়া, মালতী একেবারে ভাঙ্গিয়া পাড়ল। তাহার

প্রাণতমের কি রোগ হইয়াছে,—তাহার হৃদয়-দেবতার উপরে কোন্ অমঙ্গলের অশুভ দৃষ্টি পড়িয়াছে,—সে তাহা বুঝিতে পারিল না। তাহার হৃদয়ে বড় যাতনা অনুভূত হইতে লাগিল। তখন সে পূজার আসনে গিয়া উপবেশন করিল। একান্তে—একমনে, সাবিত্রীদেবীকে ডাকিয়া বলিল,—"মা, তোমারই কৃপাতে স্বামীর চরণ দেখিতে পাইয়াছি,—তোমারই করুণায় হারাধনে পুনরায় প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু মা, সর্ব্ব দুঃখবিনাশিনী—সর্ব্বভয় হারিণী—মা! আমার স্বামীর এ কি হইল? তুমি ব্যাধিনাশিনী,—ভূতাপসারিণী—ত্রিতাপহারিণী—আমার স্বামীর সর্ব্বাপৎ বিনাশ কর।"

উদয়েশ্বর বহির্ব্বাটীতে গিয়া কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থাকিল। বসিয়া বসিয়া আত্মসংবরণের চেষ্টা করিল। তারপরে উঠিয়া নগর ভ্রমণে বাহির হইল, —মনের আশা নগরভ্রমণে মনের অবস্থার একটু পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

উদয়েশ্বর একাকী পদব্রজে নগরের রাজরাস্তায় চলিয়া যাইতেছিল। রাস্তার দুই পার্শ্বে অগণ্য বিপণী, অগণ্য প্রাসাদ, অগণ্য শোভা বিদ্যমান,—উদয়েশ্বর সে সকলে বড় একটা লক্ষ্য করিতেছিল না। আপনার বাঁধা ঘর—গুছান সামগ্রী একদিনে দগ্ধ হইয়া গেলে, সেই দগ্ধাবশেষ জিনিষগুলি দেখিতে যেমন কষ্ট—যেমন ঔদাস্য—যেমন চঞ্চলতা আইসে, উদয়েশ্বরের সারা পৃথিবীর উপরে তেমনই ভাব হইতেছিল। যে জড়ের রাজত্বে তাহার প্রবল আকর্ষণ—সেই জড় যেন এত দিনে তাহার নিকটে স্থখের বেদনা বলিয়া জ্ঞান হইতেছিল। মৃত্যু-শয্যা-শায়িত অম্ল রোগীর যেমন গুরুপাক আহার্য্যে আকর্ষণ আছে, কিন্তু উদরস্থ করিবার সাধ্য নাই—এবং তাহাই মৃত্যুর কারণ হইয়াছে ভাবিয়া যেমন তার উপরে মনের অবস্থা হয়, সমস্ত জড় রাজ্যের উপরেও উদয়েশ্বরের মনের অবস্থা তেমনই হইতেছিল।

রাস্তার পার্শ্বে একটি সুদৃশ্য সুরম্য ক্ষুদ্র বাড়ী। সেই বাড়ীর পার্শ্ব দিয়া উদয়েশ্বর আপনমনে চলিয়া যাইতেছিল,—সহসা একটি স্ত্রীলোক দরোজার মধ্য হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—"মহাশয়, একটু দাঁড়াইয়া আমার একটা কথা শুনুন।"

উদয়েশ্বর পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, একটি মুসলমান পরিচারিকা। বিস্ময় সহকারে উদয়েশ্বর বলিল,—আমাকে বলিতেছ ?"

অভিবাদন করিয়া দাসী বলিল—"আজ্ঞা, হাঁ।"

উ। কি বলিতেছ ?

দা। আমার মনিব মুসান্নেসাবিবি আপনাকে একবার বাড়ীর মধ্যে ডাকিতেছেন।

উ। তোমার ভ্রম হইয়া থাকিবে। আমাকে তুমি চিনিতে পার নাই।

দা। আজ্ঞে আপনাকে গৌড়নগরের প্রায় সকলেই চেনে। আপনি মহারাজা উদয়েশ্বর।

উ। তোমার ভর্ত্তৃঠাকুরাণীকে আমি কখনও চিনি না,—নাম শুনিয়াছি বলিয়াও স্মরণ হয় না, তিনি আমাকে কেন ডাকিবেন ?

দা। বিশেষ প্রয়োজন আছে।

উ। মুসান্নেসাবিবি কে, না জানিতে পারিলে, আমি সহসা তাঁহার বাড়ীর মধ্যে কেন যাইব ?

দা। তিনি বাদসা-ভবনের ধাত্রী।

উ। তবে চল।

দাসী অগ্রবর্ত্তিনী হইল,—উদয়েশ্বর তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

বহু মূল্যবান বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া মুসান্নেসাবিবি উদয়েশ্বরকে

অভ্যর্থনা করিবার জন্য বাটীর মধ্যে—দরোজার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা ছিল। উদয়েশ্বর প্রবেশ করিবামাত্র যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া এক সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে লইয়া বসাইল।

উদয়েশ্বর বলিল,—তোমার সহিত আমার আলাপ পরিচয় নাই, আমাকে কেন ডাকিয়াছ ?

মৃদু হাসিয়া মুসান্নেসা বলিল—"আপনি গৌড়নগরের অদ্বিতীয় ধনী, রূপবান্, গুণবান্,—আপনার সহিত পরিচয় না থাকিলেও সকলেরই সাধ হয় পরিচিত হই।"

উ। বাধিত হইলাম, কিন্তু আমার একটু জরুরি কাজ আছে। কোন কথা থাকে যদি, বলিলে সন্তুষ্ট হইব।

মু। কোন কথা না থাকিলে আপনাকে কষ্ট দিয়া আনিতাম না। যে কথা আছে, তাহা অতি গোপনীয়, যাহা বলিব, তাহা এক হতভাগিনী হিন্দু রমণীর অন্তিম অনুরোধ।

উ। যাহা বলিবে, কাহাকেও বলিব না। কিন্তু সেই হতভাগিনী হিন্দু রমণীর অন্তিম-অনুরোধ কি আমার প্রতি ছিল ?

মু। না না,—যে কোন সম্ভ্রান্ত ও ধনশালী হিন্দুর উপর। আপনার চেয়ে সম্ভ্রান্ত ও ধনবান্ হিন্দু গৌড়নগরে আর কেহ নাই, তাই আমি কথাটা আপনাকে বলিব বলিয়াই স্থির করিয়াছি। আপনার একটি ঘটনার সহিত ঐ রমণীর কিছু সম্বন্ধও আছে।

উ। আমার কোন ঘটনার সহিত সেই রমণীর কিছু সম্বন্ধ আছে ! কি বল ?

মু। গৌড়েশ্বর হোসেনশাহের রায়বেগমের নাম শুনিয়াছেন ?

উ। হাঁ, হাঁ, শুনিয়াছি ;—তিনি কিছুদিন হইল লোকান্তরিত হইয়াছেন না ?

মু। তিনিই মৃত্যুকালে আমাকে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই আপনাকে বলিব। তিনি কে ছিলেন, আগে তাঁহার বাড়ী কোথায় ছিল,—বাদশার বেগম কি প্রকারে হইলেন, তাহা বোধ হয় আপনার জানা নাই?

উ। না, আমি সে সম্বন্ধে কিছুই জানি না।

মু। যে প্রাণকৃষ্ণ রায়ের বিষয় লইয়া আপনার সহিত তদীয় ভ্রাতার মোকদ্দমা হইয়াছিল, রায়বেগম সেই প্রাণকৃষ্ণ রায়ের কন্যা। রায়বেগম অতিশয় সুন্দরী ছিলেন,—তিনি স্বামীভবনে একটি শিশুপুত্র ও একটি বয়স্থা কন্যা লইয়া বাস করিতেন। তাঁহার স্বামী কুলীন ব্রাহ্মণ,—মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। গ্রাম্য গোমস্তার সঙ্গে সেই ব্রাহ্মণের বিবাদ হয়,—সেই বিবাদের প্রতিশোধ লইতে দুর্ব্বৃত্ত গোমস্তা বাদশাহের কর্ম্মচারীর কাণে তুলিয়া দেয়, ব্রাহ্মণের স্ত্রী অভূতপূর্ব্ব সুন্দরী,—আপনি বোধ হয় জানেন, বাদশাহের আহার্য্যের জন্য হরিণ প্রভৃতি শিকার করিবার কারণে যেমন শিকারীর দল বেতনভোগী থাকে, তেমনি নিত্য নূতন সুন্দরী রমণী সংগ্রহের জন্য শিকারীর দল বেতনভোগী আছে, গোমস্তার ঐ কথা তাহাদেরই একজনের কাণে তুলিয়া দিয়াছিল,—তিনি হাঘরেদের দল পাঠাইয়া, ডাকাইতি করাইয়া প্রাণকৃষ্ণ রায়ের জামাতা ও শিশুপুত্রটিকে নিহত করাইয়া—উহাকে হরণ করিয়া লইয়া আসিয়া বাদশাহকে উপহার দেন;

উ। কি নিষ্ঠুরতা! তারপর? তার একটি বয়স্থা মেয়ে ছিল বলিলে,—সেটি?

মু। এখন সন্ধান হইয়াছে সেটি হাঘরেরা লইয়া গিয়াছিল। তার নাম ছিল ভবানী—ভবানীর পরিবর্ত্তে হাঘরেরা তার নাম রাখিয়াছিল, রোসনে। রোসন শেষে কোথায় গেল, তার আর খোঁজ হয় নাই। হাঘরেরা বলে—সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

উ। রায়বেগম কি আত্মহত্যা করিয়াছিলেন ?

মু। না,—তিনি রোগে মরিয়াছেন। কেহ কেহ বলে, মনি, বেগম তাঁহাকে কি ঔষধ সেবন করাইয়াছিল, ক্রমে ক্রমে সেই ঔষধের বিষক্রিয়া হইয়া রায়বেগম মরিয়াছেন।

উ। মনিবেগম রায়বেগমকে বিষ খাওয়ালেন কেন ?

মু। শুনিয়াছি, প্রাণকৃষ্ণ রায় কন্যাকে সমস্ত বিষয় উইল করিয়া দিয়া সেই দলিল কন্যার নিকটে পাঠাইয়া দেন,—ঐ দলিলগুলি রায়বেগম আপন পেটরায় রাখিয়াছিলেন। আপনার সহিত মোকদ্দমার সময় ঐ দলিল পাইবার জন্য এক ষড়যন্ত্র হয়,—সেই ষড়যন্ত্রের ফলে মনিবেগম প্রতারিতা হইয়া রায়বেগমকে মদের সহিত ঔষধ পান করাইয়া পেটরা বাহির করিয়া দেন।

উ। ভয়ানক কথা! যাক্,—তিনি মরণ কালে কি বলিয়া গিয়াছেন, তাই ?

মু। বলিয়া গিয়াছেন,—আমি মুসলমান হইয়া মরিলাম, নিশ্চয়ই আমার অগতি হইবে। শ্রাদ্ধ করিবারও জগতে কেহ থাকিল না,—কোন হিন্দুর দ্বারা গয়ায় আমার একটা পিণ্ড দিবে, ইহাই আমার অন্তিম-অনুরোধ।

উ। সে কার্য্য আমার দ্বারা হইবে না।

মু। কেন।

উ। কেন জানি না,—হইবে না জানি।

উদয়েশ্বর উঠিয়া চলিয়া গেল। মুসান্নেসা ভাবিল, লোকটা ধনৈশ্বর্য্যে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে,—কিন্তু চরিত্রটা চাষার মত, রসহীন। কত আমীর-ওমরাহ আমায় নয়ন-হিল্লোলে ভাসিয়া গিয়াছে,—এখানে ব্যর্থ সন্ধান হইল। আশা ছিল, এই সূত্রে আলাপ পরিচয় করিয়া ক্রমে মাখামাখি করিব।

তারপরে সে উঠিয়া গিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অপরাহ্নের সূর্য্যকর মৃদু ও শীতল হইয়া আসিয়াছিল। জাহানারা তাহার আশ্রমপ্রান্তবর্ত্তী যত্নরোপিত পুষ্পোদ্যানে একটা শেফালিকা বৃক্ষতলে বসিয়া নিবিষ্ট মনে কি চিন্তা করিতেছিল। পুষ্পোদ্যানের পার্শ্বে সাতকানিয়ার প্রসিদ্ধ আম্রকানন।

আম্রকাননে নিরবচ্ছিন্ন আম্রবৃক্ষই যে ছিল, তাহা নহে। তিন্তিড়ি তাল, জাম, চালতা, নারিকেল ও পার্শ্বদেশে বংশবিটপীও ছিল। জাহানারার আশ্রমের দক্ষিণে এবং বাগানের পশ্চিম-দক্ষিণ দিক দিয়া একটা সুদীর্ঘ হ্রদস্বচ্ছজলরাশি বুকে করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

শরতের প্রখর সূর্যাতেজ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে দেখিয়া, জলাশয়-তীরস্থ বাগানের বৃক্ষের ঊর্দ্ধশাখায় বসিয়া বিবিধ প্রকারের বিবিধ বর্ণের পক্ষী সকল কলরব করিতেছে ;—দোয়েল গান ধরিয়াছে, শ্যামা শিস্ দিতেছে, হলদে পাখী বৌ কথা কও'র অবিরাম ঝঙ্কারে কোন অসুদ্দিষ্টা, অভিমানগ্রস্তা, নীরব প্রণয়বধূর অভিমান ভঙ্গের নিষ্ফল আশায় আপনার কণ্ঠস্বরকে ক্লান্ত করিয়া তুলিতেছে। নদীর ক্রমনিম্ন তীরদেশে কৃষকপল্লীর পোষা সাদা কালো ছাগলের দল মাথা নীচু করিয়া চরিয়া বেড়াইতেছে, একটা কুকুর দীর্ঘ ঘাসের আড়ালে আসিয়া প্রাণপণশক্তিতে একখানা হাড় চিবাইতেছে এবং অদূরে দুই তিনটা ডাহুক জলপিপি আবক্ষ দীর্ঘ পদে দাম দলের উপরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দূরে বাঁশঝাড়ের অন্তরালে ধর্ম্মযাজী ঘুঘুর দল এ সকল শোভাসৌন্দর্য্যের প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখাইয়া গলা ফুলাইয়া, মাথা নোয়াইয়া 'ঘুঘু' 'ঘু' শব্দে তাহার উচ্ছ্বসিত কর্ম্মকাণ্ড, জগতের কোলে ঢালিয়া দিতেছে। জামগাছের ডালে

দার্শনিক্ কাঠঠোক্‌রা 'ঠক্' 'ঠক্' শব্দে তাহার দাম্ব কাঠন চঞ্চুর আঘাতে বৃক্ষবল্কল ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে, এবং অদূরে একটা কদম্বের আগডালে রসপিপাসু চিল বসিয়া রসভোগের ধ্যান করিতেছে, এবং মাঝে মাঝে অতি করুণ, তীব্রস্বরে জৈবী-জীবনের কঠোর বেদনা ব্যক্ত করিতেছ।

জাহানারা প্রতিদিন এসকল দর্শন করিত। প্রকৃতির শিষ্যা, প্রকৃতির পালিতা, প্রকৃতির কন্যা জাহানারা নিত্য নিত্য প্রকৃতির এই সকল দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইত, অনেক সত্য, অনেক সাধনা, অনেক রহস্য সংগ্রহ ও শিক্ষা করিত। আজি কিন্তু তাহার মন ও নয়ন সে দিকে নাই,—সে শেফালিকা-বৃক্ষকাণ্ডে দেহ বিন্যস্ত করিয়া বামহস্তে মাটিতে ভার রাখিয়া, উর্দ্ধাধঃভাবে পায়ের উপর পা ছড়াইয়া, একান্তে কি ভাবিতেছিল। ভাবনা অতিরিক্ত! জাহানারার আশ্রমের দিকের ক্ষুদ্র বাকারির দুয়ার সরাইয়া দিয়া এক দিব্য কান্তি পুরুষ বাগানে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং প্রসন্ননেত্রে চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া, যেখানে জাহানারা বসিয়াছিল, তথায় আসিয়া ডাকিলেন,—"জাহানারা!"

জাহানারা চকিত চাহনিতে চাহিয়া দেখিয়া, তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং ভক্তিভরে অভিবাদন করিল।

যিনি আসিলেন, তিনি বলিলেন,—"এত ডাকাডাকি কেন? কি হইয়াছে?"

জাহানারা বলিল,—"ঘরে চলুন, সমস্ত বলিব।"

তখন উভয়ে বাটীর মধ্যে গিয়া আটচালার দাবায় বসিলেন। জাহানারা বলিল,—প্রভু; গুরু;—আমি বড় বিপদে পড়িয়াই আজি কয় দিন ধরিয়া আপনাকে ডাকিতেছি।"

আগন্তুক মোকদ্দমশা। মোকদ্দমশার বয়স ঠিক করিবার উপায় নাই,—মস্তকের কেশরাশি এবং শ্মশ্রুগুম্ফ সমস্ত পাকিয়া কাস্কুসুমবৎ শুভ্র হইয়া গিয়াছে, কিন্তু দেহের বর্ণ ও গঠন যুবকের ন্যায়। দেহ দীর্ঘ ও উন্নত—মুখে প্রতিভার জ্বলন্ত জ্যোতিঃ।

মোকদ্দমশা বলিলেন,—"একটা কাজে লিপ্ত হইয়াছিলাম বলিয়া আসি আসি করিয়া আসিতে পারি নাই। কিন্তু আজ, সকাল হইতে যে ডাক ডাকিতেছ থাকিবার সাধ্য থাকিলেও বিশেষ প্রয়োজন বোধ করিয়া আসিলাম।"

জা। গুরুদেব, বিশেষ প্রয়োজন। আজি পূর্ণিমা,—আজ' শেষ জবাব দিব বলিয়াছি।

মো। তুমি বোধ হয়, উদয়েশ্বর সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিবে ?

জা। হাঁ্যা, তাই জিজ্ঞাসা করিব।

মো। তাহা বুঝিয়া আমি তাহার সম্বন্ধে সমস্ত তথ্যই অবগত হইয়া আসিয়াছি, কি জিজ্ঞাস্য আছে বল ?

জা। উদয়েশ্বর ও আমাতে যে সম্বন্ধ, আপনিই তাহা অবগত আছেন। সে এক্ষণে আসিয়া আমাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিতেছে,—তাহার আকাঙ্ক্ষার আগুন অসহণীয়,—

মো। আর তোমার ?

জা। তাহাকে ভুলিবার আমার ক্ষমতা হইয়াছে,—কিন্তু দেখিলে যেন কেমন আপন হারা হই।

মো। তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা হয় ?

জা। যাহাতে ভাল হয়, তাহাই বলুন। দিশেহারা হইয়াই আপনাকে ডাকিয়াছি।

মো। শোন জাহানারা, যোগের দ্বারাতে কর্ম্মবীজ ভাজা শস্যের

ন্যায় হইয়া যায়, এ কথা তোমাকে বলিয়াছি—কিন্তু তাহা এক আধ জন্মের সাধনার ফল নয়। দশদিনের সাধনায় মানুষ বিভূতি লাভ করিয়া অসাধ্য সাধন করিতে পারে, কিন্তু দশ জন্মের সাধনায় সংস্কার-বীজ দগ্ধ করিতে পারে না। তোমার যতটুকু উন্নতি হইয়াছে,—ইহার পর জন্মে আরও উন্নতি হইত,—এইরূপ হইতে হইতে, তবে সে কার্য্যে সক্ষম হইতে পারিতে। আমিও তজ্জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি,—কিন্তু তোমার দুর্ভাগ্য—উদয়েশ্বর তোমারই সমীপে আসিয়া জুটিয়া পড়িয়াছিল। উহাকে না দেখিলে, উহার স্মৃতি আসিয়া জাগিয়া বসিত না।

জা। ভাল, আমি যদি উহাকে বিবাহ না করি, এবং কোন দূরতর দেশে চলিয়া যাই?

মো। স্মৃতিটা কিছু অধিক রকমে জাগিয়া পড়িয়াছে।

জা। তার কি উপায় নাই?

মো। এ জন্মে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলে,—ফল তেমন পাইলে না; অনেক নামিয়া পড়িলে। তবে যোগভ্রষ্ট জীবন প্রশংসনীয়,—পরজন্মে উন্নতির পথ পাইবে।

জা। এখন আমি কি করিব?

মো। কি করিবে.—তোমার ইচ্ছা কি?

জা। আমার ইচ্ছার উপরে কাজ হইলে আপনাকে ডাকাইতাম না।

মো। বিবাহ হইবে না। বধূরূপে—সহধর্ম্মিণী রূপে মিশিতে পারিবে না। সেরূপ ভাব, সে জন্মে ছিল না। আরও এক অন্তরায় আছে।

জা। সে অন্তরায় কি?

মো। উদয়েশ্বর পিশাচগ্রস্থ।

জা। সে কি? কি ভয়ঙ্কর কথা!

মো। উদয়েশ্বর পিশাচগ্রস্থও তোমারই জন্য। তোমাকে পাইবার জন্যই সে পিশাচ-সাধনা করে। পৈশাচিক শক্তিতে শক্তিবান হইয়াছে,—কিন্তু মূঢ় জানিত না যে, দৈবীশক্তির নিকট পিশাচশক্তি চির পরাজিত।

জা। আপনার নিকটে পূর্ব্বে শুনিয়াছি,—ভূতাদির আরাধনা করিলে, মানুষ ভূতলোক প্রাপ্ত হয়,—তার অর্থ বোধ হয়, বাসনার নরকে দীর্ঘ দিন পচিয়া মরে,—হায়! উদয়েশ্বরেরও কি সেই গতি হবে?

মো। নিশ্চয়।

জা। আমি হতভাগিনীই, তাহার এই ভয়ানক দুঃখের মূল।

মো। তুমি উদয়েশ্বরের অনুরাগিনী হইয়া পড়িয়াছ।

জা। আপনি বলিয়াছেন, জন্মে জন্মে তাহারই অনুরাগ বুকে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি,—তবে কি করিয়া সহজে ভুলিব প্রভু? সাধনায় যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলাম—যে মন বাঁধিয়াছিলাম,—আমার জন্য তাহার আত্ম বলিদানের কথা শুনিয়া সে বাঁধন খুলিয়া গিয়াছে। তাহার জন্য প্রাণ ব্যাকুলিত হইতেছে।

মো। কিন্তু ইহজীবনে মিলনের আশা নাই।

জা। কেন?

মো। তুমি যোগসাধনায় অনেকটা উন্নতি লাভ করিয়া দৈবীশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছ,—তোমার রসাশ্রয়ে তাহার পিশাচশক্তিমাখা দেহ ধ্বংস হইবে।

জা। আপনি অনন্ত শক্তিধর—এর কোন প্রতিবিধান করিতে পারেন না কি?

মো। না,—সে সাধ্য কাহারও নাই। নিজের সাধনায় নিজে উন্নত হইতে হয়।

জা। আমার মিলনে যদি তাহার অনিষ্ট হয়, আমি মিলিব না। আমার নিজের জন্য মিলন নহে,—তাহার আকাঙ্ক্ষা—তাহার লালসা পূরণের জন্যই মিলনের কথা বলিতেছিলাম।

মো। মরণে ভয় পাইও না জাহানারা; মরণ অমঙ্গলের জন্য নহে,—বস্ত্র রজকালয়ে পাঠান যেমন তাহার ময়লা দূরীকরণ জন্য,—মরণেও তেমনি আত্মার ময়লা দূর হয়। তোমার রসে তাহার আকাঙ্ক্ষা—জন্ম জন্ম তোমার রসের ধ্যানে সে আসক্তির আগুনে পুড়িতেছে। যদি নিজে কিছু কষ্ট স্বীকার করিতে পার,—একটা জন্ম আপনাকে বাঘের মুখে ফেলিয়া দিতে পার,—তবে তাহার সহিত মিলিত হও,—তাহার পিপাসিত আত্মার মুখে একবিন্দু রসধারা ঢালিয়া দিও।

জা। মালতী তাহার জন্ম-জন্মের সঙ্গিনী—সহধর্ম্মিনী,—সে কি তাহা পারিবে না?

মো। রস এক, ধর্ম্ম আর। রসে আত্মতৃপ্তি হয়—ধর্ম্মে আত্মার উন্নতি হয়। রাধা রস—রুক্মিণী ঐশ্বর্য্য। উদয়েশ্বরের তুমি রস,—মালতী ঐশ্বর্য্য।

জা। প্রত্যেক মানুষেরই কি এমন থাকে?

মো। অনেকের থাকে। অপ্সরা-কন্যা সহধর্ম্মিনীকে গৃহে রাখিয়া কুরূপা প্রেতিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ মানুষ ছুটিয়া যায়,—সেও রসানুসন্ধানে।

জা। তবে এক ভিন্ন দুই নারীর দিকে পুরুষের চাহিতে নাই কেন?

মো। জন্ম জন্ম সাধনার ফলে—পুরুষকারের বলে, মানুষ যদি রস ও

ঐশ্বর্য্য একাধারে গঠন করিয়া লইতে পারে, তবে বড় সুখী হয়। যাতনার অনল নিবিয়া যায়।

জা। আমি যদি উদয়েশ্বরের সহিত না মিলিত হই,—তবে উদয়েশ্বরের পরলোকে কি কোন কষ্ট হইবে?

মো। হইবে।

জা। কি কষ্ট হইবে?

মো। রসের আকাঙ্ক্ষা লইয়া পিশাচ-জীবনে নরকের দ্বারে দ্বারে—বৈতরণীর কূলে কূলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইবে। আর জন্মে জন্মে নারকীয় প্রবৃত্তিতে—পৈশাচিক শক্তিতে যে সকল নারকীয় রমণী-সঙ্গ লাভ করিয়াছিল,—যাহারা রমণীর অমূল্য নিধি সতীত্ব বিক্রয় করিয়াছিল; সেই সকল রমণীর নরকবাসী-আত্মা আসিয়া উদয়েশ্বরের আত্মার সহিত মিশিয়া আরও জ্বালাইবে,—আরও দগ্ধ করিবে। নরকভোগের সমাপ্তি কাল উপস্থিত হইতে দিবে না।

জা। আমি কি মুসলমান?

মো। সে কথা কেন?

জা। উদয়েশ্বর হিন্দু,—হিন্দু হইয়া মুসলমানের মেয়ে বিবাহ করিবে না।

মো। তোমার সে ভয় নাই,—উদয়েশ্বর শুচি চাহে না, অশুচিই তাহার জীবনের ব্রত। জাতিগত আচার ভেদে যে শুচিত্ব, তাহা তাহার প্রয়োজন নাই,—সে মন্ত্র পাঠ করিয়াও তোমাকে গ্রহণ করিতে পারিবে না। পরকীয়া ভাবে গৃহীত হইও,—রসের সাধনায় পরকীয়া শ্রেষ্ঠা। পরকীয়া, মহাশক্তি যোগিনী হওয়া চাই—তুমি তাহাই।

জাহানারা এক দীর্ঘ শ্বাস পরিত্যাগ করিল।—"আবার আসিয়া দেখা দিব"—এই কথা বলিয়া মোকদ্দমা উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

জাহানারা শুনিতে পাইল, কাননান্তবর্ত্তী সীমা হইতে মোকদ্দমশার কণ্ঠে পুরাতন কবির সাধন-সঙ্গীত সমীরণে ভাসিয়া আসিতেছিল ; গীত হইতেছিল,—

"রসিক রসিক সবাই কহে
কেহ সে রসিক নয়,
ভাবিয়া গণিয়া বুঝিয়া দেখিলে
কোটিতে গোটিক হয়।
সখি রে, রসিক বলিব কারে,—
বিবিধ মশালা রসেতে মিশায়ে

রস পরিপাটি সুবর্ণের ঘটী
সম্মুখে পুরিয়া রাখে,
খাইতে খাইতে পেট না ভরিবে
তাহাতে ডুবিয়ে থাকে।
সেই রসপান রজনী দিবসে
অঞ্জলী পুরিয়া খায়।
খরচ করিলে দ্বিগুণ বাড়য়ে
উছলিলে বাহিরায় ॥

স্বর-লহরী দিগন্তের কোলে মিশিয়া গেল,—তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। জাহানারা বড় অন্যমনস্ক,—একজন পরিচারিকা সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া গৃহের অন্ধকার বিদূরিত করিল। সেদিন পূর্ণিমা তিথি —ভাদ্র মাসের নির্ম্মল চন্দ্র, সন্ধ্যা হইতেই প্রোজ্জ্বল রজত কিরণ—

জগতের বুকে ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। সান্ধ্যফুল্ল কুসুম হইতে সৌরভ লইয়া উদাস পবন ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

অদূরে মনুষ্য-পদ শব্দ হইল। জাহানারা চকিতে চাহিয়া দেখিল, উদয়েশ্বর। উদয়েশ্বর আসিয়া জাহানারার পার্শ্বে যে আসনে মোক-তুমশা বসিয়াছিলেন, তাহাতে উপবেশন করিল। ভাদ্রের কুলপ্লাবিনী উচ্ছ্বসিত নদী আজি স্থির—মুখরা রসরঙ্গ-রসিকা জাহানারা আজি গম্ভীরা। উদয়েশ্বর বিস্মিত হইল। জাহানারা বলিল,—"আজি পূর্ণিমা,—তুমি এসেছ?

স্বর প্রীতিপূর্ণ। উদয়েশ্বরের প্রাণে যেন অমৃত বর্ষিত হইল। বলিল,—"আসিয়াছি। বুঝি তোমার কাছে না আসিলে আমার বাঁচিবার সাধ্য নাই। আমার প্রস্তাবের কি উত্তর দিবে, জাহানারা?"

জাহানারা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—"কি উত্তর দিব উদয়েশ্বর? এ হৃদয় তোমার পক্ষে চিতার আগুন—মরণ বিষে পূর্ণ। এখানে আসিবামাত্র তোমার দেহপাত হইবে।"

উদয়েশ্বর চমকিয়া উঠিল। বলিল,—"আমি তাহা বুঝিয়াছি, কিন্তু তথাপি তোমাকে চাই। তোমার ঐ উন্নত যৌবনপূর্ণ বক্ষের উপরে পড়িয়া মরিয়া যাইবার জন্যই বুঝি আমার মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করা। জাহানারা—প্রাণের জাহানারা, একবার বল, তুমি আমার।"

জাহানারা মৃদু মধুর উদাস স্বরে বলিল,—"আমি তোমার!"

বসন্ত বিজনের সমবেত সুরভির মত, অনাস্বাদিত পদ্ম-মুকুলের মধুর রসের মত, অবসাদহীন স্বর্গীয় সোমরসের মত্ততার মত, একরূপ আনন্দ—একরূপ সুখ সমস্ত কক্ষে যেন ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

উদয়েশ্বর পুনরপি বলিল,—"তুমি আমার?"

জাহানারা বলিল,—"আমি তোমার।

উ। আমায় বিবাহ করিবে,?

জা। আজ' হইতে আমি তোমার,—তুমি ইচ্ছা করিলে বিবাহ করিতে পার। কিন্তু উদয়েশ্বর, এই মিলন—ইহলোকে মুহূর্ত্ত স্থায়ী।

উ। কেন জাহানারা?

জা। তুমি সর্ব্বনাশ করিয়াছ।

উ। কি করিয়াছি?

জা। পিশাচ-চরণে আত্মবলি দিয়াছ।

উদয়েশ্বরের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া অগ্নি-প্রবাহ ছুটিয়া গেল। জ্যোৎস্না-বিকশিত মৃদু সমীরণ-পরিসেবিত পুষ্পগন্ধ মুখরিত কানন হইতে কে গাহিল,—

আমিত তোমারি ঘুমান নলিনী
যোগিনা তোমারি হৃদয়-সাধা,
রসের কারণে সেথেছ এসেছি
সাধিয়া মরণে, নাহিক বাধা।
গোলকের দ্বারে রসের সায়র
দু'জনে সিনান করিব তথা।
ক'টা জন্ম নয় ঘুরিব ফিরিব
ল'য়ে বুকভরা অনল-ব্যথা।
পূর্ণিমার নিশি বিথারি আসন
তোল তোল সখা যুগলরূপ,
রাসের মঞ্চেতে রস উপভোগ
প্রাকৃত মদনে দলিত কূপ।

বাজাও বাঁশরী বেহাগে আলাপে
　　নিকুঞ্জে ফুটাও মাধবী ফুল,
এস দু'য়ে মিলি রাগে রতি সখা
　　তেজিয়া ধরম করম কুল।
তুমি আমি যাব এক হ'য়ে রব
　　প্রবেশ হৃদয়ে হৃদয়-রাধা,
কাল কৃষ্ণ তুমি হও মধ্যগত
　　বাহিরে আবরি রহিবে রাধা।

গান শুনিয়া যেন উদয়েশ্বরের জন্মজন্মান্তরের ব্যবধান মুছিয়া যাইতেছিল। জাহানারার মুখের দিকে চাহিয়া, আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে উদয়েশ্বর জিজ্ঞাসা করিল,—"কে গাহিতেছে জাহানারা?"

জা। বোধ হয়, সফিনা হইবে।

উ। সফিনা কি এখনই এখানে আসিবে?

জা। বোধ হয় না,—সে হয়ত তোমায় আমায় এখানে বসিতে দেখিয়া পুষ্পোদ্যানে চলিয়া গিয়াছে।

তখন উদয়েশ্বর অবশ-কম্পিত, শুষ্ক-পিপাসিত কণ্ঠে বলিল,—"জাহানারা, প্রাণের জাহানারা—বহুদিনের ধ্যানের জাহানারা,—যদি কৃপা করিয়াছ—যদি আমার হইয়াছ,—আর সহ্য করিতে পারিতেছি না—একটি—একটিবার তোমার ঐ রক্তাধরে"—

জাহানারা বলিল,—"এখনই কি সব শেষ করিতে চাও?"

উদয়েশ্বর জিজ্ঞাসা করিল,—"সব শেষ কি? একটি চুম্বন মাত্র ভিখারী।"

জাহানারা শিরীষ কুসুমের মত যুগল বাহু প্রসারণ করিয়া বলিল,—

"তবে এস প্রাণেশ্বর, কাম্যপ্রেমে পূর্ণাহুতি হোক—বাদশার [illegible] আগুনে পুড়ুক।"

উন্মাদের মত উদয়েশ্বর ছুটিয়া গিয়া জাহানারার [illegible] হইল। বাহিরের প্রমত্ত সমীরণ প্রলয়ের [illegible] উঠিল, লক্ষ লক্ষ আগুন জ্বলিল,—চারিদিকে অগণিত [illegible] গর্জ্জিতে লাগিল,—উদয়েশ্বর অসাড়, অচল—নিস্পন্দ।

জাহানারার দুই চক্ষু দিয়া ধারা বহিল,—সে বুঝিল, পৈশাচিক-শক্তির সংক্ষুব্ধ উচ্ছ্বাসে বাহিরে প্রলয়-গর্জ্জন, আর উদয়েশ্বরের অবসান।

ঠিক সেই সময় সকিনা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। জাহানারা বলিল,—"সকিনা, উদয়েশ্বরের প্রেমের পূর্ণাহুতি হইয়াছে।"

সকিনা উদয়েশ্বরের অবস্থা দেখিয়া [illegible] উঠিল, তাড়াতাড়ি আসিয়া নাসিকার নিকটে হস্ত দিয়া বলিল,—"জাহানারা, জাহানারা,—এখনও জীবন আছে শুশ্রূষা কর।"

সেই শয্যার উপরে উদয়েশ্বরের অচল লুণ্ঠিত দেহ রক্ষা করিয়া উভয়ে শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সেই রাত্রে মালতী গৌড়নগরের বাড়ীতে নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছিল,—সেই প্রফুল্ল জ্যোৎস্না-কান্তি জ্যোতির্ম্ময়ী সাবিত্রী দেবী তাহার শিয়র দেশে বসিয়া বলিতেছেন,—সতি! তোমার পতি আত্মকৃত অবিধি সাধনার—কলুষ-কামনার, ফলে দেহ ত্যাগ করিতে বসিয়াছেন। ভয় করিও না,—মানুষ একজন্মের—মুহূর্ত্তকালের জন্য নহে। এ তচ্ছ দ'ণ্ডের খেলা, জন্ম জন্ম—যুগযুগান্তরব্যাপী তাহার কার্য্য। আমি তোমাকে যে মন্ত্র দান করিয়াছি, তাহারই সাধন-বলে স্বামীকে ঘোর নরক হইতে তোমাকেই উদ্ধার করিতে হইবে। উদয়েশ্বর স্বীয় আত্মা পিশাচকে দান করিয়াছে,—তাহার জন্য কেবল নরক —মহাভীম নরক—তাহার বিদেহী আত্মার শিরায় শিরায় পরতে পরতে জড়ের সুদৃঢ় শৃঙ্খল বদ্ধ হইয়াছে,—তোমাকেই তাহা মোচন করিতে হইবে। মালতী যেন সেই দিব্য মূর্ত্তির সান্ত্বনায় তখন শান্তি লাভ করিতে পারিয়াছিল। সে বলিল,—আমার কি শক্তি আছে মা,—আমি কি দিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিব? জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি বলিলেন,—সতী স্ত্রীর স্বার্থহীন হৃদয়ের ভালবাসায় পতির নিদ্রাহীন, শান্তিহীন আত্মা চিরদিনের জন্য আরোগ্য স্নান করিয়া আইসে। মালতী জিজ্ঞাসা করিল,—মা, সতীকুলেশ্বরি, তবে কি সহমরণ? দিব্য মূর্ত্তি বলিলেন, সহমরণের চেয়ে ব্রহ্মচর্য্য শ্রেষ্ঠ। তুমি সেই পথ অবলম্বন করিও।

সহসা মালতীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। জাগিয়া স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়া সে আকুল হইয়া পড়িল। হায়! সে কি স্বপ্ন দেখিল,—

তাহার স্বামী কি তবে ফাঁকি দিবেন? সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু ফুলাইল,—সমস্ত রাত্রির মধ্যে আর চক্ষুর পাতা বুজিল না,—শয্যায় পড়িয়া ছটফট করিয়া বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিল।

অতি প্রত্যূষে উঠিয়াই মালতী এক দাসীকে বাহিরে তাহার স্বামীর সংবাদ আনিতে পাঠাইল,—দাসী ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"তিনি কা'ল' সন্ধ্যা হইতে বাড়ী নাই।"

মালতী আরও উতলা হইল,—বাণবিদ্ধ হরিণের জন্য হরিণী যেমন ছটফট করে, মালতীও তদ্রূপ করিতে লাগিল। হায়! তাহার স্বামীকে কি আর দেখিতে পাইবে না? তিনি কোথায় গেলেন,—আর কি আসিবেন না? মালতী কক্ষের মেঝেয় পড়িয়া অশমিত নিশ্বাসে লুঠিয়া লুঠিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বেলা প্রায় দেড় প্রহরের সময় দাসী আসিয়া মালতীকে বলিল,—"একটি সুন্দরী যুবতী রমণী পাল্কীতে করিয়া আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছেন, তিনি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চান।"

মালতী চমকিয়া উঠিল। একি তবে তাহার স্বামীর সেই ভালবাসা রমণী!—একি তবে তাহার স্বামীর মৃত্যু সংবাদ লইয়া আসিয়াছে! মালতী অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিল না। উদাস-দৃষ্টিতে দাসীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল! দাসী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল,—তাকে কি আন্‌বো?"

দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মালতী বলিল,—"আন।"

কিয়ৎক্ষণ পরে দাসীর সহিত সকিনা মালতীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। মালতী কোন কথা সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারে না,—যদি সেই রমণী তাহার স্বামীর কোন অশুভ সংবাদ শুনাইয়া দেয়!

সফিনাই প্রথমে কথা কহিল। বলিল,—“আমি সাতকানিয়ার বাগান হইতে আসিতেছি। জাহানারা আমার সখী—সেই আমাকে তোমার নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছে।”

স্তব্ধ শ্বাসে সভয়ে ক্ষীণকণ্ঠে মালতী জিজ্ঞাসা করিল,—“কেন ?”

স। তোমার স্বামী কাল’ রাত্রে সেখানে গিয়ে ব্যারামে প’ড়েছেন,—তাই তোমাকে নিতে।

মালতী বুক চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার চক্ষু দিয়া দরদরিত ধারায় জলপ্রবাহ ছুটিল। সফিনা বলিল,—“ব্যারামটা একটু কঠিন হ’য়েছে বটে, তা ভয় নেই। ব্যারাম কি আর সারে না।”

রুদ্ধোচ্ছ্বাসে মালতী বলিল—“সারিবে কি না আমি জানিতে পারিয়াছি। হাঁগা, আমাকে সেখানে যাইতে হবে কেন ? আমার স্বামীকে—আমার প্রাণেশ্বরকে—এই বিপুল সোনাদের অধীশ্বরকে অন্যের আশ্রয়ে রাখিব কেন ? তাঁহার বাড়ীতে তাঁহাকে আনিতে পাল্কী আর শত সহস্র লোক পাঠাই না কেন ?

সফিনা বলিল,—“তাঁর হঠাৎ সে রোগ হয়েছে, একটু উপশম না হ’লে, নড়ান চড়ানর উপায় নাই—চিকিৎসকে নাকি বলচে চলন্ত বাত,—তাই দেহ অসাড় মেরে গিয়েছে ; সর্ব্বাঙ্গে বিষম ব্যথা ধরেছে।”

মালতী তখনই ছুটিয়া বাহির হইল,—চারি পাঁচজন দাস দাসী এবং দুই জন সুপ্রসিদ্ধ ও সুবিজ্ঞ চিকিৎসক লইয়া শিবিকারোহণে সফিনার সঙ্গে সাতকানিয়ার বাগানে গেল।

মোকত্তুনশা সন্ধ্যার সময় জাহানারার নিকট হইতে বিদায় লইয়াছিলেন বটে, কিন্তু চলিয়া যান নাই। যোগবলে তিনি যে সকল ঘটনা ঘটিবে, তাহা অবগত হইয়াছিলেন,—সেই জন্য স্থানান্তরে অবস্থান করিতেছিলেন,—রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় জাহানারার আবাসে

পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া, সকিনাকে মালতীকে আনিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

দিবা প্রায় তৃতীয় প্রহরের পর সকিনার সঙ্গে সকলে আসিয়া জাহানারার আশ্রমে উপস্থিত হইল। মালতী ছুটিয়া গিয়া তাহার স্বামীর রোগ-শয্যার পার্শ্বে উপবেশন করিল। উদয়েশ্বর অসাড় নিশ্চল ও শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় শয্যার উপরে পড়িয়া আছে। মালতী সে অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়া পড়িল। চিকিৎসকগণ নাড়ী টিপিলেন, রোগ পরীক্ষা করিলেন,—অপ্রসন্ন আননে বলিলেন,—"জীবনের আশা নাই। চিকিৎসারও পথ নাই।"

মোকদ্দমশা মধুর বচনে মালতীকে বলিলেন,—"মা, জীবন-মরণের সংসারে অত ব্যাকুল হইলে চলিবে না। তোমার স্বামী অভিশাপ-গ্রস্ত—পিশাচ কর্ত্তৃক নরকাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত। যাহাতে স্বামীর পরকাল হয়, তাহার উপায় করিতে হইবে। কেবল কাঁদিলে মরণের পথ হইতে মানুষ ফিরিয়া আসে না,—বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য, আত্মীয় স্বজনের আত্মার যাহাতে উন্নতি হয়, তাহা করা।"

কাঁদিতে কাঁদিতে মালতী বলিল,—"আমি কাঁদিতে জন্মিয়াছি কাঁদিতেই জানি,—অন্য কিছু জানি না। কি করিতে হইবে, আপনি বলিয়া দিন।"

মো। তোমার লোকজনদিগকে কতক কতক বিদায় করিয়া দাও,—কেবল প্রয়োজনমত কিছু রাখ,—তাহারা এই বাড়ীর ঐ পাশের ঘরে গিয়া আশ্রয় লউক,—তারপরে যাহা করিতে হইবে, আমি বলিতেছি,—আমার নাম মোকদ্দমশা।

মোকদ্দমশার নাম শুনিয়া মালতী অভিবাদন করিল। তারপরে লোকজনকে ডাকিয়া মোকদ্দমশার আদিষ্ট বাক্য তাহাদিগকে বলিল,—তাহারাও আদেশ প্রতিপালন করিল।

তখন উদয়েশ্বরের নিশ্চল অসাড় দেহপার্শ্বে জাহানারা, মালতী আর মোকদ্দমশা অবস্থিত ছিলেন! মোকদ্দমশা বলিলেন,—"তোমার স্বামী দুষ্পূর বাসনার পূরণ জন্য পিশাচসাধনা করিয়া পিশাচকে আত্মদান করিয়াছেন,—নরক উঁহার আত্মকৃত কর্ম্মের ফল। তোমাকে আর এই জাহানারাকে এখন উঁহার উদ্ধারের জন্য আত্মবলি দিতে হইবে।"

মালতী বিস্মিত নয়নে মোকদ্দমশার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"আমার স্বামী, আমি স্বামীর নরকবারণ জন্য সব করিতে পারিব, কিন্তু উনি কে? উনি আত্মবলি দিবেন কেন?"

মো। উঁহার নাম জাহানারা। মানুষ একজন্মের নহে—মরণেই মানুষের পরিসমাপ্তি নহে। জাহানারা উদয়েশ্বরের আকাঙ্ক্ষার আগুন,—জাহানারার জন্যই উদয়েশ্বরের পতন। এখন জাহানারার আত্মদান উদয়েশ্বরের রক্ষার কারণ,—উনিও তাহা করিবেন।

মা। আমার স্বামী তবে কি আমার তর্পণ চাহেন না?

মো। নিশ্চয়ই,—উভয়েরই চাহেন। জাহানারা উঁহার পিপাসিত কণ্ঠে রসদান করিবে মাত্র, কিন্তু উদ্ধারকর্ত্রী তুমি।

মা। একটি পুরুষে দুইটি রমণীর বিভিন্ন আশা-বাসনা, বিভিন্ন পাপ-পুণ্য কিপ্রকারে উন্নতির কারণ হইবে?

মো। সাগরে কত নদী পড়ে—তখন কি আর নদীর নদীত্ব বা পৃথকত্ব থাকে, মা? এক অভিলাষে দুই হৃদয়—মিশিতে পারিলে এক হইয়া যাইবে।

মা। আমার স্বামী পিশাচসিদ্ধ—কিন্তু হঠাৎ এমন কেন হইলেন?

মো। জাহানারা যোগবলে দৈবশক্তি লাভ করিয়াছে—উদয়েশ্বর পিশাচ-শক্তিতে পরিপূর্ণ,—সে পিশাচের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল,

—কখনও দেবসম্পর্কে যাইবে না। কিন্তু পূর্ণ দৈবশক্তির বক্ষে দেহ ঢালিয়া দিতেই পিশাচ তাহার জড়ের বন্ধন-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া লইয়াছে। মহাভারতে বোধ হয় পাঠ করিয়াছ,—মাদ্রী দেব-সম্পর্কে গিয়াছিল,—দৈবী শক্তি পাইয়াছিল,—অভিশপ্ত পাণ্ডুরাজা একবার মাত্র দেহ স্পর্শেই মাদ্রীবক্ষে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন। অনেক পিশাচশক্তি সম্পন্ন যুবক অনেক দেবশক্তি সম্পন্না রমণীর বক্ষে এইরূপে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া থাকে। তাই হিন্দুদের বিবাহে গণ মিলাইয়া দেখিবার ব্যবস্থা আছে—উত্তম বর্ণের মেয়ের সঙ্গে অধমবর্ণের ছেলের বিবাহ দিতে নাই।

মা। আমার স্বামীর কি বাঁচিবার কোন উপায় নাই? শুনিয়াছি, আপনি যোগবলশালী, আপনি কি কোন উপায় করিতে পারিবেন না?

মো। কিছু না। তোমার স্বামীর শিরায় শিরায় পৈশাচিক জড়ের নরক-শৃঙ্খল আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে,—তাহা খুলিবার সাধ্য কেবল তোমারই আছে। তাও এক দিনে নহে;—বহু দিনের ব্রহ্মচর্য্য সাধনায়।

মালতী আঁচলে বিগলিত নয়নাশ্রু মুছিয়া বলিল,—"হায়! আমি যদি আমার স্বামীর সেই আবদ্ধ শৃঙ্খল দেখিতে পাইতাম!"

মোকদ্দমশা প্রশান্তস্বরে বলিলেন,—"মা, তোমার সে অভিলাষ আমি পূর্ণ করিব। যে অবস্থায় উপনীত হইলে, মানুষ যখন দেহ ছাড়িয়া বিদেহী রাজ্যে গমন করে, তাহ দেখিতে পায়, সে অবস্থার শক্তি তোমাতে সঞ্চারিত করিব। তুমি তোমার স্বামীর বিদেহী আত্মার জড়ের শৃঙ্খল দেখিতে পাইবে।

মা। আমার স্বামীর মৃত্যুর পরে আমি ও জাহানারা কি করিব?

মো। সে ব্যবস্থা পরে হইবে। আপাততঃ আমি চলিলাম—

যথাসময়ে তোমার স্বামীর বিদেহী আত্মার দর্শন ক্ষমতা সঞ্চারণ করিব।

মা। আপনি কোথায় যাবেন।

“আমার আশ্রমে—এই কথা বলিয়া মোহন্তমশা উঠিয়া চলিয়া গেলেন। মালতী জাহানারার দিকে চাহিয়া বলিল,—“তুমি যদি উঁহাকে থাকিতে বলিতে! উনি কাছে থাকিলে, অনেক ভরসা থাকিত।”

জাহানারা বলিল,—“উনি কাহারও কথা শুনিয়া কাজ করেন না নিজের ইচ্ছামত চলেন,—অনুরোধে থাকিবেন না।”

সে রাত্রি জাহানারা ও মালতী প্রাণপণে উদয়েশ্বরের শুশ্রূষার চেষ্টা করিল। কিন্তু অসাড় দেহে শুশ্রূষার কোন প্রয়োজনই ছিল না।

* * * * * *

পর দিন প্রেতপক্ষের প্রতিপদ। জাহানারা ও মালতী উদয়েশ্বরের অসাড় দেহের দুই দিকে দুই জন বসিয়া ছিল,—তখন দিবা দ্বিতীয় প্রহর।

সহসা হৈমন্তী প্রদোষের মত, শ্রাবণের পূর্ণভাবে মেঘাচ্ছন্ন দিবালোকের মত সমস্ত গৃহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে [illegible] রূপ নিবন্ত আলো ফুটিয়া উঠিল। সে আলোকে অন্ধকার—সে আলোকে মরণের গন্ধ মাখা! মৃত—সান্দ্র—যুগ যুগান্তরে যেন আঁধার মাখা আলোকে মিশ্রিত। উদয়েশ্বর এক বার হাঁ করিল,—মালতী তাড়াতাড়ি উঠিয়া জল লইয়া উদয়েশ্বরের মুখে দিল,—জল কস্ বহিয়া গড়াইয়া পড়িল। উদয়েশ্বর একবার হাত পা ছুড়িয়া বিকট শব্দ করিল—যন্ত্রণার করাল কঙ্কালিত প্রাণান্তিক স্বরে বলিয়া উঠিল—

“অন্ধকার! বিরাট বিপুল মসী-কলঙ্ক! রক্ষা কর—রক্ষা কর

—পিশাচ! তোমার ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত বুভুক্ষিত দানবী চক্ষুর দৃষ্টি সম্বরণ কর। সর্ব্বাঙ্গে জড়ের অনল-শৃঙ্খল বাঁধিয়া দিয়াছ। আবার কেন,—এত তাড়া কেন? বসিতে দিবে না, ভাবিতে দিবে না—কেবল নরক হইতে নরকান্তরে তাড়াইয়া ফিরিবে?—রক্ষা কর—রক্ষা কর! জাহানারা—এস জাহানারা—রক্ষা কর জাহানারা—পিপাসায় কণ্ঠ ফাটিয়া গেল।”

জাহানারা বুঝিল, উদয়েশ্বর মরণের পথে চলিয়াছে। সে, ডাকিয়া বলিল,—চল প্রাণেশ্বর—চল উদয়েশ্বর, মরণের বাসরে তোমায় আমায় চলিয়া যাই। তোমার জন্য আত্মদান করিয়াছি—বিদ্যুতে বিদ্যুতে জড়াজড়ির মত—যমদ্বারাবচ্ছিন্ন বৈতরণীর কূলে কূলে তোমায় আমায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইব।”

তারপরে মালতীর দিকে চাহিয়া জাহানারা বলিল,—ঐ তোমার স্বামীদেবতা পিশাচের শৃঙ্খল পরিয়া মরণের পথে চলিলেন। ব্রহ্মচারিণী হইয়া তাঁহার উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিও—কখনও ভুলিও না, কখনও যেন পদস্খলন হয় না।”

মালতী অজ্ঞানে, অভিভূত অবস্থায় চাহিল। দেখিল, তাহার স্বামী মেঘ-মন্দ্রের কোলে অন্ধকারেই মাঝামাঝি দাঁড়াইয়া,—কঠিনহৃদয় পিশাচ তাহার সর্ব্বাঙ্গে শৃঙ্খল পরাইয়া দিয়াছে। উদয়েশ্বর, কাতরে শুষ্ক কণ্ঠে ডাকিয়া বলিতেছে—রক্ষা কর—নরকের মেরু-লজিব শিখায় পিপাসায় প্রাণ যায়—পিশাচের দানবী-দীপ্তি বুভুক্ষিত কঙ্কালিত দৃষ্টিতে পুড়িয়া ম'লাম। এস জাহানারা,—বুক ফেটে গেল—বাসনার অনলে কণ্ঠ জ্বলে গেল।”

মালতী দেখিল,—উদয়েশ্বরের নিকটে জাহানারা গিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা হাত ধরাধরি করিয়া, উৰ্দ্ধ হইতে উৰ্দ্ধদিকে উঠিয়া

গেল,—মনুষ্যদেহ দগ্ধ চিতার গন্ধে সমস্ত গৃহখানি পূর্ণ হইল। মালতী সবিস্ময়ে জাহ্নারার দিকে চাহিয়া দেখিল,—সে যেমন বসিয়াছিল, তেমনই রহিয়াছে—গায়ে হাত দিল,—দেহ অসাড়, ঠেলিবামাত্র পড়িয়া গেল। সে দেহ প্রাণশূন্য—যোগে জাহানারা প্রাণত্যাগ করিয়া সহমরণে গিয়াছে।

কড়্ কড়্ শব্দে প্রলয়ের মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গর্জ্জন হইতে লাগিল, মালতী শুনিতে পাইল—ঠিক জাহানারার স্বরে কে করুণ কণ্ঠে ডাকিয়া ডাকিয়া বলিতেছে—"ভগিনি! তুমিই উদ্ধারের উপায়! এই ভীম নরকার্ণবে তুমিই উদ্ধারের আশা! তুমি সাধিয়া আসিলে—তিনে মিশিয়া এক হইব,—তখন সত্ত্ব, রজঃ, তম এক হইবে। মালতী সত্ত্ব, জাহানারা রজঃ, আর উদয়েশ্বর তম—এই তিন মিশিয়া ওঁ হইব।

মালতী! রমণী উদ্ধারকর্ত্রী—রমণী মুক্তি দাত্রী—রমণী রসরাস বিহারিণী,—মালতী, ভুলিও না। জড়ের বন্ধন খুলিতে তুমিই এক মাত্র ভরসা।

আবার কড়্ কড়্ শব্দে প্রলয়ের গর্জ্জন হইল, আবার দুর্গন্ধে দিক পূরিল। মালতী স্বামীর শয্যার পানে চাহিয়া দেখিল,—উদয়েশ্বর ও জাহানারার ভবের খেলা ফুরাইয়া গিয়াছে। সে হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।